UNABINGSHA SHATABDIR BANGLA KABYA, NAKSA, NATAK, PRAHASAN O KOTHA SAHITYA

MA [Bengali]

BNGL 802C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr Anirban Bhattacharjee

Prof. of Mahadebananda College

Author: Soma Bhadra Ray, Prof. of Mahadevananda College

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক (পৃষ্ঠা 1-58)

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য - (নির্বাচিত সর্গ : ১, ৪, ৬, ৯)

গীতিকাব্য - (নির্বাচিত কবি : ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, অনঙ্গমোহিনী দেবী)

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 59 - 104)

হুতোম প্যাঁচার নক্সা - কালীপ্রসন্ন সিংহ

নববাবু বিলাস - ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় একক (পৃষ্ঠা 105 - 132)

সধবার একাদশী - দীনবন্ধু মিত্র

অলীকবাবু - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 133 - 170)

কপালকুন্ডলা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বর্নলতা - তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-58)**

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য - (নির্বাচিত সর্গ : ১, ৪, ৬, ৯) **(1-42)**

গীতিকাব্য - (নির্বাচিত কবি : ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, অনঙ্গমোহিনী দেবী) **(43-58)**

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 59 - 104)**

হুতোম প্যাঁচার নক্সা - কালীপ্রসন্ন সিংহ **(59 - 83)**

নববাবু বিলাস - ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় **(85 - 104)**

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 105 - 132)**

সধবার একাদশী - দীনবন্ধু মিত্র **(105 - 120)**

অলীকবাবু - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর **(121 - 132)**

চতুর্থ একক **(পৃষ্ঠা 133 - 170)**

কপালকুন্ডলা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **(133 - 157)**

স্বর্নলতা - তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **(159 - 170)**

প্রস্তাবনা

টিপ্পনী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বহু বিচিত্র ও নানামুখী। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যা সংস্কারের প্রবেশের সিংহদ্বার গেল। নবজাগরনের অভিঘাত বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হল পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালী লেখের ওপর। যার ফলশ্রুতি 'মেঘনাদ বধ' কাব্য। রেনেসাঁসের কারনে বাল্মীকির রামায়ন কাহিনীকে নতুন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। সঙ্গে গীতিকাব্যের ধারাটি ও সক্রিয় ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কখনো ব্যাঙ্গাক্তি ও কটাক্ষ, কখনো রক্ষনশীল হিন্দুয়ানির স্বর শোনা গেছে। বিহারীলালের ও অক্ষয়কুমারের কবিতায় গীতি কবিতার সার্থক ও অজটিল রূপটিও সামন্তরালে চলেছিল।

উনিশ শতকের গোড়ায় চূর্নক - অখ্যানক - নক্সায় কথাসাহিত্যের মালমশালা জড়ো হচ্ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও ভবানীচরনের 'নববাবু বিলাস' এ তৎকালীন কলকাতার বাবু সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকা হল, সঙ্গে জোরালোভাবে দেখা দিল নাটক। শুধু লেখা নব, নাটক অভিনীত ও হতে লাগল। দীনন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' জ্যোতিরিন্দ্রাথের 'অলীকবাবু'র মতো নাটকগুলিতে নির্মল হাস্যরস ও তির্যক ব্যাঙ্গের মিলন ঘটল। উপন্যাসের সৃষ্টি এ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৮৬৫ তে 'দুর্গেশনন্দিনী'র াত ধরে উপন্যাসের পথচলা শুরু হল। 'ককপালকুন্ডলা' উপন্যাসে রোমান্সের ছোঁয়া থাকলেও নর-নারী সকলেই হলে উঠলেন 'Individual'। তারকনাথের 'স্বর্নলতা' সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসষের নতুন তারা উন্মোচন করল। এসব বিষয় উনবিংশ শতাব্দির বাংলা সাহিত্য নানা সম্ভবনায় পূর্ন। তাই দিয়ে সাজানো এই পাঠোক্রমক। বাংলা সাইত্যের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী। এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটালে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আশা রাখি এই গ্রন্থ পাঠে তাদের ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে যাএ - লেখক হিসেবে এইটুকুই প্ররত্যাশা।।

প্রথম একক মেঘনাথবধ কাব্য

টিপ্পনী

মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪ খ্রঃ - ১৮৭৩ খ্রীঃ)

বাংলা রেনেসাঁসের সার্থক প্রতিনিধি মধুসুদন দত্ত। মধুসুদন যে কালে জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সে কালের গৌরব অনেক । সে কালের প্রতিভূ হিসাবে মধুসুদসনকে দেখার ভাবনা দীর্ঘদীন ধরে চলে আসছে। নযুগেদর উল্লাস, বেদনা, যন্ত্রনা ও সীমাবদ্ধতা সর্বাধিক গভীর প্রতিফলন তাঁর কাব্য কবিতায় । ভারতচন্দ্রের সম্ভোগময় বিলাসকাব্য, কবিয়ালদের যাযাবতী উদ্দামতাই ছিল ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের পরিবেশ শাষিত রুচি নিষ্ঠার ফসল। শিখিত বাঙালীর মন উচ্চতর সাহিত্যদর্শনের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। কিন্তু উপপযুক্ত প্রতিভার অভাবে কাব্যেরনিবর্বারিনী ধারা যেন অবরুদ্ধ হয়েছিল। প্রতিভার ঐশ্বর্য নিয়ে মধুকবির আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের 'নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ' হলো বহুধারায়। নতুন মানবকতার তিনি মুক্তিদাতা, মধ্যযুগের অন্ধ তমসার্গ থেকে আলোকোজ্বল নতুন পৃথিবীতে পদার্পন তাঁরও পদচিহ্ন ধরে। বাংলা সাহিত্যের কালবদল, জাতবদল পুরোধা তিনিই। তিনি একাই বিশিষ্ট যুগ।

মধুসুদন যে যুগে কাব্যচর্চা করেছেন তার আগে প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে উনিশ শতকের। ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ ও বিস্তার হয়েছে বেছ কয়েকবছর। ইংরাজি শিক্ষা ও কাব্যচর্চার দ্বারা মনের কর্ষন এবং সেই কর্ষিত মানসের স্বর্নপ্রসূ সাফল্যের মাঝখানে কিছু কালব্যবধান থাকবেই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এটাই যে কিছু সামান্য পূর্বে রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ সে ফল ফলল না , ফলল তিলোত্তমাসম্ভব মেঘনাথবধ কাব্যে। মধুসূদন যুগন্ধর, কিন্তু মধুসূদন যুগাতিশায়ী শক্তির অধিকারী। এই শক্তির আবিষ্কারের মধ্যেই তাঁর কবি আত্মার প্রকৃত পরিচয়। যে শক্তিতে তিনি যুগন্ধর ও চিরকালীন, সেই শক্তির উৎস নিশ্চই কেবল যুগের সত্যে নয়, ব্যাক্তির সত্যেও।

নব্য বাংলা সাহিত্য পূর্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল মধূসূদনের সাথনায় । তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি শাশ্বত শিল্পমূল্যে শীর্তস্থানীয়ন। পরবর্তীজ ইতিহাস ব্যাক ও স্থায়ী প্রভাবের জন্য অবশ্যস্মরনযোগ্য । কবির সাহিত্যসাধনার পরিচয় যেমন সৌন্দর্যপভোগের অন্দরমহলে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দেবে, তাঁর জীবনকথাও তেমনি বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান পুরুষ মাইকেল মধূসূদন দত্তের জীবনী ঔজ্জ্বল্যে, বির্যে এবং নাট্যচমকে বিদ্যৎসৃষ্ট।

টিপ্পনী

জন্ম ও শৈশব

মধুসূদন ১৮২৪ সালে ২৫ শে জানুয়ারী যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদেদর কাছে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা রাজনারায়ন দত্ত , মা জাহ্নবী দেবী।রাজনারায়ন ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালোতের একজন খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী এবং সম্পন্ন ব্যাক্তি। কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে তাঁর বসতবাটি ছিল। জাহ্নবী দেবী ছিলেন কাঠিপাড়ার জমিদার গৌরিচরন ঘোষের মেয়ে। গ্রামে মা'র তত্বাবধনে তাঁর শৈশব-শিক্ষা শুরু হয়েছিল। রামায়ন, মহাভারতের প্রতি আকর্ষনের বীজ সম্ভবত এই সূত্রেই তাঁর মনের কোনো উপ্ত হয়।

শিক্ষাজীবন

মধুসূদনের বাবা কলকাতায় কবিকে নিয়ে এসে হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডির্পাটমেন্টের সর্বনিম্ন শ্রেনিতে ভরতি করে দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে সেটি ১৮৩৩ সাল। ১৮৩৪ সালের ৭ মার্চ পত্রিকার ধারাবিবরনীতে দেখা যায় তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরন সভায় ইংরাজি নাটক থেকে আবৃত্তি করেছিলেন। সেকালে হিন্দু কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সকলেই স্বীকার করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে - "মধুসুদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন ইহার পূর্ন যৌবনাবস্থা । ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগনের গৌরবে হিন্দু কলেজ তখন বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সবোর্চ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও ডিরোজিয়ো সে কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন, গনিতশাস্ত্রবিদ্, রিজ্ হালফোড এবং ক্লিন্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগন ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। জোন্ম সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এক এক বিষয়ে, এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি ছিলেন ; সুতরাং মধূসূদন, সে সময়ে এদেশের পথে যতদূর সম্ভব ততদূর উৎকর্ষ শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।" (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত)

কাব্যপ্রতিভা

ছাত্রজীবনেই মধুসূদন কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন । তিনি ইংরেজী ভাষাতেই কবিতা রচনা করতেন এবং ভবিষ্যতে মহাকাব্য রচনার আশা পোষন করতেন। রিচার্ডসন

সাহেব তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, 'ইংরেজী সাহিত্যে সেই সময় কোন ছাত্রই মধুসূদনের সমকক্ষ ছিল না।'

কলেজে পাঠকালে তিনি তাঁর একবন্ধুকে বলেছিলেন, 'I happen to be great poet, with I am almost sure I shall be.' তাঁর এই উচ্চাশা পরবর্তীকালে ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতে ১৮৪৩ সালে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষীত হন এবং 'মাইকেল' নামে অভিহিত হন। ধর্মান্তরিত হবার ফলে তাঁর হিন্দুকলেজে পড়বার অধিকার নষ্ঠ হয়। পরে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকেই সকলের অজ্ঞাতে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ চলে যান এবং সেখানে শিক্ষকতা ও সাময়কপত্রে পরিচালনায় নিযুক্ত হন। এইখানে তিনি রেবেকা নামে এক ইংরেজ কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরে এমেলিয়া হনরিয়েটা নামে এক অধ্যাপকের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁর জীবন মরনের সঙ্গী। মাদ্রাজে বাসকালে তিনি তামিল, তেলেগু, গ্রিক ও হিব্রুভাষায় অধিকার অজর্ন করে। এর আগে ইংরেজী সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিকত 'Madras Circulator' পত্রিকায় মধুসূদন 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে 'A Vision Captive Ladie' শীর্ষক একখানি ইংরেজী কাব্যে পৃথ্বীরাজ - সংযুজক্তার কাহিনী বর্ননা করেন। এই কাব্যটি লিখে তিনি যতখানি যশ আশা করেছিলেন, ততখানি তো পেলেনেই না বরং শেতাঙ্গ সম্পাদকের কাছ থেকে ভৎর্সনা লাভ করললেন। বেথুন সাহেব এ কাব্য পড়ে মধুসূদনের প্রভূত প্রশংসা করলেন কিন্তু গৌরদাস লিখলেন যে, 'মধুসূদন যদি মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত করেন তবে তিনি স্বদেশেরও উপকার করবেন এবং নিজেও খ্যাতিলাভ করবেন।' গৌরদাস বসাক এটি বন্ধুকে জানিয়ে দিললেন এবং বেথুন সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে মধুসুদনকে বাংলা কাব্যে অবতীর্ন হতে অনুরোধ করলেন। মাদ্রাজ গমনের তিনবছর পর জননী জাহ্নবী দেবী পরলেক গমন করেন। ১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী পিতা রাজনারায়ন দত্তের মৃত্যু হয়।

১৮৫৬ সালে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পুলিশ কোর্টে চাকরি গ্রহন করেন। এই সময় বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসেন। এখানে 'রত্নাবলী' নামক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অণুবাদ অভিনীত হতে দেখে বাংলা নাটক সম্পর্কে অবহিত হন।খ আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার মাধ্যমে। নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি লিখিছিলেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গ
নিরখিয়া প্রানে নাহি সয়।"

'শর্মিষ্ঠা' নাটক বাংলা সাহিত্য-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র ইংহ প্রমুখ বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিগন সকলেই নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম পাশ্চাত্যধর্মী নাটক বললে মনে করা হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুটি প্রহসন রচনা করলেন। বাংলা নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি বীরবস প্রকাশের উপযোগী ভাষার অভাববোধ করছিলেন । অভাব বোধ করছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাববহনকারী ছন্দের। এই অভাব দূর করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। পদ্মাবতী নাটকে এই ছন্দের ব্যবহার করলেন।

এরপর তিনি মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। পরথমে এই ছন্দের শক্তি পরীক্ষার জন্য তিনি রচনা করলেন মহাকাব্য জাতীয় একটি খন্ডকাব্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' বাংলাভাষায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দের' প্রবর্তন মধুসূদনের দ্বিতীয় কীর্তি।

১৮৬১ সালে লিখলেন অমর মহাকাব্য 'মেঘনাথবধ কাব্য'। কাব্যটি নব্যযুগের কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবির অক্ষব কীর্তিস্তম্ভরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কাব্যটি কবিকে খ্যাতির স্বর্নশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। কাব্যটিতে 'Literary Epic'এর বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে। মহাকাব্যিক বিশালতা ও গাম্ভীর্য, সমুন্নতি ও উদারতা, ন্যায়-ধর্ম ও কল্যানবোধ প্রভৃতি লক্ষন এই কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

মধুসূদন ছিলেন জাতকবি। তাই মহাকাব্য লিখে গীতিপ্রবন মন যথার্থ আনন্দলাভ করতে পারেনি। তাই মহাকাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখলেন ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে । একই বছরেই তিনি রচনা করেন বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। মেঘনাথবধ কাব্য রচনা করে মধুসূদন 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের যর্থাথজ শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু বিরবস নয়, সমস্ত রসই এই ছন্দকে যে বহন রে প্রকাশিত হতে পারে তার প্রমাণ বীরাঙ্গনা। বাংলা ভাষায় পত্রকাব্য রচনার এটি প্রথম এবং সার্থকতম নিদর্শন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধুর্য এই কাব্যে পরিপূর্নতা লাভ করেছে।

১৮৬২ সালে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই অর্থকষ্টে পড়ে তিনি ফরাসীদেশের ভার্সাই নগরীতে উপনীত হন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব

বর্জিত হয়ে তাঁর মনে পড়েছিল দূরে ফেলে রেখে আসা মাতৃভূমির কথা। এখানেই অভিব্যক্ত হল তাঁর কবিপরাণ চতুর্দশীপদী কবিতাবলী। সেখানে নিদারুন অর্থ কষ্ঠে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের সহায়তায় রক্ষা পান।

১৮৬৬ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৬৭ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর মাইকেল মধুসূদন জীবননির্বাহে কষ্ঠকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। আবার সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োজিত করেন নিজেকে। হোমার এর 'ইলিয়াড়' কাব্যের অনুবাদ গদ্যভাষায় লিখলেন মধুসূদন 'হেক্টর বধ' এই পর্বের 'মায়াকানন' নামক নাটিকাটও ট্রাজেডি নাটক হিসেবে উল্লেখত হয়। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আর্বিভাব উজ্জ্বল ধূমকেতুর মতো, তাঁর তিরোধান ও আকস্মিক।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার এবং বাংলা সাহিত্যে বহুবিধ ধারার প্রবর্তক মধুসূদন। তিনি যে সময়ে জন্মেছিলেন, সে সময় বাঙালী মানসে ছিলো ঝড় তুফানের কাল। প্রাচ্য ও নব্যের সংঘর্তে সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক বিপ্লব। সেই বিপ্লব থেকেই সৃষ্টি হল নবজাগরন। ফলস্বরূপ তিনটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়-

(১) অতীতের সবকিউছুকে পরিত্যাগ করে নবীন ইওরোপীয় চেতনাকে গ্রহন করা হল

(২) সাগর পারের আমদানি করা এই নতুন মন্ত্র আমাদের দেশীয় ঐতিহ, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিরোধী, তাই সেটি বজর্ন করতে হবে।

(৩) আমাদের জীবন বিশ্বাসের মধ্যে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিল সেগুলিকে দূর করে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইওরোপীয় সংস্কৃতিকে মিলিয়ে গ্রহন করতে হবে।

নতুনকে পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহন করা ছাড়া উপায় ছিল না সেযুগে। কারন সে সময়ে একদিকে নতুন শাসকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্য পুরাতন সমাজ এবং অর্থনীতিতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বাঙলী এক নতুন উন্মাদনা অনুভব করল, আবিষকার করল নিজেকে এবং চারপাশকে। এরূপ যুগ পটভূমিতে মধুসূদনের আর্বিভাব।

বাংলা কাব্যজগতে মধুকবি বিভিন্ন রীতির প্রবর্তক। নিজের জীবনের ব্যাথা-বেদনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি বাংলা কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সম্বন্বয় সাধন করেছেন। শুধু ছন্দের ক্ষেত্রেই নয়, সাবলীল বাক্‌রীতিতে, চিত্রকলা এবং অলংকারের প্রয়োগে তাঁর কাব্য মহান হয়ে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার' গ্রন্থে বলেছেন, 'তিনি কলম্বাসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্রপথে অতিক্রম করিয়া নুতন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নব্যাবিঙ্গকৃত ভূমিখন্ডে নানা বিচিত্র চাঁদের উপনিবেশ পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না। বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিক মহাদেশের আবিষ্কারের জয়মাল্য চিরদিন তাঁর কণ্ঠে অম্লান হইয়া থাকিবে।' বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছিলেন - "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেবসআমী। শ্রী হর্তের কথা বিবাদের স্থল - নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ত বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

স্মরনীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদসাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায় বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদনের নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। সুপ্রবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।"

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাথবধ কাব্য

মেঘনাথবধ কাব্য মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'Will not this make me immortal ?' 'মেঘনাথবধ কাব্য'- এর প্রুফ সংশোধনের সময় বন্ধু রাজনারায়ন বসুকে এই প্রশ্ন করেছিলেন মধুসূদন, এবং এর প্রশ্নের উত্তর সদর্থক বলাই বাহুল্য। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এর অভিনবত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। একদিকে ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু; অন্যদিকে উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে কাব্যটি অনবদ্য। প্রগতিশীল পাশ্চাত্যভাবনার অনুগামী পাঠকেরা এই কাব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার শুভ সূচনা হয়েছে বলে মনে করেন। রাজনারায়ন বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ বন্ধুজনকে মধুকবির বিভিন্ন সময়ে ইংরেজীতে চিঠি লেখার মাধ্যমেও এই কাব্যরচনার পূর্বে ও সমকালে তার নিরলস পরিশ্রম ও প্রস্তুতির বিবরণ জানা যায় ল তাঁর পত্রাবলীর তথ্য উৎস থেকেই 'মেঘনাথবধ কাব্য' রচনার প্রেক্ষাপট এবং তাঁর সেই সংক্রান্ত পঠনপাঠনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মেঘানাথবধ কাব্য রচনাকালে কবি মনের দিক থেকে সর্বাধিক দ্বিধামুক্ত হয়েছিলেন। আপন ক্ষমতাকে যাচাই করে নেবার যে সাধনা তিলোত্তমায় নির্মানের আগুন

জ্বালিয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে। আপন ক্ষমতায় উদ্বোধনে কবিপ্রাণ ভরসার আশ্রয় পেয়েছে। এবারে ক্ষমতা যাচাইয়ের ছেলেমানুষী নয় আর। সৃজনের নিশ্চিত লক্ষ্যাভিমুখে পরম যাত্রা।

টিপ্পনী

কবি যশঃপ্রার্থী মধুসূদন যখন কলকাতায় এলেন তখন তিনি বিশিষ্ট ইংরেজ জানা বাঙালী, ব্যর্থ ইংরেজি কাব্যের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশাধিকার তখনও প্রমানিত হয় নি। সম্ভবত ১৮৬০ সালে জুন-জুলাই মাসে তিনি মেঘনাথবধ কাব রচনা করেন। ১৮৫৮ সালে জুন-জুলাই মাসে শর্মিষ্ঠা নাটক রচিত হয়। সমকালের মানদন্ডে উল্লেক নাটক, প্রথম সার্থক প্রহসন রচনা করে মধুসূদনের আত্মশ্লাঘা কিছুটা তৃপ্ত হয়, ক্যাপটিভ লেডি রচনার পর প্রতিকূল সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ বিথিত হৃদয়ে আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে আসে। পদ্মাবতী নাটকে গ্রীক পুরানের কাহিনীর বাঙালীকরন ঘটে। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। তার মধ্য দিয়েও আসে নব-পথিকৃতের সম্মানলাভ রসজ্ঞ সমালোচকদের প্রশংসা বর্ষনে। তিলোত্তমার গাম্ভীর্যের পরেই ব্রজঙ্গনার ললিত পেলবতায়ও তিনি হাত পাকান। ব্রজঙ্গনার প্রথম দিকের কবিতাগুলি তিলোত্তমার শেষ হবার পূর্বেই রিত। কাজেই মেঘনাথবধ কাব্য রচনা আরম্ভের পূর্বে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রবেশের ছাড়পত্র পান নি, ইতিহাস সৃষ্টির মর্যাদা লাভ অনিবার্য ছিল। মধুসূদনের মধ্যে জয়লাভ-ইচ্ছুক যে সত্তাটি চিরকাল বাস করত, জীবনের নানা কার্যে প্রবৃত্তি জুগিয়েছে সেই বিশেষ মনোবনৃত্তিটিই। কবি পরবর্তী কালে বারবার যে যশোলাভের কামনা ব্যক্ত করেছেন, কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে যে অমরত্বের সাধনা করেছেন, ঐ জিগীষাবৃত্তিতেই তার উদ্ভব। কবির এই জিগীতাবৃত্তি আজ বহুলাংশে তৃপ্ত। কাজেই কেবলমাত্র সেই বৃত্তির প্রেরনায় বিচিত্র পথে ছুটে বেড়াবার প্রয়োজন অনেকখানি সংযত হয়েছে। ভারতীয় মহাকাব্য থেকে গ্রীক মহাকাব্য, আবার সঙ্গে বর্তমান সমাজজীবন - কি বিচিত্র ভাববস্তু একইকালে কবি কাব্যও নাট্যবদ্ধ করেছেন। তিলোত্তমার গাম্ভীর্য আর ব্রজাঙ্গনার কোমলতা, একের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অপরের মিত্রাক্ষর বিচিত্র জটিলতা একই সময় আরও করার সাধনার তিনি সিদ্ধ। স্রষ্টা মানসের এই বহুমুখী গতি বিচিত্র বলে প্রশংসনীয়।

মেঘনাথবধ কাব্য রচনাকালে মধুসূদন যশস্বী লেখক। বাংলা সাহিত্যে নতুনের দ্বার উন্মোচন করেছেন বলেও কোনো কোনো মহল থেকে ইতিমধ্যেই তিনি অভিনন্দিত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তার মত দ্রুতগামী ও অতিব্যস্ত লেখকের পক্ষে প্রস্তুতির সাধনা যথেষ্টেই হয়েছে, গ্রীক পুরান কাহিনীর বাঙালীকরন যেমন অংশত সকল হয়েছে তেমনি ভারতীয় রামায়ন-মহাভারতের কাহিনীর নবরূপায়ন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, কবি আত্মার ছন্দ-আধার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে নৈপুন্য এসেছে, গভীর উদাত্ত এবং কোমলকরনে

টিপ্পনী

অধিকার জন্মেছে। এই লগ্নে মেঘানাথবধ রচিত। এর চেয়ে মহালগ্ন তার কর্মজীবনে বোধহয় আর সম্ভব ছিল না। মধুসূদন একটি চিঠিতে বন্ধুকে লিখেছিললেন, "It is my ambition to engraft the exquisite Graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can form Valmiki" গ্রীক পুরানকাহিনী থেকে কাব্য উপাদানের অংশবিশেষ সংগ্রহ করে স্বদেশের মহাকাব রামায়ন থেকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন মধুসূদন। বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসী রামায়নের লঙ্কাকান্ডের অন্তর্গত কাহিনী মেঘনাথবধ কাব্য'র মূল অবলম্বন। রাবনপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাথ সেনাপতি পদে অভিষেক নিকুলিম্ভা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মনের হাতে তার মৃত্যু, রাবনের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশেলে লক্ষ্মন আহত হওয়া এবং মেঘনাথের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া - মোটামুটিভাবে সাড়ে তিনদিনের কাহিনী নিয়ে নয়টি সর্গে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাথবধ কাব্য রচনা করেন। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে ঋনগ্রহন করেছেন। এছাড়া পাশ্চাত্য কাব্য-মহাকাব্য থেকে অথবা নিজস্ব কল্পনাশক্তির সাআয্যে মধুসূদন তাঁর কাব্যের 'মধুচক্র' নির্মান করেছেন।

'মেঘনাথবধ কাব্য' রচনার সময় প্রধানত হোমারের ইলিয়াডই ছিল মধুকবির আদর্শ। বন্ধু রাজনারায়ন বসুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন - "..... if the father of our poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad" ইলিয়াড়ের অন্যতম বীর হেক্টরের আদর্শেই মধুসূদন তাঁর প্রিয় মেঘনাথ চরিত্র নির্মান করেছেন। মেঘনাথবধ কাব্য এর সূচনা অংশ রচনাকালে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশয় থাকলেও মূল রচনা শুরু করে মধুসূদন রামায়নের কাহিনী নিয়ে যে সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। কাব্য রচনাকালে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন - "I am going on with Meghnad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year .... I don't are a pins head of Hinduism. I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry."

রামায়ন কাহিনীর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহল ছিলেন। এই সীমাবদ্ধতার জন্য ইচ্ছামত ঘটনা সংস্থান করা সম্ভব হয় নি। প্রথম থেকেই সম্পূর্ন কাব্যের একটি পরিকল্পনা তিনি করে নিয়েছিলেন। রচনাকালের একট চিঠিতে আছে - "I mean to extend in to 6 সর্গ"। প্রয়োজনমত তিনি চরিত্রের নাম পরিবর্তন করেছেন, সর্বদা সংস্কৃত নিয়ম মানা প্রয়োজনবোধ করেননি। কাব্য সৌন্দর্যের দিক থেকে যা প্রয়োজন গ্রহণ

করবেন, অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করবেন - এছাড়া অন্য কোন নিয়ম মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন , - "The name is 'বরুনানী' but I have turned our one syllable. To my ears this word is not half so musical as 'বারুনী' and I don't know why should bother myself about Sanskrit rules" এইসব বক্তব্য কবির প্রখর কাব্যবোধ ও শিল্প-সচেতনতার পরিচায়ক।

টিপ্পনী

মহাকাব্য রচনার আকাঙ্খা যে মধুসূদন কৈশোর থেকে লালন করেছিলেন, এ কথা সকলেরই জানা। 'মেঘনাথবধ কাব্য' এর প্রারম্ভেই কবির সজ্ঞান অভিপ্রায়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যখন তিনি বলেছেন - "গাহিব মা বীরবসে ভাসি / মহাগীত।" অর্থাৎ বীরবস প্রধান মহাকাব্য রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রাচীনকাল থেকে মধুসূদনের কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচিত হয় নি, বাংলা কাব্য চিরকালই গীতিপ্রধান। তাই বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার আকাঙ্খাও মধুসূদননের হৃদয়ে জাগরুক থাকা সম্ভব। যে কাহিনী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই কাহিনী থেকেই তিনি তাঁর বিষয়স্তু আহরন করলেন।

মেঘনাদবধ কাব্য দুখন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়নারী প্রথম পাঁচটি সর্গ নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম খন্ড। বাকি চারটি সর্গ নিয়ে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধের মধ্যেই।

মেঘনাথবধ কাব্য সম্পর্কে সমসাময়িক সমালোচকদের অভিমত

'মেঘনাধবধ কাব্য প্রকাশের পর একাধিক সমমালোচক নানা অভিমত প্রকাশ করেন। এ ধরননের কিছু মন্তব্য উদ্ধার করা গেল।

রাজনারায়ন বসু

কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাজনারায়ন বসু। এই কাব্যের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কবি স্বয়ং যদিও রচনাকালে পান্ডুলিপি পাঠিয়ে মতামত ও পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাজনারায়ন লিখেছেন, "জাতীয় ভাব বোধহয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেরূপ অল্প পরিলক্ষিত হয় অন্য কোন বাঙালী তেমন হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু-পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যান্টালুন দেখা যায়।

টিপ্পনী

আর্যকুলসূর্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাষ্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্তই কাপুরুষের ন্যায় আচরন করানো, ঘর ও দূষনের মৃত্যু অবতারন রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে এতপুরে স্থাপন, বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন এবং তার বিদ্যোৎসাহীনী সভার পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করছিলেন। তিনি মেঘনাথবধ কাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যে একপ্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয় সরস্বতী ও জানিতেন না। ..... লোকে অপার ক্লেশ করিয়া জলধি-জল গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কতার্থ হইয়াছি। এক্ষনে আমরা মনে করিলে শিরোভূষনে ভূষিত করিতে পারি একপ্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয় সরস্বতী জানিতেন না। ..... লোকো অপার ক্লেশ করিয়া জলধি-জল হিতে রত্ন উদ্ধারপূর্বক বহু মনি অলঙ্কার সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি । এক্ষনে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষনে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতে ও সমর্থ হই।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত মেঘনাথবধ কাব্য এর দ্বিতীয় সংস্করনের ভূমিকায় হেমচন্দ্র লিখেছিলেন, "এই গ্রন্থখানিতে গ্রথকর্তা যে অসামন্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাদৈষ্টে বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইতে হয় - সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ..... সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদেদর কাব্যোদান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে,কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিয়ে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হিয়াছে, তাহা বঙ্গবাসী চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারন করিবেন। ..... যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমনীয় এং ভয়াবহ প্রানী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকালে বর্তমান এবং অদৃশ্যে বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয় - যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুনরসে আদ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল

লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গাসীরা চিরকাল বক্ষস্থলে ধারন করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'মেঘনাথ বধ কাব্য' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্বপূর্ন সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "The meghnadbadh is Mr Dutta's great work. The sbject is taken from the Ramayana, the Source of inspiration to so many Indian poets. In the was with Ravana Meghnada, the most heroic of Ravan's sons and warriors, is slain y Laksman, Ram's brothedr. This is the subject and Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But nevertheless the poem is his own work from beginning to end. The scencs, characters machinery and episodes are in many respects of Mr. Duttg a has displayed a high oder of art .....To ttomer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken and his poem is on the whole the most valuable work in morden Bengali literature.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘনাথবধ কাব্য এর কবিকল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করে যা বলেছিলেন তা উদ্ধারযোগ্য - " মেঘনাথবধ কাব্যে, কেবল ছন্দবন্ধে ও রচনা প্রনালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। তিনি (মধুসুদন) স্বতস্ফূর্ত প্রচন্ড লীলার মধ্যে আন্দবোধ করিয়াছেন; ইহার রথ-রথি অশ্বে গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। .... যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না- কবি সেই ধর্ম্মাবিদ্রোহী মহাদন্ডের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালামানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

টিপ্পনী

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে

বাগদেবী সরস্বতী ও কল্পনাদেবীর বন্দনা করে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্য শুরু করেছেন। পাত্রমিত্রসভাসদ বেষ্ঠিত লঙ্কার রাজসভায় রাজসিংহাসনে আসীন রাবন। ভগ্নদূত মকরাক্ষের মুখে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত ও বিচলিত রাবনকে মন্ত্রী সারন সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। দূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের কাহিনী শুনে যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য রাবন পাত্রমিত্রসহ প্রাসাদশিখরে আরোহন করলেন। বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর জন্য রাবনকে তীব্র ধিক্কার দিলেন। ক্ষুদ্ধ রাবন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নিলেন। তাঁর যুদ্ধসজ্জার কথা ধাত্রী প্রভাষার মুখে শুনে মেঘনাথ প্রমোদ উদ্যান থেকে এসে রাবনের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধে যাত্রার অনুমতি চাইলেন পিতার কাছে। রাবন অনুমতি দিলেন কিন্তু মেঘনাথ যেন স্বীয় ইষ্টদেব অগ্নির উদ্দেশ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পূর্ন করে পরদিন যুদ্ধযা্রা করেন - এইরূপ আদেশ দিলেন। যথাবিধি অভিষেক করে রাবন মেঘনাথকে সেনাপতিপদে বরন করলেন। এই সর্গের নাম অভিষেক।

দ্বিতীয় সর্গের নাম অস্ত্রলাভ। এর ঘটনাসংস্থান সর্গে। দেবসভায় আবির্ভূতা হয়ে লক্ষ্মীদেবী দেবরাজ ইন্দ্রকে জানালেন যে, বীর ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে প্রভাতে রাম-লক্ষ্মনকে আক্রমন করবেন। এই আসন্ন বিপদ থেকে রামচন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য তিনি ইন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ইন্দ্র নিজেই মেঘনাথের ভয়ে ভীত। এই সংকট থেকে শুধুমাত্র মহাদেবই ত্রান করতে পারেন। তাই ইন্দ্র পত্নী শচীকে নিয়ে কৈলাশে উপস্থিত হলেন এবং পাবর্তীকে সমস্ত কথা জানিয়ে রামচন্দ্রকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালেন। বিপন্ন রামচন্দ্র ও মর্ত্যে দেবীর অনুগ্রহ কামনা করে পূজা করছিলেন। ভক্তের প্রার্থনায় বিচলিত দেবী মহাদেবের তপোভঙ্গ করলেন। মহাদেব মেঘনাথ বধের জন্য মায়াদেবীর সাহায্য গ্রহনের উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র মায়াদেবীর কাছ থেকে দৈব অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে স্বর্গে ফিরে এলেন এবং গন্ধর্বপতি চিত্ররথকে সেগুলি রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয় সর্গের নাম সমাকগম। প্রমোদ উদ্যান থেকে মেঘনাথপত্নী প্রমীলার লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন এই সর্গের বিতয়। স্বামী মেঘনাথের ফিরে আসার সময় পেরিয়ে গেলে প্রমীলা শত্রুবূহ্য ভেদ করে লঙ্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি নারী সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করেন। রামচন্দ্র উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে প্রমীলাকে সৈন্যসহ লঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি দেন। প্রমীলা নিরাপদে রাজপ্রাসাদে এসে মেঘনাদের

সঙ্গে মিলিত হন। কৈলাসে পার্বতী স্থির করেন প্রমীলার মধ্যে তাঁর যে শক্তির অংশ আছে তা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি প্রমীলাকে শক্তিহীনা করবেন। এর দ্বারা লক্ষ্মনেদর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

চতুর্থ সর্গের নাম অশোক বন। এখানে সীতা রাবন কর্তৃক বন্দী হবে রয়েছেন। বিভীষন পত্নী সরমা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন। তাদের মধ্যে সুখদুঃখের কথাহয়। সরমার কৌতূহল নিবৃত করার জন্য সীতা তাঁর জীবনকাহিনী বিবৃত করেন। সীতার শান্ত, ক্ষমাশীল চরিত্রটির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এই অংশে ধরা পড়েছে।

পঞ্চম সর্গের নাম উদ্যোগ। এই সর্গের ঘটনাগুলি স্বর্গে ও মর্তে ব্যাপ্ত। স্বর্গে ইন্দ্র ও শচী ইন্দ্রজিতের নিধর সম্পর্কে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। মায়াদেবীর আশ্বাসে ইন্দ্র অনেকটা আশ্বস্ত। মর্তে লক্ষমন ও স্বপ্নাদেশ পেয়ে চন্ডীদেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা করে বরলাভ করলেন। একাজে লক্ষ্মনকে নানা বিপদ ও বাধা পার হতে হল। বিপদ ও বিঘ্ন অতিক্রমের চেষ্টা ও সাফল্যে লক্ষ্মনের অমিত তেজ ও সাহস প্রতিপন্ন হল। অন্যদিকে মাতা মন্দোরী ও পতনী পত্নী প্রমিলার কাছ থেকে মেঘনাদের বিদায় গ্রহন। দুজনকেই তিনি আশ্বাস দিলেন যে যজ্ঞ সমাপান্তে শত্রুনিধন করে তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন। মন্দোদরী অনেক দ্বিধায় পুত্রকে যুদ্ধার্থে বিদায় দিয়ে পুত্রবধূ প্রমীলাকে কাছে রাখলেন।

ষষ্ঠ সর্গের নাম 'বধ'। এই সর্গে আছে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাথ হত্যার মূল ঘটনা। যজ্ঞশেষে ইন্দ্রজিৎ ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে উঠে দেখলেন লক্ষ্মনের বেশে যেন অগ্নিদেব উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু অচিরেই তার ভুল ভাঙ্গল। লক্ষ্মনের কাছে তিনিই তখন বীরধর্ম পালন করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু লক্ষ্মন তা উপেক্ষা করে নিরস্ত্র মেঘনাথকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে লক্ষমন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে বের হতে গিয়ে মেঘানাদ দেখলেন দরজার পপাশে দাঁড়িয়ে আছেন সশস্ত্র বিভীষন। তিনি বিভীষনকে তীব্র ধিক্কার দিলেন। দরজা ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে মেঘনাদ আবেদন করলেন। কিন্তু বিভীষন পথট আটকে রইলেন। মায়াদেবীর যত্নে লক্ষ্মন জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মেঘনাদকে ক্ষতবিক্ষত করে শেষে তাকে খড়্গ দ্বারা বধ করলেন।

সপ্তম সর্গের নাম 'শক্তি নির্ভেদ'। এই সর্গের প্রধান ঘটনা হল অন্যায়ভাবে মেঘনাদ হত্যার ঘটনা বীরভদ্রের মুখে শুনে রাবনের তীব্র প্রতিক্রিয়া। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মনকে বিধস্ত করেন। রাবনের সৈন্যসমাবেশে উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্মী ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য। মহাদেব রাবনকে দান করেন রুদ্রতেজ। অপরাজেয় রাবনের সামনে গরুড়, কার্তিকসহ রামচন্দ্রের পরধান

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সেনানায়করে সকলেই পরাস্ত হন। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মন ভূপতিত হলে রাবনের ক্রোধের প্রশমন হয়। মহাদেবদূত বীরভদ্রের অনুরোধে রাবন ফিরে যান।

অষ্টম সর্গের নাম প্রেতপরী। লক্ষ্মনের দুর্দশায় শোকে মর্মাহত রামচন্দ্রের করুন অবস্থা দেখে দেবী পার্বতী অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলেন। মহাদেব পার্বতীর দুঃখের কারন জেনে প্রতিকারের উপায় বলে দিলেন। মায়াদেবী রামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রেতপুরীতে যাবেন, সেখানে দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এবং দশরথ রামকে লক্ষ্মনের জীবনলাভের উপায় বলে দেবেন। এই সূত্রে মধুসূদন প্রেতপুরীর এক সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। সুদীর্ঘ নরক পরিক্রমার শেষে রামচন্দ্রের সঙ্গে দশরথের সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে। অশরীরী দশরথ লক্ষ্মনের প্রাণ ফিরে পাওয়ার উপায় জানালেন। সুগন্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গ থেকে বিশল্যকরনী নামক স্বর্নাভ লতা এনে চিকিৎসা করলে ফললাভ হবে। রামচন্দ্র সবিষ্ময়ে পিতাকে প্রনাম করে লঙ্কার উদ্দেশ্যে প্রত্যাগমন করলেন।

নবম সর্গের মূল ঘটনা মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।ঔ তাই এর নামকরন করা হয়েছে 'সংস্ক্রিয়া' একদিকে রামচন্দ্রের শিবিরে উল্লাস আনন্দের উচ্ছাস এবং অপরদিকে লঙ্কাপুরীতে হতাশা ও শোকের প্রকাশ এই সর্গে বর্নিত হয়েছে। শোকাভিভূত রাবন বুঝতে পারলেন নিয়তি অনিবার্য ও আসন্ন ধ্বংসের দিকে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। চরম শক্তি পরীক্ষার আছে তিনি মৃত পুত্রের অন্ত্যেষ্টির জন্য সাতদিন সময় প্রার্থনা করললেন এবং রামচন্দ্র তা পূর্ন করলেন। শোকযাত্রা নিহত বীর মেঘনাদের মৃতদেহ বহন করে সমুদ্রতীরে শ্মশানে উপস্থিত হল। প্রমীলাও সহমরননের উদ্দেশ্যে শ্মশাএ উপস্থিত। নিদারুন এই ঘটনার তত্ত্বধান করছেন স্বয়ং রাবন। মেঘাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে শতশত রথীসহ অঙ্গদ রামচন্দ্রের পক্ষ থেকে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। আকাশপথে আবির্ভূত হলেন দেবতারা। শাস্ত্রীয় কৃত্যাদি সম্পন্ন করে মেঘনাথের দেহ চিতায় স্থাপন করা হল, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে প্রমীলাওচিতায় আরোহন করলেন। তীব্র বেদনা নিয়ে রাবনপুত্র ও পুত্রপধূর প্রতি শেষ বিদায়বানী উচ্চারন করলেন। রাবনের দুঃখে কৈলাসে মেঘনাদ অধীর হলে পার্বতী তাকে শান্ত করলেন। অগ্নিদেবতা মহাদেবের আদেশেএ চিতা প্রজ্বলিত করে তুললেন। সকলে সচকিত হয়ে দেখলেন আগ্নেয় পথে আসীন মেঘনাদ পত্নীসহ আকাশপথে অদৃশ্য হলেন। দুগ্ধধারায় চিতা নির্বারিত করা হল। চিতাভষ্ম সকলে সমুদ্র জলে বিসর্জন দিল। লক্ষ রাক্ষস শিল্পী দ্রুত চিতার উপর এক অভ্রভেদী মঠ নির্মান করল। সমুদ্রে স্নান করে রাক্ষসগন অশ্রুবর্তন করতে করতে শূন্যমনে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করল। সপ্তদিবানিশি লঙ্কাবাসিগন শোক পালন করল।

রামায়ন ও মেঘনাদবধ কাব্য : মধুসূদননের নিজস্বতা

টিপ্পনী

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটণা লক্ষমন কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের মৃত্যু। ঘটণাটি রাময়ন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে উপস্থাপন রার বিষয়ে কবি সম্পূর্ণস্বাধীনতা গ্রহন করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন - "In the poem, I(meen to give free scope to my inventing power (such as they are) and to borrow as little as Icon from Valmiki" বাল্মীকি ছাড়া কৃত্তিবাস, ভবভূতি এবং কালিদাস এর বিভিন্ন কাব্যের ঘটনাধারা অনুসরন করে তিনি মেঘনাদবধ মাব্যের কাহিনী ও চরিত্র নির্মান করেছেন । মধুসূদনের কাব্যের ঘটনাবলী রামায়নের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কবিকর্তৃক পরিবর্তন বা রূপান্তর সাধনের স্বরূপটি বোঝা যাবে । কাব্যের সূচনা হয়েছে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ বয়ে এনেছে ভগ্নদূত মকরাক্ষ। শোকার্ত রাবন বীরবাহুর মৃত্যুর পর যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হয়েছেন।ও সেকথা শুনে মেঘনাদ নিরস্ত্র করেছেন পিতাকে। নিজ সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ পোরিচালনার দায়িত্ব গ্রহনের জন্য প্রার্থনা কিরেছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়নে মেঘনাদের সেনাপতি হওয়ার ঘটনা বীরবাহুর মৃত্যুর পর নয়, মকরাক্ষের মৃত্যুর পর আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ন থেকে বীরবাহুর মৃত্যুপ্রসঙ্গ গ্রহন করা হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রেই মধুসূদন বাল্মীকির রাময়ন থেকে কৃত্তিবাসের রামায়নকেই বেশী অনুসরন করেছেন।

দ্বিতীয় সর্গের ঘটনাগুলি মধুসূদনের নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট । এর সঙ্গে রাময়নের কোনো সম্পর্ক নেই। এই সর্গে লক্ষমী, ইন্দ্র-শচী, কাম-রতি, হর-পার্বতী, মায়াদেবী প্রমুখ দেবদেবীর কার্যকলাপ, মেঘাদকে হত্যার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের কাহিনী হোমারের ইলিয়াড় মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে বর্নিত ঘটনাবলীর অনুসরনে রচিত। গ্রীকদেব-দেবীর চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য ও কবি ভারতীয় দেব-দেবীর ওপর আরোপ করেছেন।

তৃতীয় সর্গের মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার প্রসঙ্গটিও কবি নির্মিত। মেঘনাদবধ কাব এর প্রমীলাকে রামায়নে পাওয়া যাবে না। তবে কাশীরাম দাস বর্নিত বীরঙ্গনার প্রভাব এই চরিত্রের উপর পড়েছে।

চতুর্থ সর্গে অশোকবনের বন্দিনী সীতার বর্ননা মূলোত বাল্মীকি রামায়ন থেকে নেওয়া হয়েছে। সীতার স্মৃতিচারনায়, সরমার সঙ্গে কথোপকথনে সুকৌশলে কবি র্পূের কাহিনীকে বিবৃত করেছেন। সীতা ও সরমার মাধ্যমে স্নিগ্ধ বধূ-মূর্তির কল্পনা মধুসূদননের নিজস্ব সৃষ্টি বলা চলে । প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় এই সর্গে কবি মধুসূদন ভবভূতির 'উত্তামচরিত' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

টিপ্পনী

পঞ্চম সর্গের ঘটনা স্বর্গ-মর্তব্যাপী। স্বর্গের একট এবং মর্ত্যের দুটিই ঘটনা এখানে আঁকা হয়েছে। মধুসূদনের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে দেবতাদের ষড়যন্ত্রের উদ্যোগে। স্বর্গ-মর্ত্যের বিস্তৃত চিত্র রচনায়, লক্ষ্মনের প্রচলিত বীরমূর্তি অঙ্কনে। মন্দোদরী চরিত্র চিত্রনেও মধুসূদনের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্বে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে মধুসূদন সম্পূর্ন সরে এসে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

ষষ্ঠ সর্গের ঘটনা অনেকটাই মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাথকে লক্ষ্মনের টরবারির আঘাতে হত্যার কথা বাল্মীকি রামায়নের কৃত্তিবাসে নেই। উভব ক্ষেত্রেই সশস্ত্র মেঘনাথের সঙ্গে লক্ষ্মনের নিহত হওয়ার কথা আছে। শুধু তাই নয় বাল্মীকি রামায়নের ইন্দ্বান এবং কৃত্তিবাসী রামায়নে ব্রহ্মাস্ত্র পরয়োগের কথা বলা হয়েছে, মধুসূদনের কাব্যেও দিব্যাস্ত্রের কথা আছে। তবে এখানে অস্ত্রহীন মেঘনাদকে হত্যার ক্ষেত্রে লক্ষমনকে নিতান্ত কাপুরুষের মতো আচরন করতে দেখা গেছে। মেঘনাদের অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরনের ঘটনাকে গৌরময় ও দুঃখজনক করে তোলার জন্যই যেন মধুসূদন কল্পনার এই স্বাধীনতাটুকু দেখিয়েছেন। বস্তুত মেঘনাদ ছিল কবির প্রিয়তম চরিত্র। তিনি স্বয়ং একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, "..... It cost me many a tean to kill him"। রামচন্দ্রের দুর্বলতাও বানরসেনার স্পর্ধা তাঁর অপছন্দ ছিল। একটি চিঠিতে কবি সেকথার উল্লেখও করেছিলেন, "I despise Ram and his rabbles"। রাক্ষসবংশের প্রতি কবির পক্ষপাতই এই ঘটনাগত রিবর্তনের প্রকৃত কারণ।

সপ্তম সর্গের রাবন ও লক্ষ্মনের যেদ্ধের যে বর্ননা করেছে তা রামায়নের অনুসরনে রচিত হলেও উভয়ের হুবহু মিল পাওয়া যায় না। মেঘনাদ বধ কাব্যের যুদ্ধের দৃশ্যটি সম্পূর্নভাবে রাবন চরিত্রের বীরভাব প্রকাশের অনুকূলে দেখানো হয়েছে। বীরভদ্রকে পাঠিয়ে মহাদেবের লঙ্কেশ্বরকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত্র করার ঘটনাটিও যথেষ্ট নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনাও মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিত, রামায়নের সঙ্গে তার কীছুমাত্র সম্পর্ক নেই। মহাদেবের নির্দেশে মায়াদেবীর সঙ্গে প্রেতপুরীতে গিয়ে রামচন্দ্র দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্মনকে সঞ্জীহিত করবার ঔষধ জেনে এসেছেন। এই সর্গে প্রেতপুরী বর্ণনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যই কবি রামায়নের কাহিনীর গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন সাধন করেছেন। রামচনদ্রের প্রেতপুরী দর্শনের যে বর্ণনা আছে তা প্রধানত ভার্জিল ও দান্তের কাব্য থেকে গৃহীত। নরকের ভয়ংকরতা ও বীভৎসতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করে মধুসূদন ভয়ানক ও বীভৎসরস সৃষ্টি করেছেন।

নবম সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যোষ্টির বর্ণনা ও মধুসূদের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত, কাহিনীর কাঠামোর জন্য প্রচলিত রামায়নকে যতটা অনুসরন করা প্রয়োজন মধুসূদন ততটাই করেছেন। কিন্তু তাঁর সুবৃহৎ পরকল্পননার প্রায় সম্পূর্নই স্বাধীন কল্পনার ওপর নির্ভর করে রচিত। তিনি যে আধুনিক ধ্যান-ধারনা প্রকাশের প্রেরনায় রামায়নের কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন। সেই প্রেরনার বশেই কাহিনীতে, চরিত্রচিত্রনে গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন সাধন অনিবনার্যহয়ে উঠেছিল।

টিপ্পনী

মহাকাব্যের প্রকৃতি ও মেঘনাদবধ কাব্য

সাহিত্য সমালোচনায় মহাকাব্যকে দুটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায় - (1) Authertic Epic এবং (2) Literary Epic। কেউ কেউ মনে করেন মহাকাব্য অতীত যুগের সৃষ্টি। আধুনিক কালে খাঁট মহাকাব্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বে এবং ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে একজাতীয় কৃত্রিম মহাকাব্যের কথা বলা হয়েছে যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কবি বিশেষের সষ্টি এবং কতকগুলি সাধারন লখন ও বৈশিষ্ট্যের ধারক। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কৃত্রিম মহাকাব্যকে যথার্থ মহাকাব্য বলে স্বীকার করতে চাননি। রামন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের পোষক। তাঁর মতে কালিদাস, ভারবি মাঘ প্রভৃতি কবিদের রচিত মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। কিন্তু এরা যে শ্রেনীর রামায়ন, মহাভারত, বা ইলিয়াড়-ওডিসি সে শ্রেনীর নয়।

Authentic Epic বা প্রামান্য মহাকাব্যে প্রাচীন জীবনের ধ্যানধারনায় শুভাশুভ বোধ মৃত হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত লুপ্ত ইতিহাসের অনেক উপকরন পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বাল্মীকি বা হোমারের নামেদর আড়ালে বহু রচয়িতা আত্মগোপন করে মূল্য কাব্যকে সমৃদ্ধ থেকে থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। কোন একজন বিশেষ কবির চেষ্টায় এরূপ মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়। কবিবিশেষের ব্যাক্তিগত প্রতিভার সৃষ্টি যে মহাকজাব্য তাকেইকৃত্রিম মহাকাব্য বা Literary Epic আখ্যা দেওয়া হয়। কালিদাস, ভারবি, ভার্জিল, টাসো বা মিলটন প্রভৃতির রচনা এই শ্রেনীর মহাকাব্য। কিন্তু এই জাতীয় রচনাকে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া যায় কি ? স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যে শ্রেনীর মহাকাব্যই হোক না কেন তার প্রধান গুন বিস্তৃতি। মহাকাব্যে যে বিশালতা, বিস্তৃতি ও ঔদার্য আছে। তা উভয় শ্রেনীর মহাকাব্যই মধ্যেই পাওয়া যায়। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব বলে গন্য হতে পারে।

মহাকাব্য রচনার যে সচেতন অভিপ্রায় মধুসূদনের ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

টিপ্পনী

কাব্যারম্ভে দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করে তা উক্তিতে - "গাইব মা, বীররসে ভাসি / মহাগীত।"কাব্য রচনাকালে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশিত আঙ্গিক তিনি মোটামুটি মেনেছেন যদিও একটি চিঠিতে সে নির্দেশের শৃঙ্খলকে তিনি উপেক্ষা দেখিয়েছেন - "I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of sahity darpan"। বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পনে মহাককাব্যের যে লক্ষন নির্দেশ করেছেন তাতে জানা যায় মহাকাব্য স্বর্গে বিভক্ত হবে, কোন দেবতা বা সদ্ববংশাজত বীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় পুরুষ তার নায়ক হবে, শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি এর অঙ্গীরস হবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হবে। সূচনায় থাকবে নমস্কার, আশীর্বাদ ও বস্তুনির্দেশ। প্রধানত একই ছন্দে কাব্যটি রচিত হবে। এর আয়তন হবে নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব এবং এতে থাকবে অষ্টাধিক সর্গ। এই জাতীয় কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে থাকবে নগর, বন, উপবন, শৈল সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, সম্ভোগ, বিরহ, মন্ত্রনা ও যেদ্ধ প্রভৃতি। কাব্যের নামকরন হবে সাধারন ও বাহ্যিক লক্ষনগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন। দু-একটি ছাড়া এর অধিকাংশ লক্ষন মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে উপস্থিত। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় নয় অথবা এই কাব্যের অঙ্গীরসও শৃঙ্গার, বীর কিংবা শান্ত নয়, প্রধান রস করুন। ব্যাতিক্রম থাকলেও মোটামুটি ভাবে বিশ্বনাথ বনির্দেশিত মহাকাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষনগুলির উপস্থিতির বিচারে মেঘনাথ বধ কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ লক্ষনের বিচারে এই কাব্য মহাকাব্য হয়ে উঠেছে কিনা সটাই বিচার্য। এ বিষয়ে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "মহাকাব্যের সার্থক রচনা যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও কয়েকটি বিরলগুনের একাঙ্গিক (Organic) সমাবেশের উপর নির্ভরশীল। যে বিরাট পটভূমিকার মধ্যে উহার ঘটনাবিন্যাস করিতে হয় তাহাকে পূর্বতন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আখ্যান-কিংবদন্তী, ধর্মবোধ ও সমাজসচেতনার সমবায়ে গঠন করা প্রয়োজন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের সহিত ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয় কল্পনার দিগন্তব্যাপী প্রসার, ভাবসমুন্নতি সৃষ্টির জন্য অতীতের বিচিত্র- উপাদান গঠিত প্রানসত্তার এক বিশাল আয়তন ব্যাপ্ত, সহজ সম্প্রসারন মহাকাব্য রচয়িতার পক্ষে অত্যাবশকীয় গুন। প্রকান্ড প্রাসাদ-প্রাঙ্গনের উপর প্রসারিত অসীম নীলাকাশের ন্যায় মহাকাব্য বর্ণিত আখ্যায়িকার উর্ধ্বতন বায়ুস্তরে যেন জাতীয় জীবনের দেহাধিষ্টিত আত্মা স্থিরভাবে আসীন এইরূপ অনুভুতি জাগাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই পরিধির বিশালতা ও কল্পনা প্রসারের উপযোগী উদাত্ত প্রকাশরীতির উপর সহজ ও অস্খলিত অধিকার থাকা চাই। এই মহিমান্বিত, উর্ধ্বচারী প্রকাশের জন্য যেমন চাই সুপ্রযুক্ত শিল্পকৌশল ও শব্দনির্বাচনের বিশিষ্ঠ আভিজাত্যপ্রধান ভঙ্গী, তেমনি চাই অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্তি সমুন্নতি। শুধু শিল্পকলা আনিবে নিস্প্রান আলঙ্কারিক স্ফীতি ; আর

অলঙ্কার বর্জিত শুস্ক অনুভূতি, যতই অকৃত্রিম হউক, আনিবে মহাকাব্যের মর্যাদাহীন সাধারণকাব্যের ভাষা। তৃতীয়ত, অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের তুলনায় মহাকাব্যে থাকিবে সূক্ষ্ম কাজকার্যের পরিবর্তে বড় তুলির টানে আঁকা একপ্রকার প্রকান্দ, সাধারনীকৃত রং ও রেখার বিন্যাস, যাহার পরধান লক্ষন অন্তমুর্খী গভীরতা নহে, বহির্মুখী ব্যাপ্তী। মধুসূদনের কাব্যে এই সমস্ত গুনেরও আশ্চর্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় । বীরবস, করুণরসের সাধারনীকৃত রূপ, ঐশ্বর্য সমারোহ, বর্ণাঢ্য চিত্র সৌন্দর্য, রণসজ্জা, যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও কোলাহলমুখরতা - এই সমস্ত কাব্য বর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। ব্যাক্তিত্বের নিগূঢ়তায় কোন মহাকব্যকারই প্রবেশ করেন না, মধুসূদন ও করেন নাই। তাঁহার নরনারী শ্রেনীপ্রতিনিধি। রাবনের রাজমহমার অন্তরালে তাঁহার ব্যাক্তি হৃদয়ের স্পন্দন বিশেষ শোনা যায় না, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার কণ্ঠে যে শৌর্য ও প্রনয়াবেশের মিশ্রিত সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজপরিবারের তরুন-তরুনীর সাধারন পরিচয় । চিত্রাঙ্গদা রাজমহিষীর সম্ভ্রম-সংযত শোকপ্রকাশ সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের হাআকারকে সংবৃত্ত করিয়াছে। চিতাশয্যায় শায়িত ইন্দ্রজিৎ - প্রমীলার ভস্মীভূত দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাবনের যে শোকোচ্ছাস তাহা রাজচরিত্রানুযায়ী, রাজ্যের কল্যানচিন্তায় ব্যাক্তিগত শোকের আতিশয্য নিয়ন্ত্রিত। মধুসূদনের মহাকাব্যের সর্বত্রই এই পরিমিধিবোধ ও কাব্যদর্শনের নিখুঁত অনুসরন।"

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, মহাকাব্য রচনার বাসনা থাকলেও এবং শাস্ত্রনিদিষ্ঠ মহাকাব্যিক লক্ষণগুলি সচেতনভাবে অনুসরন করলেও মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করতে পারেননি বা রচনা করা সম্ভব ছিল না ঐ যুগপরিবেশে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন - "উনবিংশ শতাব্দীর কবির পক্ষে বিশেষত বাঙালীর পক্ষে, মহাকাব্যের প্ররনা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মহাকাব্যের কবির পক্ষে যে শান্ত সংযত রসাবেশ-দ্বিধা দ্বন্দ ও সংশয়হীন চিত্তস্ফূর্তির প্রয়োজন, তাহাই মধুসুদনের সজ্ঞান কামনা হইলেও, তিনি তাহার ব্যাক্তিচেতনার অন্তস্থলে তাহা অনুভব করেন নাই। মহাকব্যের কবির অতি সরল ও সহজ বীর সর প্রীতিই থাকে - দেশ, জাতি বা ধর্মের গৌরবগান তাঁহার কাব্যস্ফূর্তির কারণ ; এবং বিরাট, বিপুল ও গম্ভীর বস্তুসকলের বর্ননায় বিশেষ আসক্তি প্রকাশ পায় ; তাহাতে কবিব্যক্তির নিজস্বভাব-অভাবের সুর তেমন বাজিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না ; সে কল্পনা একান্তই বহর্বস্তুগত, আত্মভাব-প্রধান নয়। মধুসূদনের কাব্যে ইহার কয়েকটি লক্ষণ আছে সন্দেহ নাই - তাঁহার ছন্দের উদাত্ত গভীর মূর্চ্ছনায় কল্পনায় বিষয় বিস্তারে এবং বিপুল ও বিচিত্র বস্তু সন্নিবেশে তিনি যাহাকে "Sacred song" নামে অভিহিত করিয়াছেন - সেইরূপ গম্ভীর ভাবোদ্দীপক কব্যগুন প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি সমগ্র কাব্যখানি বীরবসের পরিবর্তে করুনসের আধার হইয়া আছে। মধুসদনও যে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাঁহার কাব্যের ছাঁচ বা আদর্শ যেমনই হউক, তিনি যে প্রকৃতপক্ষে মহাকাব লিখিতেছেন না কোন বিধিবাধন মানিয়া চলা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ইহা মধুসূদনের চরিত্রের্ উপযুক্ত। নাটক রচনা করিতেও তিনি কোন শাস্ত্রসাধ মানিবেন না - "I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will." মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য হইবে এবং তাহা বীররসপ্রধান হইবে, ইহাই প্রকাশ্য সংকল্প বটে, কিন্তু কবি তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন - 'You must not, my dean fellow judge of the work as a regular 'Heroic Poem' I never meant it as such. It is a story, a table, rather heroically told." Do not be frightered my dear fellow, I won't trouble my readers with Virarasa (বীররস)।

এ সকল হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'মেঘনাথবধ কাব্য' - এর কবির চিত্তে একটা বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ ছিল - কবির মন তাহা চাহিয়াছিল, প্রাণ যাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত রহিয়াছে। এই লিরিক-সুর কবির সুপ্র আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহার নিবারন করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিস্ফলতা ও নৈরাশ্য তিনি জাগ্রত চৈতন্য হহিতে দূরে রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহারই রুদ্ধ কাতর ক্রন্দন মহাকাব্যের গীতোচ্ছাসকে প্রতিহত করিয়াছে। যে কামনা সকল হইবার আশা ছিল না, যে আদর্শকে সারা প্রাণ দিয়া বরন করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই তাঁহার প্রাণের নিভৃত কোনো অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করির্তছিল। রাম লক্ষ্মন ও বিভীষনরূপী সমাজই জয়ী হহিবে, এ যেন তাঁহার নিজ জীবনেরই আক্ষেপ - তাআদের জয়ী হওয়া উচিত নয়, তবুও হইবে। তাই তাহাদের প্রতি কবির আক্রোশের অন্ত নাই। মেঘনাদ যখন মরিবেই, তখন তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত হইতে হইবে, এবং লক্ষনকেই সেই হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত না করিতে পারিলে কবির আত্মা শান্তি মানিবে না। এইজন্যই 'মেঘনাদবধ কাব্য' -এ বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং এইজন্যই তাহা একখানি সফল মহাকাব্য না হইয়া খাঁটি মহাকাব্য হইতে পারিয়াছে।"

অন্যত্র মোহিতলাল বলেছেন, "অন্যান্য কাব্যের মমত, এখানেও মধসূদন একট বিশেষ আদর্শের অনুসরন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনাকালে তাঁহার স্বকীয় কবিধর্ম সেই সজ্ঞান সংকল্পের উপর জয়ী হইল ; এতদিন ভ ইতরে যাহা চাপা ছিল, তাহাই প্রবলবেগে উৎসারিত হইল ; মহাকাবন্য রচনায় ভানে তিনি একপ্রকার মুক্ত - কল্পনা দীর্ঘ ছন্দের কথাকাব্য রচনা করিলেন ; তাহাতে শাস্ত্রশাসন অপেক্ষা কবির আপন রুচি ও আত্মভাব প্রশ্রয় পাইয়াছে - আকারে প্রকারে যেটুকু মহাকাব্যের লক্ষন আছে, তাহা অবাধ কল্পনার শৃঙ্খলরূপে বড়ই কার্যকরী হইয়াছে। 'মেঘনাদবধ' - এর ঘটনাবস্তু জটিল বা বিস্তৃত

নহে, চরিত্র সৃষ্টিতে অথবা নায়কের কীর্ত্তিকুশলতায় মহাকব্যোচিত মহিমা ইহার নাই - এমন একটি চরিত্রও নাই, যাহাকে দুধর্ষ পুরুষবীর বা মানুষরূপী দেবতা বলা যাইতে পারে নায়ক মেঘনাথের হত্যা এবং যেভাবে সেই হত্যা সাধিত হইয়াছে, লঙ্কার সর্বনাশ ও রাবের শোক এ সকলের কোনটিতেই মহাক্যোটিতে বিষয়গৌরব নাই। এতদ্ব্যাতীত আরও অনেক লক্ষন ইহাতে আছে, যাহা মহাকাব্যের শাস্ত্রসম্মত আদর্শের উপযোগী হয়।"

টিপ্পনী

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মেঘনাদবধ কাব্য

বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের অসাধারন কীর্তি। বাংলা কবিতাণ প্রধান প্রচলিত ছন্দ পয়ার। এই ছন্দকে তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নামেও অভিহিত করা হয়। এই পয়ার ছন্দই মধূসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি। পয়ারের বিচিত্র পরিবর্তন সাধ করে তিওনি তাঁর নতুন ছন্দ সৃষ্টি করেছিলে।

পয়ারের প্রতিচরনে চোদ্দ অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং আটমাত্রা ও চোদ্দ মাত্রার পরে বিরাম ঘটে। এই ছন্দের প্রতি দুটি চরনে থাকে অন্তমিল। একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে -

মহাভারতের কথা / অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুন্যবান।।

উদ্ধৃত চরন দুটির মধ্যে রয়েছে অন্তমিল এবং প্রতি চরনের অক্ষর বা মাত্রা সংখ্যা চোদ্দ। মোট মাত্রা আবার আট মাত্রা ও ছয় মাত্রা - এই দুই পর্বে বিভক্ত। কবিতা পাঠকালে এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা যায় না, শ্বাস গ্রহনের জন্য সাময়ক ভাবে থামতে হয়, আবার চরণ দুটিতে আটমাত্রার পরে একবার এবং ছয়মাত্রার পরে আর একবানর যতি পড়েছে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে চনের শেষে মিলের অভাবকেই আপাত দৃষ্টিতে প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের দকে লক্ষ্য রেখেই চরনান্তিক মিলহীনতার জন মিত্রতার অভাবসূচক 'অমিত্রাক্ষর' নামে এই ছন্দটিকে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার অন্ত্যমিলের অভাবই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য। এ ছন্দের মূল প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য চরনের বিন্যাসে ৮ + ৬ মাত্রা বজায় রেখে ও শ্বাসযতি ও অর্থযতির ঐক্যকে ভেঙ্গে দেওয়া। এর ফলে পয়ারের মত শ্বাসযতির জন্য যেখানে থামতে হয় সেখানে অর্থ সমাপ্ত করবার কোনও বাধ্যবাধকতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকল না এবং ভাবও দুটি চরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করল। এ

টিপ্পনী

ছন্দে প্রতিটি চরনককে শ্বাসযদি অনুসারে ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে ভাগ করা সম্ভব হলেও অর্থ যতি পড়তে পারে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১ এমন কি ১২ মাত্রার পরে। যেমন -

সম্মুখ সমরে পড়ি, / বীর - চুড়ামনি

বীরবাহু, * চলি যবে / গেলা যমপুরে

অকালে, * কহ, * হে দেবি / অমৃতভাতিনি *

কোন বীরবরে বরি / সেনাপতি - পদে *

পাঠাইলা রনে পুনঃ / রক্ষঃ কুলনিধি

রাঘবারি ? *

উদ্ধৃত অংশের প্রতি চরনকেই ৮ + ৬ মাত্রায় দুটি পর্বে ভাগ করা যায়, কিন্তু পয়ারের মতন এখানে দুটি চরনেই অর্থের পরিপূর্নতা না ঘটে পঞ্চম চরন পার হয়ে ষষ্ঠ চরনের চারটি মাত্রার পরে পরিপূর্ন অর্থযতি পড়েছে। ভাব যেখানে শেষ হয়েছে যতি পড়েছে যেখানেই। পয়ারের রীতি অনুসারে এই অংশটি পাঠ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশটির চমৎকার বিশ্লেষন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথ আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগভির হয়ে বাজল 'সম্মুখ সমরে পড়ি' বীরচূড়ামনি বীরনবাহু' তারপর তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রনপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল - 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।' তারপর ছন্দ ননত হয়ে নমস্কার করলে, '- কহু হে জেবি অমৃতভাষিনী।' তারপর আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিনামের যেটা সূচনা, সেটা যেন ঝটিকায় সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল - 'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে, পাঠাইলা রনে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি'?

মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ

মেঘনাদবধ কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত। কাহিনীবৃত্তের দিক দিয়ে সর্গগুলি সমভাবে কেন্দ্রসামীপ্য পায় নি। একাব্যে কোন সর্গ ঘটনাপ্রধান। কোনটি বর্ণনাপ্রধান,

কোনটি আবার নাট্য রসসমৃদ্ধ - কোথাও ঘটেছে এদের আনা আনুপাতিক মিশ্রন। কোন সর্গে মধুসূদননের কাব্যনকল্পনা অভ্রান্ত, কোথাও বাইরের প্রভাব আতস্থ, কোথাও আবার রূপরচনার নিপুন সার্থকতা । অপরপক্ষে কোন সর্গে বিদ্রোহের বানীঘোষনায় - ইতিহাসসৃষ্টির সাধনায় কবির কল্পনা বৃন্তচ্যুত, কোথাও বাইরের প্রভাব ব্যক্তিপ্রবনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিপ্রকট। এদের বিচিত্র পরিচয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের আস্বাদ বহুবিচিত্র।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম দিয়েছেন 'অভিষেক' । মেঘনাদকে রাবন সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন । সেই ঘটনাটি আলোচ্য সর্গের কেন্দ্রীয় ঘটনা।নামকরন সচেতনভাবেই করেছেন কবি। এর প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিতর্ক নেই। প্রথম সর্গটিকে সে সময় অনেক সমালোচক কাব্যটির শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করেছেন। মধুসূদনের কাব্যরসিক বন্ধুদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গের শ্রেষ্টত্ব নিয়ে বিতর্ক চলত। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু বলা যায় কাব্যোকর্ষের দিক থেকে প্রথম সর্গটির স্থান অতি উচ্চে । প্রথম সর্গের আরম্ভেই মধুসূদন একটি নাটকীয় চমক এবং দ্যোতনার সৃষ্টি করেছেন -

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামনি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিনি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি - পদে
পাঠাইলে রনে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

পাঠকদের বীরবাহুর অকালমৃত্যুর সংবাদটি মাত্র দিয়ে কবি ঔৎসুকের সৃষ্টি করলেন, পরবর্তী সেনাপতির প্রসঙ্গ তুললেন, কিন্তু তারপরে সরস্বতীবন্দনা, রাবনের রাজসভার বর্ণনায় সে প্রসঙ্গ অন্তরালে রইল। পাঠকদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলে তার বিলম্বিত নিবৃতির মধ্য থেকে কবি কিছু নাট্যরস নিষ্কাসিত করেছেন। এরকম নাত্যমুহূর্তের আরও কিছু নিদর্শন এই সর্গে আছে। বীরবাহুর যুদ্ধ ও মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করছে ভগ্নদূত মকরাক্ষ। রামচন্দ্রের যুদ্ধ প্রবেশ বর্ণনা করতে করতে মধ্যপথে আকস্মিক ভাবে থেমে গেল সে -

"..... কতক্ষন পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।

টিপ্পনী

কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত," - এতেক কহি নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত,.....।

নাট্যচমক এখানে উদ্দাম হয়ে ওঠে নি, কিন্তু মৃদুতা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব দৃষ্টী এড়ায় না। এই কৌশলটি বেদনারসকে দানা বাঁধিয়ে তুলেছে। কখনও আবার অতিপ্রত্যাশিতকে এড়িয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্য ফলাফলের সৃষ্টি নাট্যরসের জন্ম দিয়ছে। ভগ্নদূত মকরাক্ষের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবনে রাবনের চিত্তদীর্ন হাহাকারের আবেগতারিত বর্ননা প্রথম সর্গের প্রথে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বীরবাহুর মৃত্যুর বিস্তৃত বর্ণনা শোনবার পরে-

"এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষ
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরঢ়ে বিষাদে
কহিলা; সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে?"

পূর্বের দীর্ঘ ক্রন্দনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নয় যে, এরপর উচ্ছসিত ও আবেগ হাহাকার রাবনের কন্ঠ থেকে নির্গত হয়ে। সেক্ষেত্রে ক্রন্দনের পরিবর্তে বীরত্বনের উল্লাস ধ্বনিত হতে দেখে পাঠক মন থকে যায়, কিন্তু রসবোধের দিক থেকে একে অনিবার্য বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। বেদনার হাহাকার আর বীরত্বের উল্লাসের বেনীবন্ধন ঘটেছে রাবনের চরিত্রে-বীর আর করুন দ্বৈত উৎস থেকে এ কাব্যের রসধারা উৎসারিত।

প্রথম সর্গে বীর ও করুনরসের দুটি তার সমানভাবে বেজেছে। মেঘনাদে - প্রমীলার প্রমোদকাননের বর্ণনায় আদিরসের ব্যঞ্জনাও এসেছে। আদিরসকে যদিও বা প্রাসঙ্গিক রস বলে অভিহিত করা যায়। বীর বা করুন রসের মধ্যে শ্রেষ্টত্ব কার সে বিষয়ে তর্ক করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। তবে প্রথম সর্গে রাবনের যে ব্যাক্তি চরিত্রচিত্র বর্ণিত হয়েছে তাতে বীর ও করুনরসের মেলবন্ধন ঘটেছে। বীর ও করুনের যে যুগ্মতারে আঘাত করেছেন কবি প্রথম পংক্তিতে - 'সম্মুখ সমরে পড়ি ...' অর্থাৎ বীরবাহুর অকাল মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে তাই - ই কখনও পৃথক হয়ে কখনো ঐক্যতানে এই সর্গ জুড়ে আদ্যন্ত বেজেছে। রাবননের শত্রুহত্যার প্রতিজ্ঞায় যেখানে ভাষায় বীরভাব প্রকাশিত সেখানে ব্যাক্তিত হয়ছে বীরত্বগর্ভ

পৌরুষের বেদনা বিদ্ধ মূর্ত্তি। চিত্রঙ্গদার আবির্ভাব যে ব্যাথার সুরে চিত্ত ভরে দিয়েছে, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা সেই ব্যাথার কেন্দ্র থেকে বীর্যগম্ভীর শক্তিকে উৎসারিত করেছে। মাঝখানে মেঘনাদের প্রামাদকাননের বর্ননায় প্রেমরস সৃষ্ট হয়েছে। সেখানে বেদনা নেই, কিন্তু সে প্রেমও বীরত্বশূন্য নয়। প্রমীলার নারীরক্ষিবাহিনীর বর্ণনায় মধুসূদনের শৃঙ্গার ও বীররসকে যুগপৎ আহ্বান করেছেন-

প্রবেশি দেবী সুবর্ন- প্রাসেদে,
দেখিলা সুবর্ন দ্বারে ফিরেছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ- সঙ্গে বেনী পৃষ্ঠদেশে!
বিজলীর ঝলাসম, বেনীর মাঝারে,
রত্নরাজি তূনে শর মনিময় ফনী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ন কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূনে মহাখর শব; কিন্তু খরতর
আয়ত- লোচন শর।

এর ভাবব্যঞ্জনায় শৃঙ্গার জয়মুক্ত হলেও বীরত্বের ক্ষীন আবরনটি অস্বীকার নয়। বীর--করুনের সমুন্নত গাম্ভীর্য আর বেদনা-হাআকারের মধ্যে কিছু বৈচিত্র সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে মেঘনাদের প্রমোদকাননের উপস্থাপনা। কিন্তু এ বৈচিত্র্যের যেন সুর কেটে না দেয়। বীর ভাবের ক্ষিন আবরনটি যেন লঙ্কার সৈন্যসজ্জার একটি দূরাগত প্রতিধ্বনি।

এই স্বল্পবিস্তৃত শৃঙ্গাররসপ্রধান বর্ণনাটি বৈচ ট্র সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তে যে ভাবরসের সুরটি স্থায়ী করে রাখতে চেয়েছেন তা সর্গসমাপ্তিতে ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে অভিষেককে উপলক্ষ করে বন্দীর বন্দনাগীতে অভিব্যক্ত হয়েছে-

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরন, হে রাজসুন্দরি

টিপ্পনী

তোমার। উঠ গো শোক পরিহরি, সত্যি,
রক্ষঃকুলরবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ বিভাবতী।
উঠ রানি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদন্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে
পান্ডুবর্ন আখণ্ডল।

এই বর্ণনায় লঙ্কাপুরীর যে বেদনার্ত অথচ বীর্যস্তম্ভিত কবি এঁকেছেন তার মধ্যে ব্যাঞ্জনায় দেশমাতৃকার বন্দনাগানের সুর বেজেছে। কবির কাম্যপুরী লঙ্কার কল্পনাভিত্তিতে কবির জন্মভূমির অতিবাস্তব চিত্রটি আখেনে সত্য হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধম সর্গে সৈন্যদে রণসজ্জা ও পথ-পরিক্রমা একাধিক চিত্র আছে। যুদ্ধান্তে রনক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষও চিতএ অঙ্কিত আছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ বর্ণনা বেশী নেই। হোমারের কাব্যে সবটাই যুদ্ধ বলে কবি একটি চিঠিতে তাঁর প্রিয় মহাকবি সম্বন্ধে অনুযোগ করেছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গে সর্গে যুদ্ধ সজ্জা, যুদ্ধ যাত্রার বর্ণহু সমারোহ, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা একটি মাত্র সর্গে। আসলে মধুসুদন বীরবসের শোভাযাত্রার তটস্থ দৃষ্টা, অবগাহকারী ভোক্তা নন।

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় আগমনের সঙ্গে মেঘনাদের অভিষেকের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও বীরবাহুর মৃত্যুর সূত্র ধরে এই মুহূর্তটির সৃষ্টি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। চিত্রাঙ্গদার আগমনকে অবলম্বন করে মধুসূদন একাধিক কাব্যিক প্রয়োজন নির্বাহ করেছে; প্রথমত সেতুবদ্ধ সমুদ্রকে লক্ষ্য করে রাবনের উত্তেজিত আহ্বান-

উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতলজলের এ প্রবল রিপু।

তারপরেই যুদ্ধযাত্রার জন্য সঙন্যবাহিনীকে এই উত্তেজনার সেরে প্রস্তুতির আদেশ দান খুবই সঙ্গত হত। কিন্তু অত মামুলী ঘটনা-সংস্থানে এবং সুর বিন্যাসে মধুসূদন তৃপ্তি পান নি। তিনি তাই উত্তেজনার পরে রনসজ্জার আদেশ না দিয়ে একটি বেদনাময়

টিপ্পনী

কাহিনী অংশের উপস্থাপনা করেছেন। তীব্র উত্তেজনা অশ্রুতে সিক্ত করে তীব্রতর করে তোলা হয়েছে। রাবনের যুদ্ধযাত্রার ডাক এসেছে চিত্রাঙ্গদার সাশ্রুনেনে বিদায়ের পরে-

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদের লয়ে
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।

রসবিচিত্রতা সৃষ্টি ছাড়াও কিছু গুরুতর কাব্যগত প্রয়োজনে চিত্রাঙ্গদা আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। রাবন যা দেখতে চাননি, বা বুঝতে চাননি চিত্রাঙ্গদা তাকে দেখতে পেয়ছে বুঝতে পেরেছে। সমগ্র কাব্যের ভাব কল্পনার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার কিছু সার্থকতা আছে। চিত্রাঙ্গদার চরিত্র এবং তার বক্তব্য বিশ্লেষন করলেই সেই তাৎপর্যটি ধরা পড়বে।

বিরবাহুর মৃত্যু চিত্রাঙ্গদাকে সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছে। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে রাবনের কথোপকথোন খুবই সামান্য। কিন্তু তাঁর আবর্ভাব তাঁর সংক্ষিপ্ত সংলাপ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় স্বামী নয়, পুত্রই ছিল তার একান্ত আপনার জন।

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষঃকুলমনি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ কোথা রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ?

চিত্রাঙ্গদা রাজমহিষী, তবে একমাত্র নন, বীরবাহু - জননী রূপে তার মর্যাদা, তাই দেশের জন্য পুনের আত্মদান তার কাছে কোন সাত্বনার আনী বহন করে আনে আ, যে তীব্র শোকের আবেগে চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপপুর ছেড়ে রাজসভায় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই শোকই রাবনের প্রতি রোষানলে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে-

কিছু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারনে,
কোন, লোভে কহ রাজা, এসেছ এদেশে

রাঘব?

টিপ্পনী

চিত্রাঙ্গদার তীব্র অভিযোগে শুধু নিজের হৃদয়ের গভির বেদনা্ নয় রাবন সম্পর্কে একটী নির্মম সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমস্ত কাব্যে এই একবার মাত্র কবি পাঠককে স্মরন করিয়ে দিয়েছেন। লঙ্কাবাসীর দূর্গতির মূল কারন রাবনকৃত পাপ। সীতাহরনজনিত পাপের কথা রাবন কখনও নিজে স্বীকার করেন নি। চিত্রাঙ্গদার কথার সেই রাবন চরিত্রের দুর্বলতা বা ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবন চরিত্র

'মেঘনাদবধ কাব্য' কবি মধুসূদনের এক অনন্য সৃষ্টি। আর এ কাব্যের এক অবিস্মরনীয় চরিত্র রাবন। রাঝ চরিত্র মধুদূদনের কলমে এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। বাল্মিকীর 'রামায়ন' কাব্যের রাবনের সঙ্গে যার সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। রেনেসাঁস বা নবজাগরনের আলোকে মধুসূদন রামায়ন কাহিনীকে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন। রাবন ও মেঘনাদকে এনেছেন আলোর সম্মুখে আর রামকে রেখেছেন ছায়াছন্ন। নব্যযুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ মধুসূদের বন্ধুর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন - "People here grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with the Rakshasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow." সেজন্যই রাবন চরিত্রের উৎস বাল্মিকীর রামায়ন হলেও মধুসূদনের রাবন অপার মহিমার ভাস্বর। শক্তিতে, বীর্যে, সম্পদ, রাবন মহিমান্বিত।

কাব্যের শুরুতেই দেখা যায় অজস্র ঐশ্বর্যে মন্ডিত রাজসভায় মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রমিত্রদের সঙ্গে বসে আছেন সম্রাট রাবন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভগ্নদূত মক্ষরাক্ষ বীরবাহর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে। পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত রাবন। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে এর আগে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য রাক্ষস যোদ্ধা মারা গেছে। এই মৃত্যুসংবাদ রাবনকে করেছে বিষাদগ্রস্থ। এই বিষাদে মিশে আছে ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক এবং অদৃষ্ট বা নিয়তির আঘাতের জন্য হাহাকার। তাঁর সোনার লঙ্কায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোকের সঙ্গে রাবনকে বিস্মিত করে তুলেছে। বিচলিত রাবনের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়-

"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিন সম্মুখ রনে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

আক্ষেপ ঝরে পড়েছে রাবনের কণ্ঠে। রামচন্দ্রের পক্ষে বীরবাহু নিধব অসম্ভব বলেই মনে হয় তার। কবি মধুসূদন বিধির অবিচারে জর্জরিত রাবন চরিত্রকে ট্রাজেডির নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। সেজন্য রাবন তাঁর পূর্বকৃত আচরনের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। রাবন সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সীতাহরনজনিত অন্যায় কর্মের কথা স্বীকার করেছেন। সীতার জন্যই লঙ্কায় সর্বনাশ আসন্ন। তাই রাবন হাহাকার করেন-

"হায় সূপর্পনখা
কি কুক্ষনে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবতীবনে কালকূটে ভরা
এ ভূজগে? কি কুক্ষনে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?"

আপন কৃতকর্মের এই স্বীকারোক্তি রাবন চরিত্রকে অন্য মাত্রা দিবেছে। পৌরানিক রাবন চরিত্র মধুসূদনের লেখনীতে নতুনধর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাবন একাধারে রাজা, পিতা, স্বামী দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে প্রবল লেই পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে গর্ব অনুভব করেছেন। দেশকে শত্রুরহাত থেকে রক্ষা করার জন্য বীরের মত মৃত্যুবরন করেছে বীরবাহু। তাই রাবন বলেন।

রিপু দল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভিরু সে মূঢ়; শত ধিক তার!'

কিন্তু তিনি স্নেহবৎসল পিতা। অপত্য স্নেহে কাতর তাঁর হৃদয়। পুত্রশোক সহ্য তাঁর কাছে বজ্রাঘাতের মত। রানের এই স্নেহপূর্ন হৃদয় তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছে। মন্ত্রী সারন তাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁর সান্তনা বাক্যের উত্তরে রাবন বলেছেন পৃথিবি ময়াময় বলে জানলেও পুত্রশোকের যন্ত্রনা অপরতিরোধ্য। রাবন গভীর শোকে বলে ওঠেন-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কলাল, বিল হৃদয়
ভোরে শোক-সাগরে, মৃনাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

কাব্যের পথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কথোপকথোনের মধ্য দিবে রাবনের যুগপৎ স্বামী ও পিতার পরিচয় ফুটে উঠে। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগের উত্তরে লঙ্কাধিপতি রাবন বলেন - "একে পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে / সত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে / দিবা নিশি।" এখানে রানের মহান পিতা ও লঙ্কার অধিশ্বরেষর রূপটি প্রকাশ পায়। চিরাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়ে রাবনন বলেন - এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে / গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি ? এখাননে স্বামীর অধিকার বোধ নয়, বরং অভিমানী এক হৃদয় যেন স্ত্রীর কাছে সমবেদনা ও সহানুভূতি কামনা করেছে। এই আর্ত রূপ রাবন চরিত্রকে এক ভিনগ্ন মাত্রা দীয়েছেন। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগের তীর রাবনের দিকে। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ রাবনের মধ্যে রাজকর্তব্য জেগে উঠেছে।

স্বামী ও পিতা পরিচয়ের পাশাপাশি সম্রাট ও যোদ্ধা রাবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রথম সর্গে। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই রাবনের বিস্ময় ও শোক তীব্র আবেগে প্রকাশিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সেই আবেগ প্রশমিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার তীব্র অনুযোগ তাঁকে রাজকর্তব্য পালনে উদ্যোগী করে তুলেছে। রাক্ষসসৈন্যের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন রাবন। বীরশূন্য লঙ্কাপুরী রক্ষার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহন করেছেন।

প্রথম সর্গে রাবনের সংলাপ থেকে তাঁকে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং মানবিক বৌধসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয়। পুত্রশোক শুধুমাত্র আত্মবিলাপেই শেষ হয় নি। ব্যাক্তিগত শোকে তাঁর পৌরুষকে উদ্দীপিত করেছে। করুন রস এখানে তৈরি করেছে বীররস। সমুদ্রের প্রতি তাঁর তীব্র শ্লেষ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্খা, বীরের প্রতি মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। মেঘনাদের অনুরোধ তিনি নিজে যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত হয়েছেন। পুত্র এঘনাদকে সেনাপতি পদে বরন করে নিয়ে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিয়েছেন। এইভাবে মধুসূদন রাবন চরিত্রের নানমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন যা পুরোপুরি আধুনিক মননের ফসল। রাবন নিয়তির দ্বারা জর্জরিত, পীড়িত। কিন্তু তার এই দ্বন্দ্ব - সংঘাতময় জীবনের মূলে আছে স্নেহ-মমতা বাৎসল্যের প্রতি দুর্বলতা। আত্মশক্তির নির্ভরতা এই চরিত্রকে করে তুলেছে ট্রাজেড়ির নায়ক। তাই রাবন হয়ে উঠেছে এ কাব্যের এক বিশেষ আকর্ষনীয় চরিত্র।

মেঘনাদবধ কাব্য : চতুর্থ সর্গ

টিপ্পনী

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের নামকরন করেছেন অশোক বন (অশোকবনং)। মেঘনাদের হত্যা কাহিনী। রাবন-মেঘনাদের বীরত্ব গাথার মেঘনাদবধ কাব্যের মূল উপজীব্য। কবি রাম-রবানের যুদ্ধের পূর্বেকার কাহিনীকে যথাযোগ্য মযফাদায় এ কাব্যে আনতে চেয়েছেন। রামায়ন কাহিনী সকলের পরিচিত, প্রচলিত ও বহুশ্রুত। সীতাহরন বা বন্দিনী সীতার প্রসঙ্গ না থাকলে এর অভাব পাঠককে হতাশ করতে পারে। হয়ত এই সম্ভাবনা থেকেই এই সর্গের অবতারনা।

রামায়নের মূল বিষব হল পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনে যাওয়া, রাবন কতৃক অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার ও স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য রাবন ও মেঘনাদের কাইনী। মেঘনাদের বীরত্ব, সা্সিকতা একাব্যে প্রাধান্য পেবেছে। তাঁর মৃত্যু কবির চোখে জল এনে দিয়েছে। তবে এ সমস্ত ঘটনানর পিছনে শুধু নিয়তি নয়, যে কার্যকারন সূত্র আছে, কবিকে সে কথা বলতেই হত। অন্তত শিল্পের সত্যকে বজায় রাখতে গেলে সেকথা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সে জন্যই অশোকবনের বর্ণনা ও কাহিনীসূত্র নির্মানের চেষ্টা এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল বলা যায়।

লঙ্কাবাসী সকলে আনন্দে উৎসবনে মত্ত। তাদের বিশ্বাস রাম-লক্ষন এই যুদ্ধে পরাজিত হবে। তাই চারিদিকে উল্লাসের বাতাবরন। এই উল্লাসের বিপরীতে আর একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি-

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাগব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!

অশোককাননননে নিসঙ্গ সীতার বন্দীদশার চিত্র মর্মান্তিক। রাজনন্দিনী সীতা স্বেচ্ছায় বরন করেছিলেন স্বামীর সঙ্গে বনাসের জীবন। কিন্তু আজ বন্দিনী। স্বামী প্রেমের সুখস্মৃতি তাঁর জীবনীশক্তি। সীতা সরমার প্রতি কৃতজ্ঞ। সরমার সাহচর্যে তাঁর বন্দিনী জীবন সহনীয় হয়েছে। সরমা তাকে দুর্দিনে সঙ্গ দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছেন। এমন দুর্লভ রত্ন সীতা নিজেকে ধন্য মননে করেছেন। সরমার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন সীতা এই সর্গে।

টিপ্পনী

চতুর্থ সর্গে প্রকৃতি বর্ণনা

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরনের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন মধুসূদন। মিল্টন, শেক্সপিয়ার, দান্তের দ্বারা দ্বারা অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন কবি। শেক্সপীয়রের রোমান্টিক নাট্যধারাকে তিনি একদা অনুসরনন করতে চেয়েচিলেন ল মধুসূদননের কবি মনোউর্দিষ্ট ক্লাসিক রীতির সাধননা করলেও তার মধ্যে তীব্র রোমান্টিকতা বর্তমান ছিল। এই রোমান্টিকতা চতুর্থ সর্গের প্রকৃতি বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদনের আগে এভাবে অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রকৃতির তাৎপর্যময় উপস্থাপনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কেউ করেনি। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতি বর্ণানার খুব বেশি সুযোগ নেই, তবু সামান্য সুযোগকেই একানে ব্যবহার করেছেন কবি।

অশোক কাননে সীতা চেড়ি পরিবৃত হয়েন চচোখের জল ফেলছেন। তাঁর মলিন মুখ সূর্যকান্তমনি কিংবা সমুদ্রলবাসিনী লক্ষ্মীর মতই। এরপরেই কবি বর্ণনা করেছেন-

"স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্মারিয়া পাতকুল; বসেছে অরবে
শাখে পাখী!"

এই নিসর্গ প্রকৃতি সীতার বিষাদময়ী রূপটিকেই যেন গভীরতা দিয়েছেন। সীতার বেদনা ছুঁয়ে গেছে প্রকৃতিকেও। প্রকৃতিও যেন তার আপনার সাজ খুলে ফেলেছে-

"রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ।"

সীতার দুঃখে প্রকৃতি কাতর। ফুলের গাছগুলি অলংকারহীন ও সমব্যাথী হয়ে উঠেছে সমুদ্রগামী নদীও তরঙ্গ কল্লোল তুলে কেঁদে কেঁদে চলেছে। সমবেদনায়, সহানুভূতিতে প্রকৃতিও এখানে একিটি সজীব ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতির এমন সহমর্মিতার ভাষা অভিনব, সন্দেহ নেই। কবি বর্ণনা করেছেন-

দূরে প্রবাহিনী
উচ্চে বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে

কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ কাহিনী।

সীতার জীবনে সুখস্মৃতি অল্প। কিন্তু পঞ্চবটীবাসের সুখস্মৃতি তাঁর রক্তে মজ্জায় মিশে আএ। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য আডম্বর যা দেয়নি, প্রকৃতির গভীর সান্নিধ্য সীতাকে যেন সেই সুখ দিয়েছিল। সীতা সরমাকে জানাচ্ছেন -

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী - তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে;

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সীতা প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। বনের পশুপাখি, লতা-পাতা, ফুল সকলের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে উঠছিল। প্রকৃতি চিত্রনে মধুসূদন আলংকারিতার আশ্রয় নিয়েছেন, যা ক্লাসিক রীতির অনুগামী। চতুর্থ সর্গে প্রকৃতির যে খন্ড খন্ড চিত্র ধরা পড়েছে তা মধুকবির রোমান্টিক কল্পনারইফসল।

চতুর্থ সর্গ নির্মানে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের ঋণ ও মধুকবির নিজস্বতা

চতুর্থ সর্গে সীতা-কাহিনী পরিকল্পনা সম্পর্কে কবি নিজেই সন্দিহায় ছিলেন। এই সর্গ সম্পর্কে মধুসূদন বলেছেন - "in the present poem I mean to give free scope to my inventing power (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki"। বাল্মীকির কাব্যসাধনার পথ অনুসরন করে কত কবিযশঃ প্রর্থীরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কবি ও বাল্মীকির কাব্য উদ্যান থেকে ফুল বেছে নিয়ে অর্থাৎ কাহিনী চরিত্র ইত্যাদি উপকরন নিয়ে মধুসূদন এক নতুন মালা বা কাব্যরচনা করতে রচনা করতে চান। এই কারনেই এই সর্গের প্রারম্ভে বাল্মীকির কাছে মধুকবির কৃপাভিক্ষা।

চতুর্থ সর্গের বিষয় ও উপকরন বাল্মীকির রামায়ন থেকে আহৃত। কিন্তু মধুকবির নিজস্নবতাও সেখানে আছে। চেড়ীদল মেঘনাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে সীআকে একা রেখে গেলে সরমা সেই সুযোগে সেখাননে উপস্থিত হন। বাল্মীকি রামায়নে সীতা সরমাকে রাবনের সঠিক মনোভাব জেনে আসার অনুরোধ করেছিলেন। অরন্যকান্ডে সোনার হরিণ ও সীতাহরনের বাল্মীকি বর্ণিত তিহাস মধুসূদন সংক্ষেপে সংহতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। হরিননরূপী মারীচের আর্তনাদ, লক্ষনের প্রতি ভৎর্সনা, লক্ষ্মনের মারীচকে ধাওয়া করা ইত্যাদি বাল্মীকিরই অনুসরন। গন্ডিপ্রসঙ্গ বাল্মীকির রচনায় নেই। মধুসূদনও তার লেখায় গন্ডিপ্রসঙ্গ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উল্লেখ করেন নি। গন্ডি কাটার উল্লেখ আছে কৃত্তিবাসের রামায়নে -

গন্ডি দিয়ে বেড়িলেন লক্ষমন যে ঘর

প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।

কৃত্তিবাসের সীতা ধর্মকর্ম নষ্ঠ হওয়ার ভয়ে গন্ডির বাইরে এসে বিপদে পড়েছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতা - ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে -

না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি

রাবন সীতাকে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখিয়েছিলেন। রঘুবংশ কালিমালিপ্ত করার কথা বলেছিলেন।রাবনের কথা ভয় পেয়ে সীতা বাইরে এসে বিপদে পড়েছেন।

চতুর্থ সর্গে মধুকবির স্বাতন্ত্র্য সীতার স্বপ্নদৃশ্য রচনায়। স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে তিনি লঙ্কার পরিনতি ও ভবিতব্য প্রদর্শন করেছেন। সীতা স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন সরমাকে -

"মনঃ দিয়া শুন, সই অপূর্ব কাহিনী
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার!"

মা বসুন্ধরা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে - "তোর হেতু সবংশে মজিবে / অধম।" মধুসূদন 'ভবিতব্য দ্বার' খুলে বাস্তবিক, বাল্মীকির অনুসরন সত্ত্বেও নিজের প্রতিভার মৌলিকতার জাত চিনিয়ে দিয়েছেন।

সীতা ও সরমা পরস্পরের পরিপূরক

সীতা অশোকবনে বন্দিনী। সরমকা নিজের সমাজের মধ্যেই যেন নির্বাসিত। তাঁর স্বনামী বিভীষন বিবেকের তাডনায় নিজের ভাই রাবনকে ত্যাগ করে রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েচেন। সরমা ও নৈতিক দিক থেকে স্বামীর সমমর্থক কিন্তু লঙ্কাবাসী তাঁদের সুনজরে দেখছে না, এটা বোঝা যায়। লঙ্কাবাসীর চোখে আছে ঘৃনা। এই অবমাননার গ্লানি বহন করছে সরমা। সীতাকে কম যন্ত্রনা সহ্য করতে হয় নি। তিনি রাজনন্দিনী, রাজ কুলবধূ। তবু তিনি আজ বন্দইনী। দুঃখিনী সীতা বলেছেন -

"কুক্ষনে জনম মম, সরমা সুন্দরী!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে।"

দুঃখই সীতা ও সরমাকে এক পঙক্তিতে বসিয়েছে। দুঃখের অনুভবই তাঁদের মধ্যে সমপ্রানতা আর সমানুভূতি সঞ্চার করেছে। পরস্পরের সান্নিধ্য তারা স্নিগ্ধ আনন্দ লাভ করেছেন। এক মানবী আর এক দানবীর মধ্যে সূক্ষমতর মেলবন্ধনে সূচিত হয়েছে নবযুগান্তরের দুটি আলাদা সম্প্রদায়। গোষ্ঠী ও জাতির দুই নারীর মধ্যে এই মিল বস্তুত সমস্ত সংকীর্নতার উর্দ্ধে ওঠা মহিমারই ইঙ্গিত বহন করে। সীতা চরিত্রটি আলোকিত করেছেন উদ্ভাসিত করেছেন সরমা, নৈতিকতায়, ধর্মবোধে, সত্যবোধে উভয়ের যথেষ্ট মিল কিন্তু দুঃখ ও লাঞ্ছনায় সীতার তুলনা সীতা স্বয়ং। সতত দুঃখীনি সীতার পাশে সান্ত্বননার মতো উপস্থিত হয়েছেন সহমর্মী সরমা।

মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ

মেঘনাদবধ কাব্যে ষষ্ঠ সর্গের ঘটনা মেঘনানদের মৃত্যু। একে কেন্দ্র রেখেই ঘটনাবর্ত। এটি কাব্য কাহিনীর চরম মুহূর্ত। যা কিছু পরিবেশ রচনা, যা কার্যকারনের সম্পর্ক নির্নয়ের চেষ্টা পূর্ববর্তী পাঁচটি সর্গে ঘটেছে তা যেন এই ষষ্ঠ সর্গের দিকেই অঙ্গুঁলি সঙ্কেত করে আছে। প্রথম ও তৃতীয় সর্গ থেকে যথাক্রমে পিতা ও পত্নীর স্নেহ ও প্রেম দৃষ্টি সম্পাত যেমন এই সর্গটিকে ঘিরে রেখেছে। বেদনার উৎসগুলিকে অবারিত করার জন্য যেমন প্রস্তুতি চলছে। তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গ থেকে উত্থিত দেব-মানবনের যৌথ চেষ্টা মৃত্যুশায়ক উদ্যাত করেছে ষষ্ঠ সর্গের দিকে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীবৃত্তের ক্লাইম্যাক্স ষষ্ঠ সর্গে। কেবল ঘটনার দিক থেকে এর গুরুত্ব নয়, রচনার দিক থেকেও এর সোন্দর্য অতুলনীয়। ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনাভঙ্গীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোননের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষমন বিভিষনের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মন -বিভিষননের স্বার্থ ও প্রয়োজনবোধের বর্নে বর্ননাংশ চিত্রিত। তাদের ভীতি-সংশয়, আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুরই সেখানে মুখ্য। কিন্তু বিভিষন আর লক্ষ্মনের লঙ্কা প্রবেশের পূর্ব মুহূত্য থেকেই দৃষ্টিকোনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। লঙ্কায় রাজলক্ষ্মী নিজতেজ হরনের সঙ্গে সঙ্গে-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গম্ভীর নির্ঘোকে দূরে যোতিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কপিলা বসুধা
আক্ষেপে, এ রক্ষপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্নময়ি।

এই সুরটি পশ্চাৎপটে ধরে রেখেছেন কবি। কিন্তু সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লঙ্কার অতুল বৈভব, মদমত্ত বীর্য ও অপরূপ সৌন্দর্য। বিভীষনের ভাতৃশত্রুতা, লক্ষ্মনের পরম ক্রোধ ও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য-বৈভব-বীর্যে। আর নিকুম্ভিলা যঞ্জাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য যেন লক্ষ্মন-বিভীষনকে সম্পূর্ণত সরিয়ে দিয়ে মেঘনাদের দৃষ্টিকেন্দ্রকে আশ্রয় করেছে। ফলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের ঘটনা ও বর্ণনায় চূড়ান্ত সাপেক্ষতা এসেছে। সমালোচকরা লক্ষ্মনের চরিত্রের এ হেন নতুন রূপ দেখে আপত্তি করেছেন। কিন্তু কবির দৃষ্টি নিরপেক্ষ নয়ন একাব্য ল দু-একট স্থানে সাময়িকভাবে কবি নিরপেক্ষতা দেখিয়নেচেন তবে তা যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়বোধক। অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মহাপরাক্রান্ত কিন্তু নিরস্ত্র বীরের চোখে যে ঘৃননা-অবজ্ঞা-ক্রোধ ধিক্কার দাননা বেঁধে ওঠে মেঘনাদ-লক্ষ্মন-নবিভীষন সংবাদের কল্পনামূলে কবিচিত্ত তাই সক্রিয় ছিল।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে রামের শিবিরে ভীতির ও আতঙ্কের একটি ভাবপরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। লক্ষ্মনকে একাকী নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রেরন করতে গিয়ে রামচন্দ্র আকুল হয়ে উঠেছেন। আবার কিন্তু পরে লক্ষ্মন লঙ্কার বৈভব ও বীর্যবত্তা দর্শনে বিহবল হয়ে পড়েছে। রামচন্দ্রের আকুলতার কারণ মেঘনাদ প্রবল ক্ষমতাশালী বীর। তাই কাব্যের সৌন্দর্য বীরত্ব ঐশ্বর্য মুগ্ধতা সবই মেঘনাদকে ঘিরে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘননাদের আবর্ভাব অনেকখানি পরে তবে কবি প্রথমাবধি ঐ ব্যাক্তির দিকেই দৃষ্টি রেখেছেন। সমগ্র বর্ণনার স্রোত এই সর্গের আরম্ভ থেকেই হোররত ইন্দ্রজিতের দিকে ধাবমান। রাম বারবার সভয়ে বলেছেন-

"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতারে উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে; দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত-নর ত্রাস, রথীন্দ্র রাবনি!

বিভীষননের অভয়বানীর মধ্যেও ভয়ের ছায়া পড়েছে-

দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবনি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে!

কিন্তু এটাও সত্য যে ইন্দ্রজিতের এই অপরাজেয় শক্তি আজ ধুলিসাৎ হবে। সেই পরিনতি সকলেরই জানা। কবি সেই অবশ্যম্ভাবী পরিনতিকে গোপন করেননি। বরং মেঘনাদের বীরত্বের ও আসন্ন ধ্বংসের উল্লেখ বারংবার করেছেন। লক্ষ্মন আশ্বাস দিয়ে দেবকুলের আর্শীবাদের উল্লেখ করেছেন, বিভীষন বলেছেন-

দেবকুল প্রিয় তুমি, রসুকুলমনি
কাহারে ভরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্র শুর মেঘনাদ শূরে।

আকাশবনানী ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করেছে অহি-শিখীর দ্বন্দ্বে শিখীর পরাজয় দেকিয়ে। শক্তিশ্বরী বলেছেন-

নাশিবে শূর, শিবের আদেশে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘননাদে।

লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছে-

সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দনে
বলী-অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে।

কবি জানেন, রামায়ন কাহিনীর এই সর্বজ্ঞাত পরিনতি বাঙালি পাঠকের অজানা নেই। তাকে আবৃত রেখে কাহিনী(র কৌতূল বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই তিনি প্রথম থেকেই পরিনতিটিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে রেখেছেন। তারপরে আশ্চর্য কারন কৌশলে সেই চেনা পরিনতিই ঘটিয়েছেন, তবু তাকে পুরাতন বলে মনে হয়নি, বর্ণনার গুনে তার বেদনা পাঠকচিত্তের গভীরে প্রবেশ করেছে।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেব মানবের চরম চেষ্টার ফল ফলবে আজ। এই প্রত্যয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষনার পরে কবি লঙ্কাপুরীর সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য চিত্রনে মধুসূদনের সাফল্য সর্বাধিক। লঙ্কাপুরীর এই বিস্তৃত চিত্র মেঘনাদের উল্লেখ একবাও নেই। একবনার মাত্র ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের অধিকারী রাবনের কথা এসেছে। লক্ষ্মনের কণ্ঠে - 'এ

টিপ্পনী

হেন বিভব, আহা কার ভবতলে?”

টিপ্পনী

সমগ্র লঙ্কাপুরী মেঘনাদের শক্তিসম্পর্কে সন্দেহহীন। লক্ষ্মনের যজ্ঞাগারে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে দুজন পুরবাসীর কথোপকথোনে তার স্পষ্ট বাস্তব ছবি উঠে আসে-

কেহ কহে- ‘চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে,
না পাইব স্থান যদি না যাই সকলে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ।’.... কেহ উত্তরিছে
প্রগলভে- ‘কি কাজ, কহ, প্রাচীর ধীরে?
মুহূর্তে নাশিবে রামে, অনুজ লক্ষ্মনে
যুবরাজ তার শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃনে যথা
দহে বহ্নি রিপুদমী! প্রচন্ড আঘাতে
দম্ভি তাত বিভীষনে, বাঁধিবে অধমে
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রনজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।”

এই স্থির বিশ্বাসের বানী শুনতে শুনতে লক্ষ্মন যজ্ঞাগারে প্রবেশ করল। পাঠক মমেঘননাদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক - কিভাবে লক্ষ্মন মেঘনাদকে হত্যে করল?

এসব কলাকৌশল কাব্য কৌতূহলকেই মাত্র সজাগ রাখে নি, একটি বৃহত্তর কাব্যিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। পঞ্চম সর্গের সমাপ্তি অংশেই মেঘনাদকে মাতার স্নেহ ও পত্নীপ্রেমের স্নিগ্ধছায়ায় উপস্থিত করে তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতিকে তীব্র ও আবেগবিহবল করে তোলা হয়েছে। প্রথম সর্গে বন্দীদের বন্দনাগানে, তৃতীয় সর্গে প্রমীলা কাহিনীতে এবং সবশেষে পঞ্চম সর্গে কবির চেষ্টায় এমন মেঘনাদ চরিত্র উঠে এসেছে যা পাঠকের সুগভির ভালবাসায় অভিষিক্ত। ষষ্ঠ সর্গে কখনও মেঘনানদের দুর্মদ বীরত্বের প্রতি ভীতিব্যঞ্জক উল্লেখ, কখনও মেঘনাদের অবশ্যমৃত্যুর ভবিষ্যদ্বানীতে কখনও লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বর্ননায় তাঁর অতিপ্রিয় কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে পাঠকের মমতার কেন্দ্র এসে ফেলেছেন।

মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ আমরা একাব্যে পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে মেঘনাদ যুদ্ধের অবকাশ পায় নি। অস্ত্রহীন মৃত্যু তাকে বরন করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঘটনাগত মাহাত্ম্য নেই, চরিত্রের গৌরবও নেই। কিন্তু কবি র্নাব এবং কল্পনায় কিছু সুযোগ সৃষ্টি কর এই সামান্য মৃত্যুকেও অনেকখানি মহিমা দিয়েছেন। বিভীষননের প্রতি ভৎর্সনায় স্বাদেশিকতা, সোজন্য এবং গৃনার একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটছে। মূল রামায়নে ইন্দ্রজিতের অমার্জিত রূঢ়তার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

আআর মহাবীর মেঘনাদেদর এই অপঘাত মৃত্যুতে ভাগ্যের নিষ্ঠুর লীলাই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। রাবনের ট্রাজিক বেদনার সমগ্রতার সঙ্গে এর সুরের আশ্চর্য ঐক আছে সেদিক থেকেও কবির পরিকল্পনার সার্থকতা মেনে নিতে হয়।

ষষ্ঠ সর্গে অবশ্য বক্তৃতার কিছু প্রাধান্য আছে। কিন্তু পূর্বাপর নাট্যরসোপোযোগী চমক সৃষ্টি দ্বারা তিনি বক্তৃতার এক ঘেয়েমি দূর করেছেন। লক্ষ্মনকে আরাধ্য দেবতা অগ্নি বলে ভ্রান্তি, লক্ষ্মনের ছদ্মবেশ পরিহার করার জন্য তাকে বারংবার অনুরোধ, অবশেষে ভ্রান্তি অপনোদন। এখানে পঠক স্বাভাবিকভাবেই তীব্র নাটকীয় চমক প্রত্যাশা করতে পোআরে। এই ভ্রান্তিভঙ্গে মেঘনাদের ভীতত্রস্ত বিস্ময় খুবই স্বাভাবিক হতে পারত। কিন্তু মধুসূদন নাট্যরসকে তীব্রতর করে তুলেছেন মেঘনাদকে দিয়ে লক্ষ্মনকে আতিথেয়তা গ্রহনে অনুরোধ জানিয়ে। পরমুহূর্তে লক্ষ্মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মেঘনাদের উত্তেজিত ভৎর্সনা-

ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মন! নির্লজ তুই

এবং তারপর

চক্ষের নিমেষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোরনাদে লক্ষ্মনের শিরে।

মূর্চ্ছিত লক্ষ্মনের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মেঘনাদ অস্ত্রাগারে যাবার জন্য পা বাড়াল, এবাএর অভিজ্ঞতা আঘাত তীব্রতর-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম সূলহস্তে, ধূমকেতু সম
খুল্লতাত বিভীষনে - বিভীষন রনে।

এরপরে মেঘনাদের বক্তব্য, লক্ষ্মনে চেতনা ফিরে আসার আগে পর্যন্ত, কিন্তু মধুসূদননের পরিমানবোধ ছিল, স্থান কালের মাহাত্ম্য তিনি বুঝতেন। ঘটনার গতি যেখানে প্রবল সেখানে দীর্ঘকাল তাকে বক্তৃতার বভাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাকা যায় না। পঞ্চাশ পংক্তিতে বিস্তৃত এই বক্তব্যে মূল বিষয় স্বাদেশিকতা। মেঘনাদের বাক্যে লক্ষ্মন মেঘনাদের অসম দ্বন্দ্বে, কিংবা মেঘনাদের মৃত্যুতে মধুসুদন তাঁর রচনাশক্তিকে যে সংক্ষিপ্ততা ও সংযমে বেঁধেছেন তা অতি উচ্চ মহাকাব্যিক রচনাভঙ্গীর পরিচায়ক।

মেঘনাদবধ কাব্য : নবম সর্গ

নবম সর্গে মেগনাদবধ কাহিনীর উপসংহার ঘটেছে । এর বেদনামথিত স্বাভাবিকিত্ব কাহিনীবৃত্তকে সুনিপুন সম্পূর্নতা দিয়েছে। প্রমীলাসহ মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকারান্তে অবশিষ্ট রিলেন রাবন । ভগ্নশাখা বৃক্ষের মত নিজন প্রান্তরে চলল তার অমারাত্রিত প্রতীযা। বজ্রাহত হয়ে নিঃশেষিত হবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভেই রাবন সংশয়যন্বিত হয়েছেন । নিজের পতন সম্ভাবনাকে যেন দূরে দেখতে পেয়েছে, অন্তঃসার চূন্যতা অনুভব করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সমাপ্তীতে সেই অন্তসারসূন্যতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। নবম সর্গ যেন সমগ্র লঙ্কাকান্ডের উপসংহারের দ্যোতনাবাহী।

মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গ একাব্যের ক্ষুদ্রতম অধ্যায়। চারকা পংক্তি আছে এ সর্গে। কবি কাব্যকহীনীকে গুটিয়ে এনেছেন। একটি ঘটনায় একটি মনোভাবের কেন্দ্র বিন্দুতে তাকে এবার সমাপ্ত করবেন। এ সর্গে তাই সংহতি ও সংক্ষিপ্ততার প্রায় আদর্শে পৌঁচেছেন কবি। রামচন্দ্রের নিকট দূত প্রেরন ও সাতদিনের জন্য সন্ধিস্থাপন, সীতা সরমার আলাপ-মাধ্যম প্রমীলার সহমরনের সংবাদ দান, শোকযাত্রা, সৎকার ও রাবনের আর্তনাদ। সীতা সরমার আলাপ কিছুমাত্র কেন্দ্রচ্যুত নয়। রক্ষ-রমনীদের মধ্যে মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদা ও পরমীলার সঙ্গেই পাঠক পরিচিতি। তাদের মাধ্যমে প্রমীলার সহমরন সংবাদদানের সুযোগ ছিল না। কাব্যের শেষ সর্গে এই উদ্দেশ্যে নরচরিত্রের অনুপ্রবেশও সম্ভব নয়। সীতা - সরমার আলাপের মধ্যেই পাঠক প্রথম এই সংবাদ পান। সরমা রক্ষকুলের হয়েও রক্ষবংশের ধ্বংসে ততখানি বেদনাহত নয় যদিও প্রমীলার সহমরনে সে ব্যাথিত, তাকেই কবি এই সংবাদদানবে ব্যবহার করেছেন। এই সংবাদ পূর্বাহ্নে পাঠককে দেবার প্রয়োজন ছিল,

অন্যথায় কিছু পরে অকস্মাৎ প্রমীউলাকে সহমরনের বেশে দেখলে আর পাঠকদের বোধ ও বুদ্ধি বিপর্যস্ত হতে পারত। নতুন কোনরূপ নাটকীয় চমক গ্রহননের ক্ষমতা আর পাঠকদের থাকবার কথা নয়। এখন একটা বিলম্বিত অনুরনন, একটা চিত্তদীর্ন কিন্তু নিঃশব্দ শূন্যতাই প্রত্যাশিত।

মধুসূদনের কবিপ্রান বেদনার সমুদ্রে স্নান করে নবম সর্গে বেদনা - উপব্ধির ও 'বৈরাগ্য' চেতনায় উঠেছে। কবি যেন আর তীব্র ট্র্যাজিক হাহাকারে আর্ত নন। তিনি তটস্থ উপভোক্তা, সে উপভোক্তা অবশ্য দোঃকের। এই চেতনার স্পর্শেই রামচরিত্র ও কবির দ্রোহবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠেছে, একটা সুকুমার পুরুতোচিত মাহাত্মে নতুন রূপ পেয়েছে। সীতার পূর্বেকার দয়া যেন আরো বিগলিত হয়ে প্রবাহিত। ফলে এই সর্গে সুব কোথাও কাটে নি। এমন কি রানের সংক্ষিপ্ত ক্রন্দনেও পূর্বের সেই আর্তনাদ এই। ভেসে যেতে যেতে হাহাকার করে মানুষ, তার মধ্যে উদ্ধারের ক্ষীন আশাও থাকে। সেটুকু যখন সমাপ্ত হয় তখন যে দীর্ঘশ্বাস ও নীরব অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় নবম সর্গে তারই সাক্ষাৎ পাই। কথা তাই স্বল্প হয়ে এসেছে, না বলা কথার ব্যাথার সুরই এখানে সর্বব্যাপী।

বিগলিত বেদনাধারার সমাপ্তিতে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জনকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন কবি -

অধীর হইয়া সুলী কৈলাস- আলে!
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষন গর্জনে
গর্জিল ভূজঙ্গবৃন্দ, ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা তইপথগা বরিতায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাশগিরি থর থর থরে।

দুঃখের উৎসে যে ক্রোধের জন্ম, দুঃখে যার বিলউপ্তি তার ভাষারূপ অশ্রুরুদ্ধ পাঠকচিত্তে অতলস্পর্শী গভীরতে ও গাম্ভীর্য সঞ্চারিত করে। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই গম্ভির গর্জনের বিলীমান শব্দস্রোতে উদাসী বাতাসের করুন ধ্বনিত হয় -

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

অবশ্য রুদ্ররোষ থেকে রামলক্ষনকে বাঁচাবার জন্য পার্বতীর প্রচেষ্টা অন্যত্র তাৎপর্যপূর্ন হতে পারত, কিন্তু এ সর্গে পারিজার যোগ্য রসাভাস বলে মনে হয়।

গ্রন্থপুঞ্জী

(১) শ্রী মধুসূদন - মোহিতলাল মজুমদার

(২) মধুস্মৃতি - নগেন্দ্রনাথ সোম

(৩) আশার ছলনে ভুলি - গোলাম মুরশিদ

(৪) মধুসূদন : কবিও নাট্যকার - সুবোচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রশ্নাবলী

(১) মেঘনাদধ কাব্যের নায়ক কে ? আলোচনা কর।

(২) সীতা চরিত্র কতদূর সার্থক আলোচনা কর।

(৩) মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের উপযোগিতা বিচার কর।

(৪) মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের প্রক্ষিতে মেঘনাদ চরিত্রটি বিশ্লেষন কর।

(৫) মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গের প্রাসঙ্গিকতা বিচার কর।

টিপ্পনী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রীঃ)

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না - জন্মিবার যো নাই - জন্মিয়া কাজ নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিতা সংগ্রহে' । ঈশ্রগুপ্ত সম্পর্কে শিক্ষিত আধুনিক বাঙালির এইটি সঠিক মনোভাব। ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালি কবি 'আর জন্মে না, জন্মিবার যো নাই - জন্মিয়া কাজ নাই।' এই ন্তব্যে বাঙালী কাবপাঠ্যকের রুচিবদল ও কাবিশ্বাসের পরিবর্তন চিরকালের তো নির্ধারিত হয়ে গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতা তথা সাহিত্যের কেই নন, তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অন্তরের যোগ নেই, এই সত্যটি এখানে স্পষ্ট উচ্চারিত।

এই মন্তব্য লেখার পনের বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'Bengali Literature' (ইংরাজি প্রন্ধে, ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৭১) কিন্তু তীব্রাবেই বলেছিলেন, 'A dozen years have not elapsed sine Iswar Gupta lived, yet we speak of him as belonging to a post era.

সত্যি তাই ১৮৭১ খ্রীষ্টাদে মধুসূদনের রচনাবলী ও স্বযং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাক-বঙ্গদর্শন পর্বের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের জন্মমান্তর হয়েচে। মেঘনাদবধ কাব, বীরঙ্গনা, ব্রজঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ও দুর্গেশনন্দিনী কপালকুন্ডলা ও মৃনালিনীতে বাঙালী সাহিত্যরসে মজেছে । পাশ্চাত্য রোমান্টিক রসচেতনায়উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তার ফলে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২ -১৮৫৯) রচনাবলী বাঙালী পাঠকের কাছে দূরতর দ্বীপ বলে প্রতিভাত হয়ছে। গত যুগের সাহিত্যকর্মের প্রতি নতুন যুগের কৌতূলী দৃষ্টিপাত ও মূল্যনিরূপন প্রয়াসের ফল বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত্র ও কবিত্ব।'

ঈশ্বর গুপ্তের দু-বছর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা লিরিক মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' প্রকাশিত হয় ও রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। মধুসূদন 'আত্মবিলাপ' প্রমাণ করল

ঈশ্বর গুপ্তের পথ বাঙালি চিরকালের মতো পরিত্যাগ করে এসেছে।

টিপ্পনী

ঈশ্বর গুপ্তের কাল (১৮৩১ - ৫৯) বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে করান্তিকারী পর্ব। এই পর্বে সাহিত্যের ও জীবনের প্রাচীন আদর্শ বিনষ্ট। নতুন আদর্শ গড়ে ওঠে নি। নতুন আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল মধুসূদনের কেলে (১৮৬১-৬৬)।

ঈশ্বরগুপ্তের মুখেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যদর্শ আমাদের সাহিত্যে এল। প্রাচীন যুগের সঙ্গে সাহিত্যের আধুনিক যুগের যোগসূত্রটি তিনিই ছিন্ন করে দিলেন। তাঁর বিতা ও গদভরচনার একটি বৈশিষ্ট্য আজ আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে - তা হল ঈশ্বর গুপ্তের মানবিকতা। বহর্জগৎ সম্বন্ধে সুস্থ অনুরাগ ও সচেতন কৌতূহল, বস্তুনির্ভরতা, বুদ্ধি ও যুক্তির উপর আস্থা, সেই সূত্রেই ব্যঙ্গপরায়নতা ও রসিকতা, ভাববিলাস এড়িয়ে যাবার প্রয়াস - এই মানবিকতার মৌল উপাদান।

ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যানুভাবানায় প্রবুদ্ধ হয়ে যখন বাঙালি শিক্ষিতরা ইংরেজী কাব্য-চনার কথা আবতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা পদ্য রচনায় নতুন করে উৎসাহ সঞ্চার করেন। নতুন কাবভাবনাব তিনি উদ্বুদ্ধ হন নি ; তবু নবযুগের বাস্তব উদ্যেগ আয়োজনের ফলে কতকটা বাস্তব-বোধ তাঁর চিন্তায় দেখা দেয়, কতকটা নিজের প্রবনতায়ও তিনি বাংলা পদ্যে অভিনবত্ব দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুনগ্রহী শিষ্য হয়েও দুঃখ করেছেন - বাংলার উন্নতি আরওও ত্রিশ বছর অগ্রসর হত যদিঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করতেন। ইংরেজি শিক্ষা দূরের কথা, তিনি প্রায় কোনো শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি।

কাঁচড়াপাড়ায় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জন্ম দরিদ্র বৈদ্য বংশে । বাল্য থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারন মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন। মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারতেন। পরে হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বেঁধে দিতেন। ওখানেই তাঁর শিক্ষা। ভাগ্যক্রমে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল, তার সাহায্যে ১৮৩১ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী ঈশ্বরচন্দ্র নিজের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশিত করলেন। বাংলা সাহিত্যের সেটি শুভদিন 'সংবাদ প্রভাকর' সংবাদপ্রের ইতিহাসে একটা কীর্তি স্থাপন করল। প্রাচীন কবিদের জীবনী সযত্নে সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেন ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরের' পাতায়। 'প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচনার আসর প্রস্তুত করেন। আর একদল নতুন যুবককে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করেন - তাঁদের মধ্যে ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ। একজন ও ঈশ্বরগুপ্ত ও সংবাদ

প্রভাকর অমর হয়ে থাকবেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

টিপ্পনী

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে বলেছেন, "সে কাল আর একালের সন্ধিস্থলে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব।" আফ আখড়াইয়নের দলে তিনি কবিতা বাঁধতেন। দেশীভাবে ছড়াকাটা ব্যঙ্গপ্রবনতা ছিল তাঁর স্বভাব। সাধারন বাঙালীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার জিনিসে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ, আর সেই অভ্যস্ত জীবনকে নতুন কালের দাপাদাপি থেকে ব্যঙ্গবিদ্রুপে তিনি রক্ষা করতে চাইতেন। এসব তাঁর সৃষ্টির এক দিক। অন্যদিকে তিনি 'তত্ত্বাবোধিনী সভার সভ্য, ব্রাহ্মসভার একেশ্বরবাদী বিশ্বাসী, নাননা রকম সভা সমিতি উৎসবে উৎসাহী। এসব অন্যদিকে, নবযুগের প্রানধর্ম। তথাপি ঈশ্বর গুপতের জোঁকটা রক্ষনশীলতার দিকেই বেশি, নতুনকে আক্রমনেই তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা। যেমন আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, বেথুন এসে শেষ করেছে-

যত ছুড়ীগুলো তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে!
তখন 'এ, বি' শিসে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া যাবে।

এই বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে যে তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, বরং তার সমর্থক ছিলেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদকীয় লিখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, সমাচার চন্দ্রিকায় স্ত্রী শিক্ষাবিরোধী মন্তব্য প্রকাশিত হলে তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যএবং ইহাতে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব)।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় এক বিদ্বেষহীন রসিকতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। বস্তুবাদী

টিপ্পনী

প্রত্যক্ষবাদী কবি দুনয়ন মেলে সংসারে নানা রঙ্গ এখে মজাদার কবিতা লিখেছেন। ইংরেজি নববর্ষ উৎসব পালনের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত এই বস্তুবাদী মজা ও বিদ্বেষহীন রসিকতার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন -

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ন যতো শ্বেত নর।।
এই উৎসবে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধছোটে
আহা তাব রোজ রোজ কত রোজ ফোটে।।

রোজ রোজ কত Rose ফোটে - কেবল শব্দ চাতুর্য নয়, বস্তুগত রঙ্গদৃষ্টি এখানে অনতিপ্রচ্ছন্ন। গোলাপ সুন্দরী বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্বেষ নয়, বক্র কটাক্ষ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

কবিওয়ালাদের কাছ থেকে পাওয়া রঙ্গকৌতুকের বাহনটিকে ঈশ্বরগুপ্ত নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। বিদ্বেষহীন রসিকতা ও বিশুদ্ধ রঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের হাতে এক অভিনব কাব্যমূর্তি লাভ করেছিলে। এক্ষেত্রে কবিওয়ালাদের চেয়ে ঈশ্বরগুপ্তের নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের শিল্পী। তির্যক বাগভঙ্গিমা, যমক ও শলোকের সপ্রতিভ অর্থচাতুর্য অসাধারন উপমাকে ঈশ্বরগুপ্ত পয়ারের চোদ্দ মাত্রায় সংহত শিল্পরূপ দিতে পেরেছিলেন।

এখানেই তিনি আর্টিস্ট। পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস - সবই কবির হাতে পড়ে এক অভিনব রস লাভ করেছে।

পাঁঠা: "রসভরা রসময় রসে ছাগল
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।।"
এমন পাঁঠার নাম যে রেখেচে বোকা
নিজে সেই বোকা নয়, জাড়ে বংশে বোকা।।

তপসে মাছ: কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর প্রায়।

আনারস: বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর

ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সবগায়
নীলকান্ত মনিহার চাঁদের গলায়
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে
বোধহয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে

এইসব বর্ণনানর চিত্রলতা ও উপমার অসাধারনত্ব আমাদের মুগ্ধ ও চকিত করে। অর্থচাতুর্য ও তির্যক বাগভঙ্গিমা তাঁর এই সব বর্ণনায় দিয়েছে এক সংহত শিল্পরূপ। রবীন্দ্রনা ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার এই সপ্রতিভতায় ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ঈশ্বরগুপ্তের আপাত-কাতর প্রার্থনা অন্তরালে চাপা হাসির আভাস ধরা পড়ে-

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল, বিচিলি ঘাস
যেন রাঙা আমলা ঢুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না
আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না।

বলবার বিচিত্র ভঙ্গি দুঃখের মধ্যে হাসির উদ্রেক করে। সংহত মার্জিত স্টাইল ও চাপা হাসির দৃষ্টিভঙ্গি, দুয়ে মিলে এই বর্ণনাকে এক বিরল সপ্রতিভ শিল্পশ্রী দান করেছে।

ঈশ্বরগুপ্তের অভিনবত্ব তাঁর দেশপ্রীতিতে । দেশের প্রতি স্বাভাবিক মমতা - আপনা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে-

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

ঈশ্বরগুপ্ত এই সত্য অনুভব করেছিলেন যে 'মাতৃসম মাতৃভাষা'।

টিপ্পনী

নবযুগের আরও লঙ্ঘন ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে দেখা যায়, যেমন - প্রকৃতি বর্ণনা। প্রকৃতির অন্তর প্রকৃতির অন্তর প্রকৃতির সন্ধান ছিল তাঁর সাধ্যের অতীত, কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা তিনি সপ্রতিভ, বস্তুনিষ্ঠ।

টিপ্পনী

গ্রীষ্ম: এমন আঁকাশি নাই খোঁা মেরে দেখি ভাই
আকাশেতে জল আছে কিনা।

শীত: জলের উঠেছে দাঁত কার সাধ্য দেয় হাত
আঁক করে কেটে লয় বাপ।

উপভোগ্যতা ঈশ্বরগুপ্তের প্রধান গুন। এর মূলে আছে দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির সপ্রতিভতা। এখানেই তিনি বিশিষ্ট ও স্মরনীয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

বাংলা কাব্যের নবযুগের কবি প্রকৃতির নতুন পরিচয়ের একটি দিক মধুসূদনে রূপায়িত। তার বিপরীতধর্মী আর একটি দিক বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যে উদ্ভাসিত। কবি অন্তরের যে একটি অকারন অনির্দেশ্য বেদননাবোধ, একটি অপো্রকাশিত অভাবের অস্বস্তি যে কবি মনে সদাজাগ্রত এবং এটাই যে কবিতায় কবির প্ররনা হতে পারে তা অনাধুনিক বাংলা কাব্যের কবিদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এমন কি, যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত কবিদের কাছেও তা অজানা ছিল। মধুসূদনের কিতায় 'নিজের মনের কথা' লিপিবদ্ধ করার বাসনা ব্যক্ত হলেও মহাকাব্যের সৌধ নির্মানেই তাঁর কবিপ্রতিভা ছিল অভিনিবিষ্ট। যেমন তার ব্যাক্তিকতা, তেমনি তার গীতিপ্রবনতাও ছিল পরোক্ষাবৃত্ত। তাঁর দুই যোগ্য উত্তরসাধক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মুখ্যাত মহাকাব্য প্রনেতারূপেই সুখ্যাত। স্বভাবতই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে গীতিকবিতার প্রয়োজন মেটাতে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

বিহারীলাল ছিলেন সংস্কৃতের ছাত্র এবং স্বয়ং শিক্ষিত। সংস্কৃত কাব্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে কালিদাসের ও বাল্মীকির কবিত্বরসে ইনি বিভোর ছিলেন। অন্যদিকে পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি প্রানের টান ছিল এবং ইংরেজী কাব্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। বিহারীলালের কবিত্বে প্রসাধনের সজ্জা নেই, ভাবের প্রকাশ আছে। তাই তাঁর কাব্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তরঙ্গ এবং তার জীবন চেষ্টার অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথের

ভাষায় - "বিহারীলালের মনের চারিদিকে ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমন্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত - তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ন একটি কবির আনন্দ ছিল।"

টিপ্পনী

রচনাসমূহ

স্বপ্নদর্শন (১৮২৫), অভিনব গদ্যরূপ কাব্য, সংগীতশতক (১৮৬২), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), প্রেমপ্রাহিনী (১৮৭১), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), মায়াদেবী (১৮৮২), ধূমকেতু (১৮৮২), বাউল বিংশতি (১৮৮৭), সাধের আসন (১৮৮৯), শরৎকাল এবং দেবরানী,গোধূলী (১৮৯৯) এছাড়াও 'অবোধবন্ধু' নামে একটি ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। প্রথম ওই দ্বিতীয় ভাগে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীঃ। কবি বিহারীলাল সম্পাদিত ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধু কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়ে উঠেছিল 'প্রত্যুষের শুকতার', তার মনের একতারায় বেজে ওঠা মাঠের ও বনের গান। 'স্বপ্নদর্শন' কাব্যটিকে অভিনন্দন জানান কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায়।

বিহারীলালের কবিধর্মে ছিল অনন্য স্বকীয়তা। সঙ্গীতের আদিম পরিচয় হল তা হবে Over heand অর্থাৎ গায়কের অভিপ্রেত না হলেও শ্রোতা সেই গান শুনে নির্জনতার বেদন রসে অভিষিক্ত হবেন। বিহারীলাল সেই জাতের গায়ক। তাঁর বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যদুটিতে নিজের অন্তরঙ্গ জীবনের সমস্ত কথাই অনাবৃত। কবি বন্ধু যিনি এং নায়করূপে চিত্রিত তিনি কবিরই আত্মপ্রতিম, প্রনয়ী দম্পতির প্রনয়ভঙ্গ ও সেই প্রেমের আদর্শায়িত ভাববিগ্রহের সন্নধানে নিসর্গে অন্বেষন, কবিতায় উপ্যাখান অংশ এইটুকু মাত্র। আসলে উপাখ্যান নয় আধ্যাত্মিকতাই হল এর মূল নির্ভর স্থল। তাই বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে আধুনিক পাঠক এর যেমন অন্তরঙ্গ মিল দেখা যায় তেমনি শেলির Atstor কাব্যের সঙ্গে আধুনিক পাঠক এর বহিরঙ্গ সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারেন।

'বঙ্গসুন্দরীর মধ্যে ননারী বন্দনার মধ্যে রোমান্টিক মনোভাব ব্যক্ত। বঙ্গসুন্দরীর মধ্যে তথ্যের বস্তুপ্রধান কাঠামো ভেদ করে নারী আদর্শের ভাবপ্রশস্তি দেখা যায়। এর দার্শনিক ভিত্তি অগস্ত কোঁতের দর্শন অনুসারে সৃষ্ট বলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন। - " আমার মনে হয় কোঁৎ যদি একটি পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্রুবধর্মের গাথাসমূহ মধ্যে (hymns of Positive religion) ইহাকে সর্বপ্রথম ও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে অগ্রসর হইতেন।" ("পুরাতন প্রসঙ্গ", বিপিনবিহারী গুপ্ত)। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে রূপহীন বস্তু থেকে স্বপ্নসুষমা আহরনের প্রচেষ্টা দেখা যায় -

টিপ্পনী

"একদিন দেব তরুন তপন
হেরিলেন সুরুনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।"

কবির সর্বাধিক আলোচিত কাব্য সারামঙ্গল। অন্তরবাসিনী কাব্যশ্রীকে অন্তরে বাইরে বিচিত্র কল্পনায় যে ভাবে ও যে রূপে উপলব্ধি করেছিলেন তাই কবি সারদামঙ্গলে আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। সারদামঙ্গল একান্তভাবে 'সাবজেকটিভ' অর্থাৎ আত্মগত, অন্তরঙ্গ কাব্য। এখানে কবি কল্পনা যেমন বাষ্পোদ্বেল ও পরিবর্তনশীল কাব্যকল্পননা ও তেমনি প্রায় ও উদ্বায়ু। সান্ধ্যসূর্যের অস্তরাগ যেমন মেঘের প্রেক্ষাপটে মুহূর্তে রঙ পাল্টাতে থাকে সারদামঙ্গলে রোমান্টিক কবি কল্পনা তেমনি যেন ক্ষনে ক্ষনে রূপ পাল্টে যাচ্ছে। কাব্যের আখ্যানবস্তু বিশেষ কিছু নেই। কবিমনের আবেগেই কাব্যটির মূল উপাদান। সে আবেগ মাঝে মাঝে ভাবকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

সারদামঙ্গল পাঁচ সর্গে গাঁথা, প্রথম সর্গে কবিচিত্তে কাব্যলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব বিশ্বের জীব ধাত্রী উষা-গায়ত্রী রূপে। দ্বিতীয় আবর্ভাব বাল্মীকির কবিমানসে করুনাময়ী রূপে সহচরবিরহিত ক্রৌঞ্চির শোক করল হৃদয় মুনিকে বিহ্বল করল। সেই কারন্যের কবিমানসে কাব্য সরস্বতী জেগে উঠিলেন। কবিহৃদয়ে কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিলেন দুইরূপে - আনন্দলক্ষ্মী ও বিষন্ন করুনাময়ী রূপে। কবিজীবনের নিগূঢ় বিরহব্যাথায় আনন্দলক্ষ্মীর রূপ ক্ষনে ঠাকা পড়ে যায়। দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দলক্ষীর উদ্দেশ্যে কবিচিত্তের অভিসার। কবিচিত্ত যেন সতীহারা শিব। দীর্ঘ বিরহের হতাশা -

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র - দিনে
সুদীর্ঘ জীবন জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে।

তৃতীয় সর্গে কবিচিত্তের সংশয়। হারানো আনন্দরসের অন্বেষনে হয়রান হয়ে কবি আরও ব্যথিত। সঙ্গে থাকে আনন্দের চকিত উপলব্ধি। চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার

প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস-অন্বেষন। পঞ্চম সর্গে সেই পুন্যভূমিতে অভিলচিত আনন্দ উপলব্ধি-

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
হে প্রশান্ত গিরি ভুমি,
জীবনন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!

'সারদামঙ্গল' নামকরনে কবি বাহ্যত প্রাচীন বাংলা কাব্যের রীতি অনুসরন করেছেন। কাব্যটি গীতিপ্রনোদিত এবং গীতিবহুল, সুতরাং আধুনিক এবং প্রাচীন দুই অর্থেই এটি গীতিকাব্য। কাব্যের বিষয় দেবীমাহাত্ম্য, তবে লোকউপাস্য দেবী নয়- কাব্য সরস্বতী। এ কাব্যের ভাষা কবি কল্পনার পক্ষে উপযুক্ত। অর্থাৎ এর ভাষা ও ভাব দুইই অপরিস্ফুট, কলগুঞ্জিত মার্জনার অভাব আছে। কিন্তু কুন্ঠা ও কৃত্রিমতা নেই। আদ্যোপ্রান্ত তিনমাত্রার তরল ছন্দের পরিবর্তে ত্রিপদীঘেঁষা দীর্ঘ স্তবক ব্যবহৃত হয়েছে। সারদামঙ্গল কাব্যের ছন্দের অসাধারন বিশেষত্ব প্রতি সর্গের শেষে ছত্রের মিল।

মায়াদেবী ক্ষুদ্র কাব্য। শরৎকাল কয়েকটি খন্ড কিতার সংকলন। ধুমকেতু ও দেবরানী কবিতা মাত্র। বাউল বিংশতি কবিরচিত বাউলগানের সংকলন। বাউলবিংশতির কোন কোন গানে লিবিক রসের নিবিড়তা আছে।

বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন' সারদামঙ্গলের পরিশিষ্ঠের মতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বিনী দেবী বিহারীলালের কাব্যের বিশেষ করে সারদামঙ্গলের অনুরক্ত পাঠিকা ছিলেন। তিনি কবিকে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, তাতে সারদামঙ্গলের কয়েকছত্র তোলা ছিল।

হে যোগেন্দ্র। যোগাসনে
ঢুলুঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

কবির কাছে ভক্ত পাঠিকা এই প্রশ্ন রেখেছিলেন। বিহারীলাল 'সাধের আসন' কাব্যে তারই উত্তর দিয়েছেন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ধোয়াই কাহারে দেবি নিজে আমি জানিনে।
কবিগুরু বাল্মিকির ধ্যানধনে চিনিনে।।

সাধের আসন দশটি সর্গে ইগক্ত আর শেষে উপসংহার, প্রথম সর্গ মাধুরী, দ্বিতীয় সর্গ - গোধূলি ও নিশীথে, তৃতীয় সর্গ - প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা, চতুর্থ সর্গ - নন্দনকানন, পঞ্চম সর্গ - অমরাবতির প্রবেশ পথ, ষষ্ঠ সর্গ - ককে তুমি ?, সপ্তম সর্গ - মায়া, অষ্টম সর্গ - শশিকলা, স্থিরসৌদামিনী ও বীনা, নবম সর্গ - আসনদাত্রী দেবী, দশম সর্গ - পতিব্রতা।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, তিনি প্রথম "নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন..... সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল, সে সুর তাহার নিজের।" 'তাঁকে ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতায় অনেক সময় রসের অভাব ও ভাবের অতিরেক দেখা যায়। তবে বিহারীলালের কবিপ্রতিভায় খাদ ছিল না। বঙ্গসুন্দরী সারদামঙ্গল সাধের আসন প্রভৃতি কাব্যের স্থায়ী মূল্য যেমনই হোক আধুনিক বাংলা অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যের প্রবর্তন তিনিই একথা স্বীকার করতেই হয়

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ খ্রীঃ)

অক্ষবকুমার বড়াল বিহারীলালকে গুরু বলে মানতেন। তাঁর কাব্যপদ্ধতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরন করেছেন অক্ষয়কুমার। আবার সেই প্রভাব অনেকটা কাটিয়ে ও উঠতে পেয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় ভাবোচ্ছাস সংযত এবং বিষয়বস্তু সংহত ও প্রকাশ স্পষ্টতর। গুরর আনন্দমগ্নতার কোন রেশ শিষ্যের রচনায় নেই। তবে বিহারীলালের রচনাশৈথিল্যও তাঁর কাব্যে নেই। বৈষ্ণব আলঙ্কারিদের পরিভাষায় বলতে গেলে বিহারীলাল ভাব-সম্মিলনের কবি অক্ষয়কুমার প্রেমবৈচিত্রের। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গেও অক্ষয়কুমারের মিল আছে। সে হল গার্হস্থ্য প্রেম। তবে দেবেন্দ্রননাথের প্রেমের কবিতা ঘরের সীমানায় ঘেরা, আর অক্ষয়কুমারের কাব্যলক্ষী অন্তঃপুরবাসিণী হয়েও অবরোধের বাইরে পদদচারনায় করেন। ভগবদ্‌ভক্তির প্রকাশো উভয়ের কবিতার একটা সমান ধর্ম। গোবিন্দচন্দ্র দাস ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে সাধর্ম্য আছে ভাবাবেগের তীব্রতায়। তবে গোবিন্দচন্দ্রের আবেগ Passionate, বাসনাবিল ; অক্ষয়কুমারের আবেগ Thoughtful ভাবনা আকুল। গোবিন্দচন্দ্র চেয়েছেন নারীরূপকে ইন্দ্রিয়বাঁধনে তরে উপভোগ করতে, অক্ষয়কুমার চেয়েছেন সে রূপমাধুরী ধ্যানকল্পনায় অনুভব করতে।

বয়সে প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমান হলেও অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্রপূর্ব কবি বলে ধরা হয়। তাঁর রচনায় বিহারীলালের প্রভাব আছে তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও অননুভূত নয়। অক্ষয়কুমারের অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের কবিতা অক্ষয়কুমারকে প্রভাবিত করেছিল। অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা'র অনুসরনে লেখা। অক্ষয়কুমারের 'নিদাঘে' ও মথুরায়' রবীন্দ্রনাথের 'বননের ছায়া' ও 'বসন্ত অবসান' এর প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের - "কোথা রে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ", অক্ষয় কুমারে - "কোথা সে নিকুঞ্জ ছায়া অলস পরশ - খেলে?" রবীন্দ্রনাথের - "কমল বসন্ত গেল এবার হল না গান" অক্ষয় কুমারের - "আমরি হল না গান, আমরি বাঁশরি নাই! বসন্ত যে এল গেল, বসে আচি শূন্যে তাই!" "নিশি রে কি পত্র লিখিস্ তুই তারকা অক্ষরে আকাশের পরে।" এই উৎপেক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের "কৈশোরক" কবিতায় যে অস্ফুট ব্যাকুলতা এবং অকারন হৃদয়বেদনা উদ্বেলিত তা অক্ষয়কুমারের কবিতাকেও স্পর্শ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা হৃদয়ারন্যে অনতিরূঢযৌবন কবিতাচিত্তের দিশেহারা ভাবনা, অক্ষয়কুমারের রচনায় তা প্রেমের অকৃতার্থকতা ও দৈবহত মিলনের চঞ্চলতা -

সুরে শ্বাসে এসে, জলে ভেসে গেছে কথা
যে কথার আগাগোড়া ফেলেছি হারাই -
কি করে বুঝাব সেই এলোমেলো ব্যাথা,
ভাবিয়া হারায়ে দিশে এও করি তাই।

আসল কথা অক্ষয়কুমারের রচনায় বিহারীলালের পরিনত কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস অনুভূত হয়।

অক্ষয়কুমারের কাব্যসৃষ্টি প্রচুর নয়। কাব্যগ্রন্থগুলি হল - প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল শঙ্খ, 'এষা' কবিপত্নীর 'ইন মেমোরিয়াম' বা শোকগাথা।

অক্ষয়কুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে হৃদয়বেগের প্রাবাল্য কবিকে বাইরে চঞ্চল করে নি কিন্তু অন্তরে আবিষ্ঠ ও তন্দ্রাতুর করেছষে এবং তার কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে নারীপ্রেমের শান্ত সুনিগ্ধতা। এই প্রেম প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু, তাই তার রচনায় বিরহের অবকাশ আছে, মাথুরের উপলক্ষ্য নেই। নারীপ্রেম অক্ষয়কুধমারের কবিতার একমাত্র বিষয়। কবির প্রেয়সী তার পত্নী ; কিন্তু শুধু পত্নী নন, তিনি নারী কবির চিত্ত মথিত করে মর্ম বিদলিত করে যিনি 'তৃপ্তির নরকে' কবিচিত্তকে 'অতৃপ্তির খেদে' জ্বালাইয়াছেন তথাপি যাঁর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মিলনে পরিপূর্ণ চরিতার্থ অপেক্ষা করছে। শিব-শিবানীর রূপকের মধ্যেও কবি এই সত্যই দেখেছেন -

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্ববাসীমহোচ্ছাস
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেনেকালানল
শ্মশানে মশ্মানে টান, গরলে অমৃতজ্ঞান
বিষকণ্ঠ, শূলপানি, প্রলয়-পাগল।

কবিচিত্তে যে বাসনা-ভাবনার,প্যাশন-ইমোশাননের মন্থন চলছে তা থেকে নিস্তারের উপায় শুধু দেহের বাহুল্য বর্জনে প্রেমের উৎস উন্মোচনে, আর আত্মবিলোপে।

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকেপাকে ভেঙ্গে যাক্ এ মোর শরীর।
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া!

ভাবাবেগের আবর্ত থিতিয়ে এলে অকৃতর্থতার বেদনা জুড়িয়ে গেলে প্রশান্তির প্রলেপ পড়লে নারীর মহিমা নতুন রসরূপে দেখা দেল।

"আমার পরান ভাসিয়া যায়, পড়ে বা উছলি
যেন এক মহাকাব্য হয়ে ওতপ্রোত
হৃদয়ে দিয়ে এস, সখি তবে,
রূপ বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে।"

তারপর জেগেছে জীবনের শেষ প্রশ্ন -

কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি - সে তুমি দূরে?
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেশ।
সুখ দুখ হলো শেষ - হলো শেষ কারে ঘুরে।

ব্রাউনিঙের মতো অক্ষয়কুমারও এই প্রশ্নের সমাধান পেলেন ঈশ্বর বিশ্বাসে, সৃষ্টির

চরম কল্যানময়ত্বে -

জীবনকে আশ্বাস দিয়ে - মরনে বিশ্বাস দিয়ে
যেমন গড়িয়েছিলে পুন গড়ে লও।

অক্ষয়কুমারের ভাষা সংযত ও পরিমিত। বাকসংযম, শব্দচয়ন এবং পদ-লালিত্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যের মিলন তাঁর গোছালো রচনারীতির বৈশিষ্ট্য।

কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করনে ছাব্বিশটি কবিতা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করনে অর্থেকের বেশি কবিতা নতিন। উৎসর্গ কবিতার উদিষ্ট কবিগুরু বিহারীলাল চক্রর্তী। কাব্যের প্রথম অংশ 'কিশোর কথা'য় কবিচিত্তের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও তার অবসানের কথা। 'বাস্তব স্বপনেদ্বন্দ্ব' প্রেমের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধানে ইঙ্গিত কবে পেয়েছেন।

বুঝি না বাঁশরী দূরে
সহস্র আস্থায়ী ঘুরে
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে।

দ্বিতীয় অংশ 'বৃন্দাবন গাথা'য় রাধাকৃষ্ণ প্রেমগীতিকে যৎসামান্য উপলক্ষ্য করে কবি নিজের হৃদয়বেদনা ঢেলে দিয়েছেন। শেষ কবিতা 'অবশিষ্ট' কবিরই আত্মকথা। তৃতীয় অংশে 'বনলতা' একি ছোটগাথা কাব্য। এর শেষ কবিতায় হগোব (Huge) 'টয়ালার্স অব দিসী' কাহিনী ছায়া আছে। 'ভুল' - এ কিন্তু কবিতা কনিকা আছে, তার মধ্যে কয়েকটি হুগোর অনুবাদ বা অনুসরন। 'শঙ্খ' সংকলিত 'বঙ্গভূমি' কবির শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম।

এষা

অক্ষয়কুমারেপত্নীবিয়োগে এষা কাব্যর উৎপত্তি। এটি একটি শোককাব্য। এটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।ল পত্নীর মৃত্যুর পর কবি প্রন্ড বেদনাও শেকের থেকে সান্ত্বনার খোঁজে এই কাব্য রচনা করেন। গৃহস্থলীর অনুপস্থিতিতর ফলে সংসারে অসহনীয় শূন্যতা হাহাকার তার অন্তহীন অনুভবে যেন মূর্ত হয়েছে -

"পিতা নাই, মাতা নাই, পতিপুত্র নাই
অতি অসহায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে
অনলে অনিলে শুনে কোথায়-কোথায়?

এই কাব্যে কবি আত্মকথার অবতারনা করেছেন। মৃত্যু উর্ত্তীন প্রেমের অনুর্বান শাশ্বতসত্তা তাঁকে শেকের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে এর ভাবসত্য ব্যক্তিহৃদয়ের শোকবন্ধনে ছাড়িয়ে এক বৃহৎ চেতনার মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়েছে।

শোকসূচক কবিতা বা শোককাব্য রচনার ধারাটি বাংলা সাহিত্য খিছু ্বতনদ্দত। গ্রীক শব্দ Elegeia কথাটির অর্থ হল বেদনার আর্তি। এমন কি সেখানে এলিজিয়াক নামে এক বিশেষ মাত্রার (প্রথম ৬ পরে৫ মাত্র) কবিতাই ছিল। সিসনেরমাস, অ্যানিক্রিয়ন প্রমুখ খ্যাতিমান শোক কবিরা ছিলেন। ল্যাটিন কবিদের মধ্যে তিবিউলাস, ওভিদ, তাসসো এবং ইংরেজী সাহিত্যে শেলীর 'এভোনেইস'। মিলটনের 'লিসিডাস', সেপনসার কৃত 'অ্যাস্ট্রেফেল' ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল এষা কাব্যগ্রন্থে পত্নী বিয়োগের ব্যক্তিক উপলব্ধিকে রূপান্তরিত করেছেন কাব্যে। "ছিন্ন কণ্ঠ পিক আমি, মরন আতুর" - আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর মানবী প্রয়াকে বিশ্বরমারূপে বন্দনা করেছেন -

আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা
ভাসিছে ইন্দিরাসম সৃষ্টি নীলিমায় (সান্তনা)

উপহার আর নিবেদন ছাড়া 'এষা' কাব্যের চারটি অংশ - মৃত্যু, অশৌচ, শোক এবং সান্ত্বনা। এষার মর্মবানী হল ব্যক্তিগত কামনা -মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা। মানবত্মার পরিরনির পথে শোকদহন অপরিহার্য।

এ মোহ কলঙ্ক শিখা - তোমারি কি হোম শিখা
দহিয়া নচীতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

এই কা্যে কবির গৃহস্থলীর খুঁটিনাটির বর্ণনা এবং দাম্পত্য রসশ্রায়ী প্রেমস্বপ্নের প্রকাশ ঘটেছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে, "অক্ষয়কুমার তাত্ত্বিক কবি নহেন, গৃহজীবনের বিশেষ রসের কবি।" (কবি অক্ষয়কুমার বড়াল: বাংলার কবি, পৃ - ৬২)

শোকে থেকে সান্ত্বনালাভের আশায় কবি কখনো তত্ত্বকথাও উচ্চারন করেছেন। সে তত্ত্ব হয়ত খুব উচ্চাঙ্গের নয়, তবে মোহিতলাল মজুমদারের মতে এই আত্মজিজ্ঞাসায়

"আধুনিক মানুষের মনোজীবনের একটা দুরারোগ্য ব্যাধির" শরিক হয়ে উঠেছেন অক্ষয়কুমার। (আধুনিক সাহিত্য মোহিতলাল মজুমদার)। যেমন কবির ভাষায়-

একি রোগ, কোথা মূল? একি জন্মান্তর ভুল
এ পাপের নাহি প্রশমন?

অক্ষয়কুমার কিছু গান লিখেছিলেন । তাঁহার একটি গানে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন। সে গানটি হল-

বুঝতে নারি নারী কি চায় গো
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা
চাইতে চাইতে মুদে পাতা
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললে
আসতে কাছে ফিরে যায়।

অনঙ্গমোহিনী দেবী

উনবিংশ - বিংশ শতাব্দীর সন্ধি দশক দুটিতে কয়েকজন কবিতা লেখক সাথারন পাঠকদের কাছে অনাবিস্তর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শক্তিশালী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশির ভাগই নকরকারী ও মক্‌শনবীশ। এ সময়ের পদ্যলেখায় মহিলা কবিদের যে অবাধগতি হয়েচিলল তা শবশ্যই স্বিকার করতে হয়। এদের মধ্যে প্রমীলা বসু উল্লেখযোগ্য। তাঁর তটিনী (১৮৯২) ও প্রমীলা (১৮৯৭) নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর জন্ম ১৮৭১ এবং মৃত্যু ১৮৯৬। অল্পবয়সে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তাতে সাহিত্যের অবশ্যই ক্ষতি হয়েছিল ল মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪৩) কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলী (১৮৯৬) বীরকুমার বধ (১৩১০) প্রভৃতি কবিতার ই ও কাব্য লিখে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন । আর একজন উল্লেখযোগ্য কবিতা রচয়িত্রী ছিলেন অনঙ্গমোহিনী দেবী। তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ (১) শোকগাথা (১৩১০) (২) প্রীতি (১৩১৭)।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গ্রন্থপুঞ্জী

১) আধুনিক বাংলা কাব্য - তারাপদ মুখোপাধ্যায়

২) সাহিত্য বাতায়ন - ড. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়

৩) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খন্ড) - সকুমার সেন

৫) ঈশ্রগুপ্ত : সাংবাদিক কবি ও গদ্যশিল্পী - ড. বেনুপদ ঘোষ

৬) সাহিত্যের ভবিষ্যৎ - বিষ্ণুদে

৭) বাংলার জাগরন - কাজী আবদুল ওদুদ

৮) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় - দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত

প্রশ্নাবলী

১) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় সমকালীন সমাজ কতখানি চিত্রিত?

২) কৌতুকরসের কবি ঈশ্বগুপ্তের পরিচয় দাও।

৩) বাংলা ও বাঙালির কবি ঈশ্বগুপ্ত - মন্তব্যটি প্রসঙ্গে সঙ্গত?

৪) বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলা কতদূর যুকতিযুক্ত বুঝিয়ে দাও।

৫) গীতিকবি হিসাবে বিহারীলালের প্রতিভার পরিচব দাও।

৬) বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় অক্ষয়কুমার বড়ালের অবস্থান নির্ণয় কর।

৭) শোক গাথার রচয়িতা হিসাবে অক্ষয়কুমার বড়ালের মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় একক হুতোম প্যাঁচার নক্সা

টিপ্পনী

কলীপ্রসন্ন সিংহ

সাহিত্যের ভাষা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন দুইজন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদ্যে, প্যারীচাঁদ মিত্র।প্যারীচাঁদ কথ্যভাষাকে আশ্রয় করলেন কিন্তু সাধুভাঢ়ার ঠাট পরিত্যাগ করলেন না। ককথ্যভাষাকে পুরোপুরি আশহরয় করে লেখা হল কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬২)। কথ্যভাষা বললে সবটুকু বলা হয় না, কলকাতার পুরনো বাসিন্দাদের উপভাষাকে তুলে আনলেন এই লেখায়। রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল দুটি, কলকাতার উৎসব সমাজ সংসারের সরস ও বাস্তব বর্ণনা উপলক্ষ্যে কোন কোন ব্যাক্তি ও পরিবারের প্রতি কটাক্ষ এবং প্রচলিত রচনারীতির ব্যঙ্গ করে বৈঠকী রসসৃষ্টি। "হুতোম-প্যাঁচার নক্সার" ভাষা বিশুদ্ধভাবে 'কলকেতাই' কথ্যভাষাশ্রিত সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কথ্যভাষায় স্ল্যাঙ অর্থাৎ অভব্য শব্দ ও প্রয়োগ এড়িয়ে চলা বড় কঠিন এবং সে বিষয়ে অনেক সময়ই লেখক অপারক হয়েছেন। ভাষার জন্য হুতোম প্যাঁচার নক্সার মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে মূল্য সাহিত্যিক ততটা নয় যতটা ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিকের কাছেই নক্সার বিবরণগুলি অতিশয় আদরনীয়। এই বইখানি আর কিছু উপকার না করুক সেকালের কলকাতা সমাজের কয়েকখানি ফটোগ্রাফ তুলেছিল এবং বাংলা প্রহসন রচনাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল।

মাত্র তিরি বছর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিধির মধ্যে বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের জন্য যিনি রেখে গেছেন এক অতুলন সারস্বাতার্ঘ্য, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যপুষ্ট, রেনেসাঁসের অন্যতম দীপ্তিমান নক্ষত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ। রামমোহন - বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্ভাসিত কালীপ্রসন্নের জীবন বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির সুষম সমন্বয়। অমৃতসমান মহাভারতের অনুবাদ, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা, মহাকবি মধুসূদনকে প্রথম গনসম্বার্ধনা জ্ঞাপন সামাজিক ভন্ডামীর বিরুদ্ধে বলিষ্ট পদক্ষেপ প্রভৃতি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের কয়েকটি আলোকজ্জল কীর্তিস্তম্ভ। কিন্তু কেবল ঐতিহ্যচর্চা এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধারূপেই তিনি বন্দিত হন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচীপত্রে এক অসামান্য ব্যাক্তিরূপেও নন্দিত।

টিপ্পনী

কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ও কর্মজীবন

কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এক ধনী জমিদার পরিবারে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন জন্ম হয়। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিওহের পৌত্র এবং নন্দলাল সংহের একমাত্র পুত্র। শৈশবে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষলাভ করেন। তবে কৃতী ছাত্র বলে স্বীকৃত হন নি। বাড়িতে তিনি উইলিয়াম কার্কপ্যাটরিক নামে একজন সাহেবের কাছে ইংরেজী শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা (১৪ জুন ১৮৫৩খ্রীঃ) করেন। এই সভা আংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদি নানাবিধ প্রগতিমূলক কাজে এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করে। এই সভার সম্পাদকরূপে প্রথমে কালীপ্রসন্ন, পরে উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্নের নাম পাওয়া যায়। এচাড়া কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সমকালের বহু স্বনামধন্য ব্যাক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। এই সভার মাধ্যমেই সি. জি. মন্টেগু (ডেভিড হেয়ার একাডেমির প্রধান শিক্ষক) কার্কপ্যাটরিক প্রমুখ সাহেবদের বক্তৃতা, মধুসূদন এবং পাদরি লভ্‌কে সম্বার্ধনাদান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ কাজের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ, মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি বিবিধ জনহিতকর কাজ করা হয়েচিল। এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা (১৮৪৬) কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল। এখানে বেনীসংহার, বিক্রোমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক অভিনয় হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং কোন কোন নাটকে অভিনয় করেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' মাসিক পত্রিকা (২০ শে এপ্রিল ১৮৫৫) তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সর্বতত্ত্বপ্রবেশিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, পরিদর্শক ইত্যাদি পতইকা সম্পাদনায় কালীপ্রসন্নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ কালীপ্রসন্ন "অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রট ও জাষ্টিস অব দি পীস নিযুক্ত হয়েছিলেন (বিচারকের পদে কালীপ্রসন্ন, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১মখন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৬ষ্ঠ মুদ্রন, বৈশাখ ৩৮৩, পৃ ৬৭-৭২)। সংস্কৃতিবান, দাতা, স্পষ্টবাদী, স্বজাতিপ্রমিক কালীপ্রসন্ন নানা সামজিক কীর্তির পরিচয় দিয়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

রচনাসমূহ

বাবু নাটক (১৮৫৪), বিক্রমোর্ব্বশী নাটক (১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান নাটক (১৮৫৮), মালতিমাধব নাটক (১৮৫৯), হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের স্মরনার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপনের জন্য বঙ্গবাসীবর্গের প্রতি নিবেদন (১৮৬১), হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬১ - ৬২), পুরান সংগ্রহ (১৮৬০ - ৬৬) আ বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের অনুবাদ, বঙ্গেশবিজয় (অমাপ্ত ১৮৬৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদ (১৯০২, মৃত্যুর পর প্রকাশিত)

টিপ্পনী

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অদ্বিতীয় সমাজ চিত্রশালা। চড়ক পার্বনে রঙ্গ, বারোয়ারী নেপথ্যে সামাজিক ব্যাভিচার, ছেলেধরা, মিউটিনী, বিচিত্রা হুজুগের ব্যঙ্গ, 'হঠাৎ অবতার বাবু' পদ্মলোচনের শ্লেষতিক্ত উপাখ্যান, মহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা, রাসলীলার উৎসব, নবপ্রবর্তিত রেলওয়ের বাস্তববিবরনী - সবকিছুর বিশস্ত চিত্র নিপুন রসস্রষ্টার তুলিতে রূপাঙ্কিত। সদ্যোবিগত ভারতচন্দ্রীয় যুগের যাযাবরী উদ্দামতা, সংস্কারবান্ধ যুগের মূঢ়তা ও কুপ্রথার ফোটোগ্রফিক ছবি কালীপ্রসন্ন তাঁর ক্ষুরধার দৃষ্টির এক্সরে লেন্সে ধরে ফেলেছেন। তাঁর দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তিটিও বলিষ্ট মানসিকতার বানীবাহী - "এই নক্সার একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার হয় নাই।" কোথাও বাস্তব নামধাম বজায় রেখে, কোথাও সামান্য আবরন টেনে তিনি অনেক তথাকথিত 'বিখ্যাত' ব্যাক্তির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুতোম' কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন - "বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলে, বদমায়েশের তাক লেগে গ্যালো, ছেলেরা চমকে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম।" কিন্তু শুধু অম্লাক্ত তির্যকতা নয়, অকৃত্রিম দেশপ্রেম আর সত্যের শক্তিই ছিল কালীপ্রসন্নের অমোঘ যুদ্ধাস্ত্র।

'হুতোম প্যাঁচার নক্স'য় সর্বস্তরে মানুষ উপস্থিত, কিন্তু লেখকের ব্যাঙ্গের অস্ত্রে আহত হয়েছে প্রধানত "আজব শহর কলকেতার" "হঠাৎবাবুর" গোষ্ঠী - সামাজিক গ্লানি কাজে যাদের অপভুমিকা ছিল মুখ্য। লালাসা-লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার উল্লোল পঙ্কে এরা ছিল আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বীরকৃষ্ণ দাঁ আর পদ্মলোচন দত্তজার দল তার সার্থক প্রতিনিধি। তাঁর শানিত বিদ্রুপ বান চলতি ভাষায় নিখুঁতভাবেই বিশ্লেষিত - "হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যেরকম গরম হয়, একদম গাঁজাতেও তা হয় না। ..... কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন - তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে। - তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে উঠে।" সমাজ শত্রুরা এখানে মসী-অসীর আঘাতে রক্তাক্ত। ব্যঙ্গ সমালোচক রোনাল্ড নগ্র বলেছেন - "..... the laughter which satire provokes has malice in it always" এই যে 'Malice' বা বিদ্বেষ তা ক্ষতিকর নয় উপভোগ্য এবং কল্যানকর। নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে শত্রুপুরীতে তীর

নিক্ষেপ করা হয় তবে তীরটি যাতে বাইরের দৃষ্টিতে উপভোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন ব্যঙ্গশিল্পী।

টিপ্পনী

আক্রমনের অম্লাক্ত তির্যকতাই নয়, দেশ ও মানুষের প্রতি বেনার অশ্রুরেখাই নক্সাটির ধ্রুবপদ। তাঁর সবেদনার স্মারক চিহ্ন - 'রেলওয়ে'। তৃতীয় শ্রেনীর দরিদ্র যাত্রীদের করুন কৌতুকের আবরন উদ্‌ঘাইত - বুকিং ক্লার্ক "কারো টাকে নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্ছে, বাকি চারমাত্র 'চোপরাও' ও নিকালো'। কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্ছে, কেউ টিকিটের দাম নিয়ে দশ মিনিট চিৎকার কচ্ছে, কিন্তু সেদিক ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই।" তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রীরা কিভাবে পদে পদে বঞ্চিত হয়, জমাদার ও চাপরাশীদের বেত কি নির্মমভাবে বর্ষিত হয় এং কিভাবে তারা গাড়িতে স্থান লাভ করে, রেলকর্মচারীদের অত্যাচার অবিচারের চেহারা কালীপ্রসন্নের বিরল সৃষ্টির বর্ণন নৈপুন্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'মিউটিনী' প্রসঙ্গে বাঙালীর ভিরুতার উপর 'হুতোম' এনেছেন লেখনীর কষাঘাত । নীলকরদের রক্তলাঞ্ছিত পাপের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তর্জালা যেন রক্তনিঃশ্বাসে উচ্চারিত । সমাজ-সচেতন সাহিত্য হিসাবে নক্ষাটির মৌলিকতা তাই সর্বজনস্বীকৃত। উপন্যাস না হলেও চরিত্রসৃষ্টি ও বীক্ষন নৈপুন্যে অনেক জায়গায় উপন্যাসে উদ্ভাস দেখা যায়। সমসাময়িক পুলিশী ব্যবস্থার একটি বাস্তব আলেখ্য তাঁর নিপুন তুলিতে ধরা পড়েছে - "পুলিশের সার্জন দারোগা জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমরা ..... মস্‌মস্‌ করে থানায় ফিরে যাছেন, সকলেরি সিকি, আধুলী, পয়সা ও টাকায় ট্যাক পরিপূর্ন।" রুচির শুচিতা রক্ষায় লেখক ছিলেন যথাসাধ্য সংযমশাস্তিত। স্নাযাত্রার সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বইখানি হয়ে উঠেছে প্রসন্ন কৌতুকে দীপ্ত।

কালীপ্রসন্নের একহাতে শখ আর হাতে পিচকারী। একদিকে মহাভারত অনুবাদ অন্যদিকে হুতোম প্যাঁচার নক্সা রচনা। একদিকে মহিমান্বিত অতীতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, অন্যদিকে ইকৃত বর্তমানের প্রতি ব্যাঙ্গের রঙ নিক্ষেপ। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় লেখক নিজে বলেছেন "জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌সা প্রবস করেছে, সেই কলমই ভারতবর্ষের নীতি-প্রধান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রধান উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক, মুমুখ, সংসার বিরাগী ও বাজার অনন্য অবলম্বন স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।"

হুতোম প্যাঁচার নক্সার বিশিষ্ঠতা

হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাংলা সাহিত্যের একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের

সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকই কিন্তু এই বইকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং 'আলালের ঘরের দলাল' এর সঙ্গে তুলনা করে একে নিকৃষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরকম সমালোচনা যর্থার্থ বলে স্বীকার করা যায় না ল প্রকৃতপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র যর্থাথ মূল্যায়ন আজও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হয় নি। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, কথ্যভাষার বিশুদ্ধ আদর্শ, সমাজ বাস্তবতা চিত্রন-নৈপুন্য, অপক্ষপাতী দৃষ্টিঙ্গি ও হাস্যরসসৃষ্টি সব দিক দিয়েই 'হুতোম প্যাঁচার নক্স' আলালের ঘরের দুলাল' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ। অবশ্য একথা সত্য দুটি এক শ্রেনীর গ্রন্থ নয়, কিন্তু তৎকালীন সমাজচিত্র অঙ্কন ও কথ্যভাষায় সাহিত্য মর্যাদা দেওয়া উভয় গ্রন্থেরই লক্ষ্য। সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, কালীপ্রসন্ন সমাজের যথাযথ রূপ যেমন নির্বিকার সূক্ষম-সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন প্যারীচাঁদ তাঁর রুচিবাগীশ ও নীতিভারাক্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে সেরকম দেখাতে পারেন নি। ভাষার দিক দিয়েও প্যারীচাঁদের ভাষাকে মিশ্র ও গুরুচন্ডালী লতে হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষা একশ বছরের পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কথ্যভাষা বলে দাবী করা সম্ভব।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় লেখক নিজের রচনার পরিচয় দিয়েছেন-

হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে
চিত্রিনু চরিত-দেবী সরস্বতীর বরে।

স্বভাবের পটে তিনি যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছেন সেগুলি বাস্তবরসে ও চিত্রন-নৈপুন্যে অবিস্মরনীয় উজ্জলতা লাভ করেছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' খুললেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার রূপটি আমাদের চৌকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত ও সমন্বয়ে তখন এই শহরে যে মিশ্রিত জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তাতে বাবু ও ইয়ংবেঙ্গলী সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থিত ছিল, পদবী ও ব্রাহ্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ও গোস্বামী এসে জুটেছিল, যাত্রা, কবি ও হাফ আখড়াইয়ের রস পরিবেশিত হত, গাঁজা, আফিং ও সিদ্ধির সঙ্গে শেরি৮-শ্যাম্পেন, ব্যান্ড্রি ও হুইস্কির নেশা মীশেছিল, চড়ক, রথ ও দুর্গোৎসবের সঙ্গে বড়দিনের উৎসব মিলে গীয়েছিল। এই বিচিত্র সমাজরূপ ও জীবনগতি হুতোমের লেখনীতে রূপায়িত হয়েছিল। কোন কোন স্থানে কাহিনী অবলম্বন করে আবার কোথাও বা হঠাৎ - দেখা কোন চঞ্চল জীবনরূপের খন্ডিত অংশের সন্ধানী হয়ে লেখক কলকাতার রাস্তায় ও বাড়িতে, গলিতে গলিতে। ময়দানে ও গঙ্গাবক্ষে, প্রকাশ্য সভায় ও গোপন আসরে, আলোচিত উৎসব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শুঁড়িখানায় নির্বিকার চিত্তে যাতাযাত করেছেন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

। চোখের পটে তিনি যে আলোকিচিত্র তুলে নিয়েছিলেন, লেখনীতে নক্সার পটে তাই চলচিত্ররূপে প্রতিফলিত করেছেন। এই ছবি দেখবার সময় আমরা যমন হর্ত ও কৌতুক উৎফুল্ল হই, তেমনি লজ্জা ও ধিক্কারবোধে সঙ্কুচিত হই। কিন্তু লেখকের উক্তি স্মরণ রাখতে হবে, তিনি যে চরিত্র চিত্রিত করেছেন তা 'রহস্যরসের সঙ্গে' তত্ত্বকথা শুনবার, নীতিশিখা দেবার ও সমাজ শোধন করার কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর নক্সায় ব্যক্ত হয়নি। সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তা প্রচ্ছন্ন ও পরিচ্ছন্ন, তা কোথাও দানা বেধে চোখ পাকিয়ে নিজেকে জাহির করতে চায় নি। তিনি জীবনকে গভীরভাবে দেকেছেন বটে। কিন্তু জীবনকে দেখিয়েছেন হাল্কাভাবে। সেজন্য তাঁর বলবার কথাটি রঙ্গব্যঙ্গ উজ্বল হয়ে উঠেছে এবং তার বলবার রীতিটি হাস্যকৌতুকে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। হুতোম প্যাঁচার চক্ষু যেমন তীক্ষ্ণ, চক্ষু তেমনি শানিত। সেই শানিত চক্ষুর আঘাত থেকে কেউ পরিত্রান পায় নি। পমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও পদবী, কচি বুড়া ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী, বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশন মাষ্টার কেউই এই আঘাত থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু প্রকৃত হাস্যরসিক তাঁর হাসির আঘাত দিয়ে শুধু কেবল পরতেই বিব্রত করেন না, নিজেকেও বিবৃত করেন। হুতোমও নিজেকে বাদ দেন নি। তার কথাতেই এর সাক্ষ্য - "সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিকে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতেপারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে, আমি কারোও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরি লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ং ও নক্সার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।" লেখক যে সমাজের ছবি এঁকেছেন তা ছিল কলুষিত, দুর্নিতিবিলাসী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত। সেই সমাজের আঙ্কিত রূপ দেখাতে গিয়ে তাঁকেও সেই সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য হতে হয়েছিল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তিনি নির্মল স্থান থেকে সমাজের দিকে তাকান নি, সমাজের পাঁকে নেমে সেই ছবিকে সামনে এসে দিয়েছেন। যদি তিনি সমাজের পাঁকটুকু মুছে ফেলে তার পরিষ্কার রূপ দেখাতেন, তা হলে তদনীন্তন অনেক সমালোচক হয়ত সন্তুষ্ট হতেন কিন্তু তা হলে সমাজের একটা কৃত্রিম ও অপ্রকৃত রূপ আমরা পেতাম।

হুতোম প্যাঁচার প্রকৃত পরিচয় : সংকট ও সিদ্ধান্ত

হুতোম প্যাঁচার লেখক কে? তিনি কি একজন না একাধিক? এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে একটি বির্তক সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ৪র্থ সংস্করনে (কলিকাতা, ১৩৬৯ সন) সুকুমার সেন এই বির্তকের সূচনা করেন। পরে জীবনান্দ চট্টোপাধভাব (হুতোম প্যাঁচা কে এবং কেন, জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দেশ ২৯.৩.১৯৬৯

খ্রীঃ) এ বিষয়টি সমর্থন করেন। এঁদের মূল বকতব্য 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র রচয়িতা কালীপ্রসন্নের লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পরিষদ নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়। এঁনারা তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি হাজির করেছেন। সেই যুক্তিগুলি অন্যান্যদের দ্বারা খন্ডিত হয়েছে। ড. পরেশচন্দ্র দাসের 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ' (কলিকাতা ১৯৮৫) এবং সত্যব্রত দে প্রণীত 'হুতোম প্যাঁচা - একটি বিতর্ক'(বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫) নামক রচনার এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির বক্তব্য থেকে। মহেন্দ্রনাথের সার কথাটি ছিল, যখন নকস্আর দ্বিতীয় ভাগের পান্ডুলিপি লেখা হচ্ছে, তখন ভুবনচন্দ্র ছিলেন তার লিপিকর এবং সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র নকসার কিছু কিছু অংশ নিজে লিখতেন, যা কালীপ্রসন্ন সাদরে গ্রহন করতেন। যেমন, 'বিদায় হও মা ভগবতী' গানটি কালীপ্রসন্নের ফরমাশে ভুবনচন্দ্র সরকারেই রচনা। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জানিয়েছেন "সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র, "কিছু কিছু" হুতোম লেখিয়া দিতেন। স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য্যগুনে "সিংহ" সেগুলিকে সমাদর-সহকারে গ্রহণ করিত, কুন্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। .... "দূর্গা-বিজয়" বিষয়ে সংগীত সংরচিত করিতে করিতে উপদদেশ দিয়া "সিংহ" বাবু, একদা বিচারালয়ে গমন করিলেন। ওদিকে ভুবনচন্দ্রও আদিষ্ট গান রচনা করিলেন। আদালত হইতে প্রত্যাগত হইবামাআত্র গানটি তাঁহার দর্শন-পথে পতিত হইল 'সুর'ও কতক 'ভাব' বা 'পদ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া, গীতিটি পুষ্পকের অন্তনির্বেশিত করিয়া লওয়া হইল। এই কার্য্যেও "সিংহের" কি আশ্চর্য ঔদার্য্য অভিব্যক্ত ! পাঠকগন! প্রস্তাবিত সঙ্গীত সন্দর্শন করুন:

বিদায় হও মা ভগবতী ! এসহার এস নাকো আর,
দিনে দিনে 'কলিকাতার' মর্ম্ম দেখ চমৎকার।।
জষ্টিসেরা ধর্ম অবতার,, কায়মনে করছেন সুবিচার-
কিন্তু ধুলোর চোটে, রাজপথেতে চেঁচিকয়ে চেয়ে চলাভার,
হেলথ্ অফিসার ইনকমের এসেসার্-
পাইখানায় 'মেজিস্টর' সারলে সবারে-
আবার গবর্নরের গুয়ে দৃষ্টি-ছিষ্টি ছাড়া ব্যবহার।
জীয়ন্ততে তো এই দশা মা ! ম'লেও শান্তি পা'বে না-
মুখে অগ্নির দফা রফা 'কলেতে' ক'রবে সৎকার।।'

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির এই বক্তব্য খুব সম্ভব এই সংশয় সৃষ্টির মূলে। তবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মহেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত গান ও নকশায় প্রকাশিত গানের পাঠের তফাৎ কেন, মহেন্দ্রনাথের লেখায় তার কোন্‌ও ব্যাখ্যা নেই। তাঁর মূল পাঠ ভূবনচন্দ্রের মূল লেখা কিনা তাও জানার কোনও উপায় নেই। গানটির বিষয় তৎকালীন প্রচলিত ও প্রস্তাবিত কয়েকটি সরকারি আদেশ ও পৌর-নিয়মনিধি। চলাচলের পথে মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ, জলপ্রানীর জল অপব্যবহার বন্ধ, লাইসেন্স ট্যাক্স জনপ্রতি ধার্য ইত্যাদি।

লক্ষনীয় মহেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দ্বিতীয়ভাগের কথাই বলোএছেন। নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় লেখক ছিলেন কিনা তার প্রমান আজও অপ্রকাশিত, জানা যায় বেহালের বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নবীনকৃষ্ণের পুত্রকে একটি চিঠিতে এই তথ্য বিবৃত করেন। পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, তিনি বলেছেন "নবীননকৃষ্ণ বাবু ঐ সময়ের একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গল্পের ভান্ডার অফুরন্ত ছিল। ... তাঁহার সহিত সিংহমহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার আকর্ষনে নবীন বাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহন করেন এবং যতদিন সিংহমহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। নবীন বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে 'হুতোম পেঁচার সমস্তই সিংহমহাশয়ের নিজের লেখা, দুই চারি স্থানে সামান্য অংশ নবীনবাবু লেখনীপ্রসূত। কালীপ্রসন্ন বাবু স্বাস্থ্য হারাইয়া যখন গঙ্গাতীরে (বোধহয় বরানগরের নিকটে) অবস্থান করিতেন, তখনও নবীনকৃষ্ণবাবু তাহার সঙ্গী। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া নবীনবাবু সিংহমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন' (কালীপ্রসন্ন সিংহ' চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায়, তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, জৈষ্ঠ ১৮৪২ শক)।

আর একটি কথা বলা দরকার। যাঁরা কালীপ্রসন্নকে হুতোম বলে মনে করে, তারা সকলেই নক্‌শায় উত্তমপুরুষে বর্ণিত স্বকথনগুলিকে তাঁর আত্মজৈবনিক ধরে নিয়েছেন। তার কারণ নকশার প্রথম ভূমিকাতেই হুতোম বলেছেন, স্বয়ং ও নকশার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই। দ্বিতীয় ভূমিকায় বলেছেন, স্বয়ং সংসেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। 'হঠাৎ অবতার' নকশার শেষে মন্তব্য করেছেন পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি।

এই স্বকথনগুলি সবই আছে 'হুজুক' পর্বে, 'হুজুক' শুরু হচ্ছে 'ছেলে ধরা' থেকে,. হুতোম বলেছেন, আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলেম, পরের নকশা 'প্রতাপ চাঁদ' প্রতাপচাঁদ বর্ধমানে ফিরে আসেন ১৮৩৫ খ্রীঃ আদালতে নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রীঃ বরানগরে বাস ১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ। ভূকৈলাসে 'মহাপুরুষ'-এ আগমন ১৮৩২ খ্রীঃ। 'কৃশ্চানি হুজুক' এর দলিপ সিং এর খ্রিষ্টান হওয়া ১৮৫৩ খ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহন

১৮৫১ খ্রী. । 'মিউটিনি' ও 'মরাফেরা'-র ঘটনাকাল ১৮৫৭ খ্রী । লক্ষ্ণৌয়ের বাজ্‌শা-র মুচিখোলায় আগমন ১৮৫৭ ক্রীঃ। 'শিবকৃষ্ট বন্দোপাধ্যায়' -এর মামলা ১৮৫৯ খ্রীঃ 'জসটিস ওয়েলস্' -এর ইরুদ্ধে জনসভা ১৮৬১ খ্রীঃ নীলবিদ্রোহ ও লং -এর বিচার ১৮৫৯-৬১ খ্রীঃ। 'রসরাজ' সম্পাদকের শাস্তি ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত সাড়া জাগানো কয়েকটি ঘটনার কথা হুতোম বলেছেন। কালীপ্রসন্নের জন্মসাল ১৮৪০ খ্রীঃ অথচ ১৮৩২ খ্রীঃ মহাপুরুষের আগমনের সময় আত্মকথন অনুযায়ী তিনি স্কুলে পড়েন। সেইরকম, প্রতাপচাঁদ নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রী, হুতোমের তখন হাতে ঘড়ি হয়ে গেছে ও গুরুমহাশয়ের কাছে পড়েন। নিজেকে অধিকতর বয়স্ক প্রমানের এই চেষ্টা কি নেহাতই আত্মগোপনের ছল অথবা অসতর্কতা অথবা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু, জানা নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন যে নকশ্‌আর লেখক নন, তা বিশদ্বাস করার মতো কোন কার নেই, নকশা জাতীয় বৈঠকি রচনায় অন্তরঙ্গ দু-একজনের সামান্য সংযোজন থাকতেই পারে, সেজন্য মূল লেখকের কৃতিত্ব নসাৎ করা যায় না। কাজেই কালীপ্রসন্ন সিংহই যে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

টিপ্পনী

হুতোম প্যাঁচার নক্সার হাস্যরস

হুতোমের হাসি ব্যঙ্গরসাশ্রিত একথা সত্য, কিন্তু এই ব্যঙ্গরসে ব্যাঙ্গের চেয়ে রস বেশি, এতে হালর খোঁচায় যত জ্বালা, মধুর প্রলেপে তার চেয়ে আরাম লাগে অনেক বেশি। উতোমের আসল উদ্দেশ্য একটু মজা করা, সকলে মিলে একটু আমোদ করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই কাউকে একটু চিমটি কেটে কাউকে একটু খোঁচা দিয়ে এবং কাউকে একটু চড়চাপড় মেরে চলেছেন। হুতোমের প্রধান লক্ষ্য অবশ্য চরিত্রচিত্রন কিন্তু মাঝেমাঝে নানা গল্প অবতারনা করে, কখনও বা নিজস্ব টীকা-টিপ্পনী জুড়ে দিয়ে লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। লঘু ও কথ্য ভাষা ব্যবহারের জন্য এবং এই সব গল্প ও টীকাটিপ্পনীর ফলে 'হুতোমী নক্সায়' এমন একটি মজলিসী ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটি পরিহাসোজ্জ্বল অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। লেখকের ভাষাশক্তি ও বর্ণন-ক্ষমতা অসাধারন। মাঝে মাঝে এমন রসাত্মক শব্দ এবং ইংরেজি ও বাংলামিশ্রিত কৌতুকের বাক্য বিন্যাস করেছেন, ঘটনা ও দৃশ্যবর্ণনার স্থানে স্থানে তির্যক গতি ও আকস্মিক মোচড় এনেছিলেন যে তা বিশেষভাবে হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও সামান্য কিছু বোঝানোর জন্য পর পর এমন দূর-ব্যবহিত উপমানের প্রয়োগ করেছেন যে তাও যথেষ্ঠ কৌতুকপ্রদ হয়েছে।

লেখকের বর্ণনা - চাতুর্য, সরস টীকাটিপ্পনী ও কৌতুকচিত্রের সমারোহের কিছুকিছু

টিপ্পনী

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পুরাতন বছরের বিদায় এবং নবর্তের আগমন কত লেখকের মনে কত উচ্চ ও মহৎ ভাবের উদ্রেক করেছে। কিন্তু হুতোমের কৌতুক পর্ন দৃষ্টিতে এই বিষয়টী কিভাবে ধরা পড়েছে তার নিদর্শন-

> "ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন, বর্তমান বৎসর স্কুলমাস্টারের মত গম্ভীরভাবে এসে পড়লেন - আমরা ভয়ে হর্তে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরান হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দিখে ছেলেদের বুক যেমন গুর গুর করে - মড়ুঞ্চে পোয়াতির বুড় বয়সে ছেলে হলে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়, পুরানর যাওাতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।"

হাফ আখড়াই শোনাবার জন্য ছেলে বুড়ো সকলেই মেতে উঠে বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছেদ কিভাবে নিজেদের সাজিয়ে তুলেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক তুচ্ছ অচেতন বস্তুকে কিভাবনে আমবয় উপমানের কৌতুকরসাত্মক করে তুলেছেন তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে-

> "কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল, বাজার গরম হয়নে উঠলো। বৌপারা বিমক্ষন রোজকার কোত্তে লাগলো। কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উডনীর এক রাত্রের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদররা, অকর্মন্য হয়ে, নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্সি শিকলা, হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে ঘড়ির চেনের অফিসিয়েটিং হলো - জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।"

হুতোমের ঠাট্টা একবার আরম্ভ হলে সহজে থামে না, জ্যা-মুক্ত বানের মত একটির পর একটি বাক্য কৌতুকের এক একটি ফুলকির মত চারদিকে ছুটে চলে। লেখক যেন নির্দয়ভাবে হাসির পর হাসির বোমা ছুঁড়ে মারেন। দোহারের গানের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে -

"এদিকে দোহাররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগলো। ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চোমকে উঠলো - কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো - বোধ হতে লাগলো যেন, হাড়ীরে গোটাকতক শূয়ার ঠেঙিয়ে থাকে, গাওনার নতুনন সুর শুনে সকলেই বড় খুশী হয়ে সাবাস! বাহবা।' ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন - দোহারেরা উৎসাহ চেয়ে দ্বিগুন চেঁচাতে লাগলো, সমকস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ধোপারা অঘোর ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র কৌতুকরসের প্রাবাল্য দেখা যায় কয়েকটি গান ও অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক কয়েকটি গল্পের মধ্যে। গানগুলি প্রধানত মাতাল ইয়ার ভবঘুরের মুখেই শোনা গেছে। কিন্তু সেগুলির ভাষা ও ভাব এত উদ্ভট ও স্থুল অসঙ্গতিপূর্ন যে তা প্রবল কৌতুকের আঘাতে শ্রোতার চিত্তকে উত্তেজিত করে তোলে। একটি গান শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ করা গেল। গানটি রথের দিন একটি মাতালের মুখে শোনা গিয়েছিল -

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যোটো ঘোড়া
চূড়োর উপর মুখ পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘটা নাড়া,
মধ্যে বনমালী
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চলছে চাকা
আগে পাছে ছাতা পাকা, বেহদ্দ ছেনালী।

নক্সা আঁকতে গিয়ে হুতোম মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে এমন সব গল্পের অবতারনা করেছেন যে গুলির কৌতুকময়তা সশব্দ অট্টহাসিরই উদ্রেক করে। একটি গল্পের খিছুটা অংশ প্রবল কৌতুকহাস্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে -

"সমর্ভেকেশনে কলেজ বন্ধ হয়েচে, স্কুল মাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাছ ধরে বেড়াচ্ছেন। পন্ডিতেরা দেশে দেশে গিয়ে

টিপ্পনী

চাষবাষ আরম্ভ করেছেন, (ইংরেজী ইস্কুলের পন্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়) ধনুবাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুল ফ্রেন্ড নিয়ে, পড়বার ঘরে বসে আছেন, এমত সময় কলেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্র্যান্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতি সন্তপর্নে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোকামাত্রই চারিদিকে দোর জানলা বন্ধ হয়েগেল। প্রথমে বোতলটী অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুধ খাবার মত ক'রে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগল, ক্রমে ব্যান্ডি অন্তর্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, দোর জানলা খুলে দেওয়া হলো, চেঁচিয়ে হাসি ও গররা চলতে লাগলো। শেষে শেরীও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরেজী ইমিপট ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো, ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে ধনুবাবুর বাপচন্ডীমন্ডপে বসে মালা ফিরুছিলেন; ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিৎকার ও রৈ রৈ শব্দ শুনে গিয়ে দেখলেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ করেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও ধনুবাবুকে যাচ্চেতাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন। কর্তার গালাগালে একজন ফ্রেন্ড বড়ই চটে উঠলেন ও ধনুও তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে একটা ঘুষো মারলেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ং বেঙ্গালী (বাঁদরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে কর্তা একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ীর অন্য পরিবারেরা হাঁ হাঁ করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ীর ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেন্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুরা করুনা উপস্থিত হলো, মার কাছে গিয়ে বল্লেন, মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক, তোমাকর ভয় কি! ওল্ড ফুল মরে থাক না কেন, ওকে আমরা চান্নে; এবারে মা এম বাবা এনে দেবো যে, তুমি নূতন বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেলথ ডঋইঙ্কক করবো, ওল্ড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফরমড বাবা চাই।"

হুতোম যখন কোন চরিত্র চিত্রিত করেছেন তখন এত সূক্ষ্মভাবে সরস বিশ্লেষন করেছেন একটার পর একটা রঙের রেখা এত দ্রুত টেনে চলেছেন যে আমাদের পল্পনাশক্তিও যেন সেই তুলিকার গতির সঙ্গে সমতা রাখতে পারে না। বর্ণনার এই নিখুঁত বাস্তবতা ও বিকৃত লক্ষনগুলির বিশদ উল্লেখের ফলেই চরিত্র চিত্রগুলো এত কৌতুকরসাত্মক হয়ে উঠেছে। মফঃস্বলের জমিদার কলকাতায় এসে মদ ও ইয়ার নিয়ে

কিভাবে মতে উঠতেন তার বর্ণনা একটু উদ্ধার করা যাক -

> "মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর শরীর দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিনফিনে ধূতি পরা ও পৈতের গোছা গলায় - মৈমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন। বয়স ষাট পপেরিয়েছে, অথচ রামকে আঁম, ও দাদা কাকাকে দাঁদা ও কাঁকাঁ বলেন।"

হুতোমের বিদ্রুপ সবরকমের ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা ও স্বার্থপরতার প্রতি বর্ষিত হয়েছে। নিজে তিনি উদার ও প্রগতিবাদী ও পরোপকারী ছিলেন। সেজন্য মানুষের মধ্যে ঐসব গুনের অভাব দেখলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন এবং তাঁর প্রতিবাদ বিদ্রুপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করত। রেলওয়ে নামক নক্সাটির মধ্যে রেলওয়ে কর্মচারীদের অসাধুরা ও কর্তব্যহীনতা নিয়ে যে কঠোর মন্তব্য করেছেন তা থেকে কালীপ্রসন্নের মাননসিকতা উপলদ্ধি করা যায়। তিনি লিখেছেন -

> "যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চীনেবাজারে 'কম স্যার। গুড সপ সভার। টেক টেক টেক নটেক নটেক একবার তো সী।' বলে সমস্ত দিন চীৎকার ক'রে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও সোলজারদের গাড়ী ভাড়া করে মদের দোকান 'এম্পটিহাউজ' সাতপুকুর দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েন্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাতড়ান, কাঁচপোকার আরসুল্লা ধরবার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বলদলে 'দি এস্টেশনমাস্টার' হয়ে পড়েছেন, যাঁদের সঙ্গে একবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কনট্যকটে এসেছেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের নামে সর্বদাই কমপ্লেন করে থাকেন।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা সমাজমন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিল। এই সব ধর্ম নিজ নিজ মহিমা প্রচার করা স্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মাশ্রিত লোকেদের মধ্যে নানা সংকীর্নত, ভন্ডামি ও পরধর্মবিদ্বেষের ভাব ও দেখা যেত। কালীপ্রসন্ন সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও সব ধর্মাবলম্বী লোকেদের মন্দ দিকটি ব্যঙ্গবিদ্রুপের খোঁচা দিয়ে

টিপ্পনী

দেখিয়েছেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেককে গোঁড়া ও কূপমন্ডূক হয়ে, সবধরনের উন্নতি ও উদারতার প্রতি বিরূপ বিমূখ হয়ে উঠতেন তার পরিচয় অনেক স্থানে দিয়েছেন। 'হঠাৎ অবতার' নামক নক্সাটির মধ্যে পদ্মলোচনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হুতোম লিখেছেন-

> "তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি নিদ্বেষ ছিল ; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন, ইংরেজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরেজি পড়ান নি, অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই ; বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই, এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়ার দলেই পড়ে।"

বৈষ্ণব গোস্বামীরাও কালীপ্রসন্নের হাতে কম নাস্তানাবুদ হন নি। বৈষ্ণবদের পূর্বে প্রচলিত গুরুপ্রসাদি প্রথা তিনি যেরূপ সরস গল্পের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন এবং প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজীদ্বয়ের যেরূপ ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকেছেন তা ভোলবার নয়। গোস্বামীর চিত্র অঙ্কন করে তিনি এক জায়গায় একটু কঠিন মন্তব্যসহ লিখেছেন-

> "হিন্দুধর্মের বাপের পুন্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটি রগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনে। গোঁসাই বললেই একটা বিকটতর ধুম্বলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার । গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্টে আয়েস ও আহারাদি চলে বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই।"

নিজের ধর্মের লোকেদের প্রতি নির্মম হয়েছেন শুধু নয়, অপর ধর্মের লোকদেরও তিনি নিস্কৃতি দেন নি। ব্রাহ্মনধর্মাবলম্বীদের কৃত্রিমতা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন-

> " আজকাল ব্রাহ্মর্ধের মর্মবোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসব হবে আবার কি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়া কান্না কাঁদতে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মন যে, বেদ ভাষা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তারে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না - আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পারেন না ? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক

হবে, তারি যোগাড় হচ্ছে।"

পাদরীদের ধর্মপ্রচার ও দেশী খ্রীষ্ঠানদের দুর্দশা নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও হুতোম ছাড়েন নি। যথা -

> "কোথাও পাদরী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি আইবেল বিলুচ্চেন - কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভাষা - মুবর্ধ্বন চৌকিদারের মত পোষাক পেনটুলেন, ট্যাং ট্যাং চাপকান, মাথায় কালোরঙের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদলতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন - হঠাৎ দেখলে বোধহয় যেন পুতুলনাচের নকীব কতকগুলো জাঁকা ওয়ালা মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ঠ কি বলেছেন। কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হাওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েচে আর দিশী খ্রীষ্ঠানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্ঠান হতেও ভয় হয়।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের হাস্যরসের দৃষ্টান্ত যতই দেওয়া যাক না কেন, দৃষ্টান্ত আর যেন শেষ হয় না। তাঁর হুতোম প্যাঁচার নক্সায় প্রতিটি কথার বর্ণে, ভঙ্গিতে ও উচ্চারনে হাসির খেলা আর খুশির মেলা। হুতোমী নক্সায় সমাজের চিত্র ফুটেছে বটে, কিন্তু রকমারি কৌতুকের রঙিন তন্তু দিয়েই সেই নক্সা বয়ন করা হয়েছে।

হুতোম প্যাঁচা নক্সার গদ্যরীতি ও ভাষা

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। তার প্রধান কারণ এর ভাষা। চলিত গদ্যরীতির প্রকাশে বইটির অভিনবত্ব আছে। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(ক) সমাজচিত্র বর্ণনায় আ লোকজীনের প্রাত্যহিক বিবরনে চলিত ভাষা যে সার্থক প্রকাশ মাধ্যম হতে পারে তা স্বীকৃত হল। 'কলকেতার ভাষা' যে আগামী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন হবে, বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরির কথায় তা উচ্চারিত হওয়ার অনেক পূর্বে কালীপ্রসন্নই প্রথম এই গ্রন্থে তার আভাস দিয়েছিলেন। অবশ্য হুতোমের পূর্ববর্তী লেখক ঠেকচাঁদ বা প্যারীচাঁদের এখাতেও (*আলালের ঘরের দুলাল) বিভিন্ন স্থানে এই মৌখিক রীতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ভিত ছিল সাধুভাষা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(খ) হুতোমের গদ্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লেখকের বিক্ষন-নৈপুন্য এবং উচ্চারনভিত্তিক বানান ব্যবহার ; যেমন শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাছ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের 'ও গামছা কাঁদে ভাল মাচ নিবি?' 'ও খেঁরা গুঁপো মিন্‌সে চার আনা দিবি' বলে আদর কচ্চে।" আই বানান রীতি মৌখিক উচ্চারন বা 'করুনি'র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

(গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (যেমন দুম করে তোপ পড়ে গ্যালো) প্রাত্যহিক বাচনভঙ্গী, সংলাপধর্মী চিত্রকরের ছবির মত দৃশ্যগুন হুতোমের রচনায় দেখা যায়।

(ঘ) হাস্য পরিহাস বা ব্যঙ্গ -বিদ্রুপ প্রয়োগে চলিত গদ্যের উপযোগিতা প্রমাণিত হল। হুতোম মুখ্যত ব্যঙ্গ লেখক। এই ব্যঙ্গে মাঝে মাঝে আক্রমণ বা বিদ্বেষ থাকলেও তা ক্ষতিকর নয়। উপভোগ্য ও কল্যানকর। অন্যদিকে সমানুভূতি ও প্রসন্ন কৌতুক এই গ্রন্থের বহু লেখায় ছড়িয়ে আছে।

(ঙ) 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' শহর কলকাতার তৎকালীন একখন্ড সামাজিক ইতিহাস । তথ্যচিত্রের মত উজ্জল ও নির্ভরযোগ্য । একলালের সাংবাদিক সুলভ 'রম্যরচনার' প্রথম প্রয়াস বলে গন্য হতে পারে।

কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' 'কলকেতার ভাষা' ককনি (Cockney) এবং মুসলমানী বুকনি মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন ও সমাজের অনন্য ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন। 'হুজতোম প্যাঁচার নক্সা' অবিমিশ্র চলিত ভাষায় লেখা সেদিক থেকে কালীপ্রসন্ন গদ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী দশকের জন্য মহানমূল্য ঐতিহ্য রেখে গেছেন। প্রবাদ প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার এবং অন্য সব দিক থেকে তিনি চলিত রীতিটিকে পরিপূর্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

এর আগে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বা উইলিয়াম এরীর গ্রন্থে লোকের মুখের ভাষার উদাহরন দিতে গিয়ে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের একপ্রান্তে দীন আসন দেওয়া হয়েছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' কথ্যরীতিতে সহজবোধ্য ভাষাব লেখা গ্রন্থ হলেও এর কাঠামোটি সাধুরীতির। ক্রিবাপদগুলি বা সর্বনামগুলি সাধু তো বটেই চলিত ভাষায় উচ্চারনভঙ্গিও বজায় রাখা হয় নি । কালীপ্রসন্নের হুতোম অবিমিশ্র চলিতে লেখা । পরবর্তীকালে বঙ্কিমযুগেও কোন গদ্যলেখকই চলিত-ভাষার এই বিশুদ্ধি রক্ষা করে কিছু লিখতে পারেন নি। বিংশ শতক শুরু হবার প্রায় চল্লিশ বছর আগে কালীপ্রসন্ন গদ্যরীতির ক্ষেত্রে পরবর্তী শতকের জন্য মহামূল্য ঐতিহ্য রেখে গেলেন। ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম পদগুলি

উচ্চারন বৈশিষ্ট্য (স্ররসঙ্গতি, অভিশ্রিত, শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্টতা প্রভৃতি) প্রবাদ প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার সবদিক থেকেই তিনি চলিত রীতিটিকে পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

টিপ্পনী

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্র থম শ্রেনীর ভাষা স্রষ্টা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁর বক্তব্য ও ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাল লাগে নি। কিন্তু মহান 'সাহিত্যসম্রাটের রাজকীয় উপেক্ষা সত্ত্বেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নিজস্ব মর্যাদায় স্বমহিমায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে।

নক্সা হিসাবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সার্থকতা

'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' আলোচনায় যে প্রশ্নটি প্রথম উঠে আসে সেটি হল আজকের দিনে নক্সার প্রাসঙ্গিকতা কী ? এর উত্তরে বলতে হয় উনবিংশ শতক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহীদের এই গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। শহর কলকাতার উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অবশ্য পাঠ্য। উনিশ শতক, কলকাতা এবং বাঙলিয়ানা, তিনটিই হুতোমের নক্সার অপরিহার্য চরিত্র লক্ষন, তবু তাদের মধ্যে প্রধান কে যদি এ প্রশ্ন ওঠে, বলতে হয় বাঙালিয়ানা, হাড়ে-মজ্জায় এমন একটি বাঙালি বই খুব বেশি লেখা হয় নি, তৎকালীন শহরে বাঙালির আচরন, মানসিকতা, ভাষা, লেখক হাজির করেছেন অন্তরঙ্গ কথনের ধরনে যে মেজাজটিও বাঙালি। সমাজের হরেকদিক তো আছেই, তার সঙ্গে সমসাময়িক ঘটনা ও ছদ্মবেশে বাস্তব চরিত্রের উপস্থিতি তির্যক ব্যঙ্গকে আরও লক্ষ্যভেদী করে নক্সাকে পাঠকের কাছে অধিকতর স্বাদু করে তুলেছে। সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা নীল বিদ্রোহের মত নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা চরিত্রের নিছক বিবরনে হুতোমের রুচি নেই। ভালমানুষের স্থান নেই তার রচনায়, বিদ্রুপযোগ্য নয় এমন চরিত্র নকশায় এসেছে শুধু পটভূমিকা ভরাট করার প্রয়োজনে। এতৎসত্ত্বেও নক্সা যে নির্জলা 'কুচ্ছো' বা ভাঁড়ামোয় পরিনত হয় নি, তার কারন হুতোমের অসাধারন সাহিত্যিক মুন্সিয়ানা, মানক্সাকে লোকোত্তর চরিত্র দিতে পেরেছে। উতোমের নকশা প্রথম প্রকাশকাল থেকে আজ প্রায় সোয়শ বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশ প্রমাণ করে এর স্থায়ী চাহিদা আছে।

কিন্তু নক্সার পাঠকরা কি একই রস উপভোগ করছেন এত বছর ধরে ? তা নিশ্চয় নয়। কারণ নক্সা যখন লেখা হয়েছিল পাঠকরা সকল কশব্দের অর্থ জানতেন, চিনতেন ছদ্মবেশী চরিত্রগুলিকে, গূঢ়ার্থক অংশের আৎপর্য বুঝতে পারতেন। ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে চলে যায় সব। তবু কালীপ্রসন্নের সাহিত্যগুনে হুতোম আজও পাঠকের দরবারে জনপ্রিয়।

টিপ্পনী

নক্সা সাহত্যের উদাহরন আমাদের বাংলা সাহিত্য কম নয়। তবে তাদের মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কিছু বিশিষ্ট। কারন হুতোমের মত বিষয় বৈচিত্র কারও নেই। তাছাড়া অন্যরা সমাজের ছবি আঁকতে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এত বেশী যে, অনেক ক্ষেত্রেই রম্য উপন্যাসের চেহারা নিয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র বাস্তব, সমসাময়িক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া বাস্তব থেকেই সংগৃহীত, যে বৈশিষ্ঠ্য অন্য কারও লেখায় মেলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' আপাদমস্তক নির্ভরযোগ্য সামাজিক দলিল বিশেষ। কারণ ব্যঙ্গবিদ্রুপ শানিত করতে। চরিত্রে ছদ্মবেশ সম্পূর্ন করতে বহুক্ষেত্রেই হুতোম অল্পবিস্তর কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তা ছাড়া চরিত্র বা উৎসব ঘটনাদির বর্ণনাও কিঞ্চিৎ একপেশে। এসব সত্ত্বেও খাদের পরিমান অন্য নকশাকারের থেকে লক্ষনীয় রকমের কম।

হুতোমের পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীঃ। তারপর বাংলায় নক্সা সাহিত্যের জোয়ার আসে। নক্সা শব্দটি গ্রন্থ নমামে কালীপ্রসন্ন প্রথম ব্যবহার করলেও চরিত্রগম দিক থেকে তাঁর মৌলিক অবদান নয়। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ 'বঙ্গসাহিত্য নক্সা' (পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন) প্রবন্ধে নক্সার মূল চরিত্রলক্ষন স্থির করেছেন - (১) যথেষ্ঠ হাস্যরস (২) সামাজিক অনাচার বা ব্যাক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপ (৩) সামাজিক দোষ করতে শিক্ষা দান। নির্মেলেন্দু ভৌমিকের মতে নক্সার ঐ বৈশিষ্টগুলির সঙ্গে যুগলক্ষনকে যোগ করা উচিত (উনিশ শতকের বাংলা নক্শা, ড. নির্মেলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৮৪)। বলা বাহুল্য কোনও একটি নক্সায় সব কয়টি লক্ষন উপস্থিত নাও থাকতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও ব্যাক্তির প্রতি কটাক্ষ, লঘুভাষা ও পর্যাপ্ত হাস্যরস সাধারন থাকেই। এখন পর্যন্ত জাননা যায়, 'বাবুর উপখ্যান' নামক সমাচার দর্পনে (২৪.২.১৮২১ খ্রী. এবং ৯.৬.১৮২১ খ্রী.) প্রকাশিত রচনাটি বাংলা নক্সা সাহিত্যের আদি উদাহরন। হুতোম তাঁর রচনার পূর্বে প্রকাশিত নক্সা যেমন ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীঃ) এবং 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রী) প্রভৃতি পড়ে অনুপ্রানিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ হুতোমের চলিত ভাষার স্বচ্ছত, বর্ণনার ডিটেলস বা অনুপুঙ্খের সমারোহ পার্শ্বচরিত্রের প্রতি মনোযোগ তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালোর ঘরের দুলাল (১৮৫৮ খ্রীঃ) -এর কিছুটা মিলতে পারে।

হুতোম টেকচাঁদ ঠাকুরের একাধিক রচনা থেকে সোজাসুজি গন ও বিশিষ্ট প্রকাশ (expression) ধার করেছেন বলে সমালোচকদের মত। প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র চুনিলাল মিত্র 'ঠেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র' ছদ্মনামে তাঁর কলিকাতার লুকোচুরি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন - "হুতুমের নক্সাখকানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরন করিয়া পাঠ করিলে মওদয়

টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্নরূপে বলিতে হইবে।" এ কথা অবশ্যই অতিরঞ্জিত, তবে পুরোপুরি মিথ্যা নয়। অনুরূপভাবে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার উপর পড়েছিল কি না তার কোন প্রমান নেই। তবে চার্লস ডিকেন্সের Shatches by Bo2 জাতীয় রচনা হয়তো পড়ে থাকতে পারেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। নক্সার দ্বিতীয় গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম বললেছেন, নক্সা প্রকাশ হওয়াতে সমাজে বজ্জাতির লাঘব হয়েছে বল্লে নিজেদের বড়াই করা হয়, 'কিন্তু এঈ সাধারনের ঘরকন্নার কথা Household words' ডিকেন্স এই নামেই একটি সাপ্তাহিক প-ত্রিকা পরিচালনা করতেন, যার অধকাংশ রচনাই ছিল স্কেচধর্মী (Household words, প্রথম প্রকাশ ১৮৫০ খ্রীঃ)। তবে এত সহজ অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সমীচীন নয়। হুতোমের নকশার বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গি যদি কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকে, তবে তা এতই প্রচ্ছন্ন। হুতোমের স্বকীয় স্পর্শে এতই রূপ পাল্টেছে, যে ধরা দুষ্কর।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নকআই তাতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক সমালোচনা 'অভিজ্ঞতার কথা ততটা বলে না, যতটা বলে প্রতিক্রিয়ার কথা। যে অভিজ্ঞতা শুধু অবহিত হওয়া, সে অভিজ্ঞতা সাহিত্যে রূপায়িত হবার সময় অনুকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃহত্তর ও গভীরতর অর্থে অভিজ্ঞতা একটা মানসিক পরিস্থিতি। কথা সাহিত্যের ভাষায় সেই অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন অবধানতার ভুমিকা প্রবল। যখন দৃষ্টি ও অবধানতা actuality অপেক্ষা reality-র গভিরে অবতরনের জন্য আগ্রহী হয় তখন তার সামাজিক ঐতিহাসিক রোহভূমিটাই আসল কথা। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা একারনে উপন্যাসের উপযুক্ত বাস্তবতার ধারে কাছে ঘোরাফেরা করলেও তার ভিতরে প্রবেশ করে না। সে তার ভাষা নিরীক্ষন নিয়েই ব্যস্ত। এই ভাষাব অবশ্যই যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে ঘটমানতা। কিন্তু এই ভাষার সীমাবদ্ধতায় ধরা পড়া আরো এক নেতিরূপ। 'যা হচ্ছে তা বলা যায় এ ভাষায়, 'যা হবে' অর্থাৎ অবক্ষবিত শ্রেনীচিত্রের পরিবর্তে উদীয়মান মধ্যবিত্তের দ্বান্দিক সম্ভাব্যতাকে প্রতিফলনের পক্ষে ঐ ভাষা কার্যকরী নয়। তবে কার্যকারী নয়। তবে সমাজ সচেতন সাহিত্য হিসাবে নক্সাটির মৌলিকতা সর্বজনস্বীকৃত। উপন্যাস না হলেও চরিত্রসৃষ্টি ও বীক্ষন নৈপুন্য অনেক জায়গায় উপন্যাসের উদ্ভাস দেখা যায়। সমসাময়িক পুলিশী ব্যবস্থার একটি বাস্তবলেখ্য তাঁর নিপুন তুলিতে ধরা পড়েছে - "পুলিশের সার্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি যমরা মস্‌মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন, সকলেরি সিকি, আধুলী, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক পরিপূর্ন।"

সাহিত্য সমাজ দেশ সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ন চিন্তা ও কাজ তিনি করেছেন। সেই সঙ্গে সেদিনের বাঙালির জীবন-চর্চার প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব প[রিচয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্পর্কেই তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা তাঁর নক্সার সূচীপত্রের দিকে তাকালেই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বোঝা যাবে। যেমন - কলিকাতার চড়ক পার্বন, হুজুক, ছেলেধরা, ক্রিশ্চানি হুজুগ, সাতপেয়ে গরু, ছুচোর ছেলে বুঁচো, পাদরি লঙ ও নীলদর্পন, বুজরুকি ইত্যাদি।

নক্সা উপনাস নয়, লেখক সে দাবি করেনও নি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন - "আমরাও এই নকশাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম - এখন আপনাদের স্বেচ্ছামতো তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।" হুতোম তাঁর নক্স দর্পনে যাদের ব্যঙ্গ চিত্র দেখিয়েছেন তারা ছাড়া সকলেই তাকে পুরস্কৃত করেছেন। তাঁর বাস্তব ও জীবনমুখী দৃষ্টিভশিগই হুতোমের রচনাকে সজীব ওপ সাহিত্যগুনসম্পন্ন করেছে এবং এই সব উপাদান প্রকৃত সাহিত্য পোষ্ঠার উর্বর চিন্তা ক্ষেত্রে সযত্নে ও তন্নিষ্ঠরূপে লালিত হয়ে পরবর্তীকালে উপন্যাসের বিশালল মহীরুহের বীজটিকে অঙ্কুরিত করেছে।

অনেক সমালোচক 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কে আত্মগৌরবী প্রন্ধের (Subjective essay) শরেনীতে স্থান দিতে চেয়েছেন। আসলে লেক সমকালীন কলকাতার উশৃঙ্খল জীবননের উপরে ব্যাঙ্গের কশাঘাত করেছেন। তাঁর নক্সায় দ্বিদীপ্ত ব্যঙ্গহাসভ চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে লেকের মনের ও বাইরের দুরকম বর্নই মিশে আছে। কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ দৃষ্টি পরিহার করে স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে চমৎকার রসরচনার জন্য দিয়েচেন কালীপ্রসন্ন।

হুতোম সব সময়েই সামাজিক ছবি একটা উৎসব উপলক্ষ করে আঁকতে চেয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর পর্বাপর লেখকদের মধ্যে নেই।

"হুতোম প্যাঁর নক্সা"র বিষয় বস্তু

১৮৬৮ খ্রীঃ প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র সংস্করনের সূচীপতরে প্রত্যক নক্সার আলাদা আলাদা শিরোনাম এং 'হুজুক' ও বুজরুকি' তার দুটি গুচ্ছ। হুতোম না বললেও প্রকৃতপক্ষে নক্সার বিষয় বিভাগ তিনটি, সামাজিক ছবি, হুজুক ও কেচ্ছা ত্রিধারাই সেখানে মিলেমিশে আছে। মুখ্যত সামাজিক ছবির উদাহরন চড়ক, দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

হুজুক বলতে আমরাএখন যা বুঝি হুতোমের ধারনা তার থেকে কিছুটা আলাদা, তিনি প্রকৃত ঘটনা, হুজুক ও গুজবের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নি। বহুজনজ্ঞাত শোরগোল জাগানো যে কোনো বিষয়ই তাঁর আছে হুজুক, সিপাহী বিদ্রোহ থেকে মরাফেরা, সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকের কমিউনিকেশন রেভল্যুলনের যুগে হুতোমি হুজুকে-কলকাতা কল্পনা করা কষ্টকর, যেখানে মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে সুদূর সম্পর্কযুক্ত উদ্ভটতম

গুজবও অনায়াসে বিশ্বাস অর্জন করত। জনতার বৃহদংশের অজ্ঞতাই তার জন্মবৃদ্ধির উর্বর ক্ষেত্র, আর হুজুকের এমনই সম্মোহনী ক্ষমতা যে শিকইত জনও অবশেষে তার শিকার হয়ে পড়েন। বিষয় হিসাবে হুজুক শুধু হুতুমকেই আকৃষ্ট করে নি। সে যুগের বটতলা সাহিত্যিকরাও একাধিক হুজুককে চটি বইয়ের অমরত্ব দিয়ে গেছেন।

তৃতীয় বিষব কেচ্ছা, যা হচ্ছে কিস্‌সা = কাহিনী ও কুৎসা >কুচ্ছোর মিলিত রূপ। তৎকালীন সমাজে মুদ্রিতাকারে যে সব কুৎসা প্রচারিত হত তার সঙ্গে হুতোমি কেচ্ছার বিস্তর ফারাক এবং তা বুঝতে গেলে সে যুগে কুৎসা সৃষ্টি প্রচারের কারন বিবরন বলা দরকার। শহর কলকাতার কুৎসা রটনার মূল সূত্র ছিল তার গ্রামীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে।বঙ্গীয় গ্রামীন সমাজে কুৎসা ব্যাক্তি বিশেষের রুচি বিকৃতি ছিলক না, যৌথ প্রচেষ্টায় প্রচারিত ও সময় সময় সৃষ্টও হত। তার বহু প্রমান সাহিত্যে রয়ে গেচে, অনেক পরবর্তীসময়ের রচনাতেও যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ', বিভূতি ভুষন বন্দোপাথ্যায়ের 'কেআর রাজা' - তে তা দেখা যায়।ও কলকাতা তখন আকারে ছোট জনসংখ্যা কম এবং নির্কমাদের আধিক্য থাকায় একে অপরের, সত্যমিথ্যা যাই হোক, কলঙ্কের খবর অনায়াসেই পেতেন। বাবুদের নিন্দা করা নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল, অপর পক্ষের নিন্দাযুদ্ধ পর্যবসিত হত অশ্লীল কুৎসা প্রচারে। হুতোম নিজেই 'রামলীলা' নক্সায় বলেছেন, "আমাদের পুর্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেছেন। আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষেদর 'খেঁউড়ে' জিত ধরাই আছে।" বাবুদের বৈঠকি আড্ডায় মোসাহেবদের দ্বারা যার উৎপত্তি ঘটত তার শেষ হত টাকা দিয়ে ছাপিয়ে প্রচার করায়। মনে রাখা উচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রথম প্রথম খুব চি বই এর আকারে এর হত। অমূল্য চরন সেন তাঁর 'কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন - "কালীপ্রসন্নের আদেশ ছিল, অতি প্রত্যুষে বাবুদের বাড়ী এক এক খন্ড যেন বিলি করা হয়। তাঁহারা লোকেরা তাহাই করিত।" তৎকালীন বাজারচলিত নিন্দাকুৎসাভিত্তিক রচনার সঙ্গে হুতোমের নক্সার সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বেশী হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে। কুৎসা প্রচারের কারণ বংশানুক্রমিক বিরোধ, স্বার্থের লড়াই, দলাদলি বা নিছক ঈর্ষা যাই হোক না কেন, লক্ষ্য একটাই, উদ্দিষ্টকে হীন, নীচ প্রতিপন্ন করা, অপমান করা, হাস্যপদ করা। সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রচেষ্টায় মোড়কে হুতোম তাই করেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' যে ব্যাক্তি বিশেষকে আক্রমন করেছেন নক্সার প্রথম ভূমিকায় যে কথা বলতে চান নি। তিনি লিখেছেন - "সত্য বটে অনেকে নকশাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতেপারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা লা বাল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারোও লক্ষ্য

টিপ্পনী

করি নাই অথচ সকলেরে লক্ষভ করিচি, এমন কী স্বয়ং নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" কিন্তু নমক্সার দ্বিতীয় ভূমিকায় অসংকোচে বলেছেন, "তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পমলোচনকে মজলিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অজ্ঞনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসোরে এলেন ?" এই সাদৃশ্যটুকু বাদ দিলে হুতোমের অনেকটাই মৌলিকত্ব রয়েছে, যা বুঝতে তৎকালীন সামাজিক অপরাধের দিকটই জানা দরকার, কারণ, নিন্দার ভিত্তিই ছিল তাই হুতোম যাদের ব্যঙ্গ করেছৈন তারা সবাই তাঁর স্বশ্রেনীর, কেউই নিতান্ত সাধারন অপরিচিত মানুষও নন। সবাই তাদের চিনত বলেই নক্সা সাধারনের কাছে এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

হুতোম এদের তিনভাগে ভাগ করেছেন - সাহেবি ওল্ড আর নিউ ক্লাস ও খাস হিন্দু। অর্থাৎ ইংরেজ শিক্ষিত, সাহেবি চালচলনের অন্ধ অনুকরনকারী ওল্ড ক্লাস, ইংরাজি শিক্ষিত অথচ সাহেবদের হুবহু নকল করেন না এমন নব্যরা আর ইংরাজি না জানা সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দু। হুতোম বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেননি যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, এদের মধ্যে অর্থসংগতি রকমফের ছিল, যারা ধনী,তাদের অর্থোপার্জননের উপায় জমিদারি, বেনিয়ানগিরি, ব্যবসা। ধনী না হয়েও যারা সমাজে পরিচিত অর্জন করেছে, তাদের প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, অনেকেই ব্রাহ্ম, অধিকাংশের পেশা চাকরি।

ধন উপার্জনের পন্থায় বনেশ বড় এক দলের কোনও চুৎমার্গ নেই। যেন তেন প্রকারেন অর্থোপর্জনই লক্ষ্য। একবার অর্থশালী হলে প্রয়োজনানুরূপ দানধ্যান করে, প্রভাবশালী সাহেবদের ধার দিয়ে বা ঘুষ দিয়ে 'কিনে' রেখে এমন দোর্দন্ড ক্ষমতার অধিকারী হত যে, এদের সঙ্গে কেউই পেরে উঠত না। তার সুযোগ নিয়ে এরা আইনি বেআইনি নানা উপায়ে সম্পত্তি বাড়িয়ে চলত। সম্পত্তি অধিকার বা টাকা রোজগারের জন্য এদের অনুসৃত যে সব পন্থা আজকের দিনে অপরিচিত তার কয়েকটি বলা যেতে পারে -

(ক) সম্পদশালী কোনও পরিবারের অভিভাবক মারা গেলে ও উত্তরাধিকারী নাবালক থাকলে তার অভিভাবকত্ ও সম্পত্তি দেখাশুনার দায়ত্ব হস্তগত করে সম্পত্তি বেনামে আত্মসাৎ করা।

(খ) কোনও ধনী পরিবারের অভ্যন্তরীন বিবাদে সালিশি হয়ে বিবদমান দুই পক্ষ থেকে ঘুষ নেওয়া।

(গ) ধনী পরিবারের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া।

(ঘ) 'ক্রীত' সাহেবনদের দয়ে বা নিজ বুদ্ধিবলে কারও বিপদ উদ্ধার করে মোটা টাকা ফি নেওয়া ইত্যাদি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র সঙ্গে সেই যুগের বাজার চলতি রচনার পার্থক্য হুতোম অর্থনৈতিক অপরাধকে রেয়াৎ করেন নি,। সত্যের খাতিরে বলা উচিত, মুখ্য বিষয়ও করেন নি। দ্বিতীয়ত, নক্সায় ব্যাক্তিগত আক্রমন থাকলেও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেন নি এবং মুখরোচক যৌন কেচ্ছাকে প্রাধান্য দেন নি। সে সময়ে কুৎসার বিষয় ছিল দুরকম - বর্তমান ও অতীত। বর্তমান হচ্ছে একেবারে সমসাময়িক কুকীর্তি। এইসব বর্তমান কেচ্ছারাই 'অতীত' কেচ্ছায় রূপপান্তরিত হত। কিন্তু তা ছাড়াও 'অতীত' গ্রপের এক বড় অংশ হচ্ছে জাতপাতের কেচ্ছা, যা কি না স্থায়ী কলঙ্ক। নাম করা বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেউ আদিতে ছিলেন পাচক বা মুদি, নিম্নবর্নের কেউ পয়সার জোরে উচ্চবর্ণের পদবি ধারন করেছে। লক্ষনীয় হুতোম একমাত্র 'স্নানযাত্রা' ছাড়া অন্য কোথাও 'বর্তমান' কেচ্ছাকে নক্সার বিষয় করেন নি। খোঁচা দেবার জন্য তাঁর 'অতীত' কেচ্ছাই পচ্ছন্দ। উতোমির মৌলিকত্ব হচ্ছে, চলতি ধরনমতো ঘটনা বা কোনো ব্যাক্তির কুকর্মকে খন্ডিতরূপে উপস্থিত না করে, তাকে যথার্থ পটভূমিকায় বিবৃত করে কারণ অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দেওয়া। আর যে সব চরিত্রের সরাসরি নিন্দা বা কুৎসা করার মতো কিছুই নেই, তাদের সৎ সাজিয়ে হাজির করা হল যেমন, 'রেলওয়ে' নক্সায় হুতোকম প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের চেহারা বা সখ নিয়ে তাঁদের হাস্যসম্পদ করেছেন।

নক্সা লেখার অনুপ্ররনা যে তাঁর ব্যাক্তিগত অনুভূতি ও ধারনা থেকে এসেছে নক্সার বিষয় নির্বাচন আর গঠন খঁতিয়ে দেখলে এমনই মনে হয়। কালীপ্রসন্ন ব্যাক্তীগত জীবনেও খুব সপষ্টবাদী ছিলেন। অমৃতলাল বসুর 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন কালীপ্রসন্ন "যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা কি দোর্দ্দন্ডপ্রতাপ ধনীই হোন, সবারই সম্মুখে তাদের ভন্ডামীর বা ন্যাকামির ব্যাখ্যনা করতেন, প্রায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই সিংহ দত্ত এক একটি ব্যাঙ্গাত্মক ডাকনাম পেয়েছিলেন।'

'হুতোম প্যাঁচা নক্সা' গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া

হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রকাশিত হওয়ার পর দুটি প্রতিক্রয়া লক্ষ্য করা যায়,- (১)

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অপাধ্য কুৎসা সাইতভের প্রকাশ্য সমাজ থেকে নির্বাসন, আর (২) জবাব এবং পাল্টা জবাবের জোয়ার। প্রথমটির কারন সম্পূর্নত হুতোমের নক্সা নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি কারণ, তবে অশ্লীলতা না করেও যে নক্সায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র দৃষ্টান্তে এই বোধ নিন্দা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও লেখক উভয়েই হৃদয়ংগম করতে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়টির সাক্ষ্য শুধু প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নয়, এই চাপান - উতোরের স্মৃতি অনেককাল পরেও সমকালীনদের মনে ছিল। অমৃতলাল বসু 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতিজ' গ্রন্থে বলেছেন, "হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাবন দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত।"

নক্সাজাতীয় রচনা কালীপ্রসন্ন সিংহের আগে পরে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু একটি বইতে এত লোককে বিদ্রুপ করার দৃষ্টান্ত আর একটিও নেই। এতজনকে একসঙ্গে শত্রু বানাবার সাহস কারও ছিল না , মনে রাখতে হবে, কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিন' বইটি উৎসর্গ করেছেন 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়' হুতোমচাঁদকে । হুতোমের উদ্দিষ্ঠ ব্যাক্তি বা তাৎপক্ষীয়রাই শুধু জবাব লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা নগন্য, হুতোমের লক্ষ্যভেদে উৎসাহিত হয়ে প্রচুর নতুন লেখকের আবর্ভাব ঘটে। সমাজ সংস্কারের অজুহাতে বিদ্রুপবান বর্ষনই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। হুজুক এবং কেচ্ছাপ্রিয় বাঙালির পক্ষে অতীব স্বাদু এক সমন্বয়ের আবির্ভাব ঘটে, রম্য কেচ্ছার হুজুক, যার পথপ্রদর্শক হুতোমের নক্সা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সঠিক হুতোম প্যাঁচার নক্সা - সম্পাদনা অরুন নাগ।

২।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড, ৪র্থ সংস্করন) - সুকুমার সেন।

৩। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালিপ্রসন্ন সিংহ - ড. পরেশচন্দ্র দাস

৪। স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি - অমৃতলাল বসু (সম্পাদনা - অরুন কুমার মিত্র)

৫। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার

প্রশ্নাবলী

১। নক্সা হিসাবে 'হুতোম প্যাঁর নক্স'র সার্থকতা বিচার কর।

২। 'হুতোম প্যাঁচার নক্স' - য় হাস্যরসের পরিচয় দাও।

৩। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' য় সে সময়ের সমাজের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষন কর।

৪। বাংলা গদ্যাভাষায় হুতোমের আবদান কতখানি বুঝিয়ে দাও।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' র গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নববাবু বিলাস

টিপ্পনী

ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়

ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭ খ্রীঃ - ১৮৪৮ খ্রী) প্রধানত রামমোহনের বিরোধী পক্ষরূপেই সমিক পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয় সম্পূর্ন নয়। সুদক্ষ সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক, রঙহগব্যঙ্গ রচয়িতা, হিন্দুধর্মের প্রাচীন আদর্শরক্ষার অক্লান্ত সৈনিক হয়েও এই কৃতী পুরুষ প্রধানত যেন রক্ষনশীলতার দায়েই দন্ডিত। অথচ রামমোহন - সমকালীন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমানে কথাসাহিত্যের জগৎ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সাধারন পাঠক বিনোদন এবং সমাজচিত্র অঙ্কনে সমানভাবে উৎসাহী ছিলেন। সর্বোপরী সমকালের বিবরনদানেও তিনি পারদর্শী লেখক রূপে স্বীকৃত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমর্ধে যে কয়েকজন বাঙালী মনীষী জাতীয় জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেচিলেন ভবানীচরন তাদের মধ্যে অন্যতম। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অসাধারন মনীষা ও ব্যাক্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান ছিলেন। তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, ধর্মসভা সংস্থাপক, বাংলা গদ্যের একজন আদিতম লেখক এবং বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক ছিলেন বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করার ফলে প্রাচীন ও নবীন আদর্শে যে ঘোরতর সংঘাত বেধেছিল তাতে তৎকালীন হিতৈষী সমাজনায়কদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন আদর্শের সনাতন দন্ডটি আঁকড়ে থাকলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রথম দলে কিনউ রাধাকান্ত দেবের মত ভবানীচরন ছিলেন দ্বিতীয় দলে। ভবানীচরন তখনকার শৈথল্য ও স্বৈরাচার - দুর্বল সমাজে বিজাতীয় ধর্ম ও বিগর্হিত নীতির প্রবল আক্রমণ থেকে সনাতন ধর্ম ও শুচি-শুদ্ধ নীতির কল্যান রূপটি সযত্নে রকলষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভা ও সম্পাদিত সমাচার - চন্দ্রিকা মধ্য দিয়ে তিনি সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কন্ঠকিত রচনার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি পরায়ন কুক্রিয়াসক্ত সমাজকে শোধন ও নির্মল করতে চেয়েছেন।

ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম-শিক্ষা-কর্মজীবন

টিপ্পনী

ভবানীচরনের পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের প্রচেষ্ঠায় "ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক বাবু ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃ°তশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরন" প্রকাশিত হয়। জরজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেই গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী '১৯৯৪ সনের আষাঢ়ী পৌর্নমাসীতে' কলকাতায় ভবানীচরনের জন্ম হয়। পিতা রামজয় বন্দোপাধ্যায় তাঁকশালের কর্মচারী ছিলেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল পরগনা উখড়ার অন্তঃপতি নারায়নপুর গ্রামে। পরে কলকাতার কলুটোলায় নতুন বাড়িতে আসার পর ভবানীচরনের শিক্ষা শুরু হয়। তিনি বাংলা-ফার্সী-ইংরেজীতে আরদর্শিতা অর্জন করে বিভিন্ন ইংরেজ রাজপুরুষের অধীনে কর্মগ্রহন করেন। জে ডাক্ট. স্যার উইলিয়াম কার, স্যার চার্লস উইলি, বিশপ মিডিলটন, স্যার হেনরি ব্লাপেট, লর্ড বিশপ হেবার প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী ব্যাক্তির অধীনে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে চাকুরী করেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক ভবানীচরনেদর পত্রিকা সম্পাদনার সূচনা হ ১৮২১ ক্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী'র পাতায়। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম তেরোটি সংখ্যা প্রকাশের পর অন্যদের সঙ্গে ঐক্যমত না হওয়ায় তিনি 'সম্বাদ কৌমুদীর' সংশ্রব ত্যাগ করেন। এরপর তিনি ১৮২২ খ্রীঃ ৫ইমার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন কনুটোলা থেকে, তাঁর নেতৃত্বে এই পত্রিকার গ্রহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮২৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসের মধ্যে এটি দ্বি-সাপ্তাহিকে (অর্থাৎ সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হয়) পরিনত হয়। স্বভাবতই সে যুগে পত্রিকা একটি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্র হয়ে ওঠে।

সাংবাদিক রূপেই ভবানীচরনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন রামমোহনের বিরোধী নন, সহযোগী। শ্রীরামপুর মিশনারীরা 'সমাচার-দর্পন' পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ায়। প্রতিবাদে ১৮২১ খ্রী. ভবানীচরন এবং রামমোহনের প্রবর্তনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা। হিন্দুসমাজের নায়ক তারাচাঁদ দত্ত ও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সহমরননের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে অভিমত প্রকাশে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। ভবানীচরন 'সম্বাদকৌমুদী' পত্রিকার সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে১৮২২ খ্রীঃ 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কালক্রমে, এই পত্রিকা হয়ে ওঠে রক্ষনশীল দলের প্রধান মুখপত্র। আবার কেবল পত্রিকা প্রকাশ নয়, রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'র বিপরীত পক্ষরূপে ভবানীচরন সনাতন হিন্দুধর্ম ও সদাচারের রক্ষাকল্পে রাধাকান্ত দেব, তারাঁদ দত্ত প্রমুখের সহায়তায় ১৮৩০ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারী 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা ছিল রামমোহনের ব্রহ্মবাদী ভাবনার প্রতিপক্ষস্বরূপ। এই প্রতিপক্ষ মনোভাব প্রগতির প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয় নি। আলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসা

বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য রচনায় এ বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষন -"সহমরন মূলেই 'সম্বাদকৌমুদী' পনের অন্যান্যরা রামমোহনের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নতুন করে হিন্দুসমাজের এক মুখপত্র (সমাচার - চন্দ্রিকা) প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবলে ভুল হবে। তাঁদের মধ্যেও আত্মসমীক্ষার আয়োজন জেগেছিল। ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়ের মতো রক্ষনশীল ব্যাক্তিটিই গিতা, মনু, ভাগবত ইত্যাদি নিজ ব্যায়ে মুদ্রিত করেছিলেন সনাতন শাস্ত্রের প্রতি এবং স্বকীয় ঐশ্বর্যেরপ্রতি স্বদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষন করবার উদ্দেশ্য। তাদের স্বধর্মে অচ্যুত থাকার সংকল্প আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, কিন্তু তার মধ্যে জাতীয়তাবোধেরও প্রধম আভাস জেগেছিল।" সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, খ্যাতনামা সাংবাদিক ভবানীচরনের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানও প্রশংসার যোগ্য ছিল। বিশপ হেবার তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেচিলেন "a tall fine looking man ..... speaking good English." সারা দেশে অবৈতনিক শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের দাবি তাঁর পত্রিকার মধ্যেই প্রথম উচ্চারিত হয়।

টিপ্পনী

ভবানীচরনের রচনাসমূহ

(ক) গদ্যরচনা ; বাবুর উপাখ্যান, শৌকিন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ, ব্রাহ্মনপন্ডিত, বৈষ্ণব ও বৈদ্যসম্বাদ, কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), হিতোপদেশ (১৮২৩), নববাবু বিলাস (১৮২৫), নববিবিবিলাস (১৮৩১), শ্রীশ্রী গয়াতীর্থবিস্তার (১৮৩১), আশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৩৫), পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা (১৮৪৪)

(খ) পদ্যরচন : দূতীবিলাস (১৮২৫)

নববাবুবিলাস (১৮২৫)

ভবানচরন বন্দোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' প্রকাশিত হয় "প্রমথনাথ শর্ম্মন" ছদ্মনামে। ছদ্মনামটি ভবানীচরন নাটটির রূপান্তর ঘটে। ভবানীচরনের রচনাগুলি শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ভদ্রসমাজের তথা নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত জীবনের এক একটি লিপিচিত্র। ব্যঙ্গধর্মী হলেও বাংলা সাহিত্যে ভাবধর্মী মৌলিক রচনার সুচনা হয় এর হাত ধরে। সমালোচক অপূর্বকুমার রায় তাঁর "উনিশ শতকের বাংলা গদ্য" গ্রন্থে লেছেন - "যে দুই একি মৌলিক এবং ভাবধর্মী রচনা সে যুগে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে দুই একটি দিগন্তে জলদর্চি রেখার মতো ভাবের সাহিত্যের (litarature of power or creative literature) আগমন সম্ভবনা আভাসিত করেছিল। ইংরেজী সাইত্যের বাস্তবতা (Social

টিপ্পনী

satire) অনুসরেন করে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের প্রথম চরনধ্বনি শোনা গিয়েছিল ভবানীচরনের 'নববাবুবিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়' -এর মধ্যে।" কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থের বিষয় প্রশ্নোত্তরেরচ্ছলে কলকাতার রীতির্ণনা। ইংরেজী শিক্ষা ও আবধারার প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে এখানে কলকাতার সমকালীন জীবনযাত্রার দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত। পরবর্তী গ্রন্থ 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে ও আচে কলকাআর বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পরিচয়।

আসলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আগে থেকেই কাছে ও দূরে বাঙালী মানুষের কাছে ইংরেজ নগরী কলকাতার খ্যাতি-মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছিল। তার কারণ আছে। একে তো গঙ্গাতীরে অবস্থান, তার উপর বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবাধ ঘাঁটি, কেরানি হিসাব-নবিসের অপর্যাপ্ত চাকরি ও অভিনব বিদ্যাপীঠে প্রবেশের অবাধ অধিকার কলকাতা নগরীকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গের কাম্যকাননে উন্নীত করেছিল। বাইরের লোক তাই কলকাতায় ঝাঁকে ঝাঁকে আসত। অধিকাংশ নবাগতই প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধায় পড়ত। কলোকাতাবাসীদের চালচলন ও কথাবার্তা শুনে সে বোকা বনে যেত। 'নববাবুবিলাস' ও নববিবিবিলাস' গ্রন্থে কলকাতা স্বন্ধে মজাদার সব ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। নববিবিবিলাস (তৃতীয় মুদ্রন ১৮৪০ খ্রীঃ) রচয়িতা বা প্রকাশকের নাম ছিল না। ভবানীচরনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত চতুর্থ ও পঞ্চম মুদ্রনে ১৮৫২ খ্রীঃ ও ১৮৫৩ খ্রীঃ গ্রন্থাকারের নাম দেওয়া হয় ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়। এ নামটিও ভবানীচরনের নামান্তর ধরা যেতে পারে।

নববাবুবিলাসের গঠন বৈচিত্র ও বিষয়বস্তু

'নববাবুবিলাস' চারখন্ডে রচিত - (১) অঙ্কুর খন্ড, (২) পল্লব খন্ড, (৩) কুসুম খন্ড, ৪) ফল খন্ড। চারটি অধ্যায় জুড়ে কলকাতার বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিচয় আছে ল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ব্যঙ্গ রচনায় কলকাতার এই বাবু বিবিধ ব্যাঙ্গের বিষয়বস্তু। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘর দলাল" (১৮৫৪-৫৮) উপর 'নববাবুবিলাসের খুব গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিষয়বস্তু হিসাবে 'বাবু'র সাক্ষাৎ পাওয়া ভবানী চরন বন্দোপাধ্যায়ের 'বাবুর উপখ্যান'-এ। ১৮২১ খ্রীঃ ফ্রেব্রুয়ারী ও জুন -এই দুই সংখ্যার 'সমাচারদর্পন' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। তখনো 'সম্বাদ কৌমুদি' বা 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয় নি। নববাবুবিলাসের সঙ্গে তুলনা করলে 'বাবু' আখ্যানটিকে ভবানীচরনের প্রথম খসড়া বলা যায়। অনুরূপ আরও দু-একটি ব্যঙ্গরচনা এসময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তারপরে

'নববাবুবিলাস' এর আবির্ভাব। মোটের উপর উনিশ শতকের প্রথম পাদের এই অশিক্ষিত বাবুরা চিন্তার কারন হয়ে উঠেছিল। ব্যাঙ্গের বিষয়ও হয়েছিল। ভবানীচরন লিখেছেন -

"মুনিয়া বুলবুল আখড়াই গান
যোস পোষাকী যশসী দান,
আড়ি ঘুরি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষন।"

এ অবশ্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পুর্বেকার চিত্র । শতাব্দীর মধ্যভাগ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন - "যে সময়ে তাহা (নববাবু বিলাস) প্রস্তুত হইয়াছল তৎকালীন বর্ণত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না।" পাদ্রি লঙ সাহেবেরও তাই মত। তিনি তাঁর 'Descriptive catalogue ১৮৫৫ খ্রীঃ) এ নববাবুবিলাসে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে লিখেছেন - "One of the ablest satires on the Calcutta Babu as he was 30years age." এই গ্রন্থের মধ্যে বাস্তববাদিতা, অসঙ্গতিময় সমাজচিত্র অঙ্কনের সৎসাহস, সরস ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নৈব্যক্তিক মনোভাব আংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভবনা জাগিয়েছিল।

১৮১৭ খ্রীঃ 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হলে নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় । তখন ভবানীচরনের মত সমাজ-কতৃপক্ষের ভয়ের কারন ও বিদ্রপের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে প্রথমে রামমোনের দল, পরে ইয়ং বেঙ্গল। কিন্তু 'বাবুর দল' কি তখন-তখানি বিলুপ্ত হয়েছিল ? 'হুতোম পেঁচার নক্সা-য় (১৮৬২ খ্রীঃ) হয়ত পুরনো দিনের বাবুর যুগের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৪ খ্রীঃ) দেখে মনে হয় শতাব্দীর মধ্যভাগেও 'বাবু'র সম্ভবনা দূর হয় নি। 'সধবার একাদশী'র অটলের কথা মনে রাখলে বুঝব স্কুল কলেজের যুগে বাবুদের কতটা রূপান্তর ঘটেছিল - ইংরেজি স্কুলে 'বাবু ক্লাশে' তাদের ভরতি হতে হয় । তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক রচনা মনে করলে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন বাবুরা কি রূপ ধারন করেছিল তাও বোঝা যায়। সাধারনভাবে মনে হয় 'তোতারাম দত্ত' দের যুগ শেষ হয়েছিল হন্দু কলেজ ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে তখন 'বাবু'র প্রাধান্য লুপ্ত হতে থাকে। শতাব্দীর দ্বিতীয়র্ধে পরাশ্রয়ী নিমচাঁদের তুলনায় অটলবিহারীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক খর্বতা অনুভব না করে পারেনি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে নায়ক কলকাতার ধনী অথচ অশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। সেকালের ধনী ব্যাক্তীদের আচার - ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধননের জন্যই গ্রন্থটিলেখা। এই গ্রন্থটি লেখার পরেই 'The Friend of India' পত্রিকায় এর আলোচনা পরকাশি হয় - "it is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as wall as its allusion and similes, are purely native, and this imparts a value to its superior to that which could be attached to a similar representation from a European Pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire and his description my therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical and though some of its strokes of ridicule my be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature . Every opportunity we have enjoy of its strokes of ridicule may be too deeply touched. We cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject had confirmed us in its justness.

'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটির বেশ কেকটি সংস্করন প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ প্রভারকের ১৮৫৭ খ্রীঃ ১১ই জুলাই এর বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় গ্রন্থটি পরে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল ল প্রকৃতপক্ষে 'কলিকাতা কমলালয়ে' -এ শহর কলকাতার সমাজ, 'নববাবুবিলাস' ম- এ কলকাতা শহরের বাবু জীবনের বিবরণ লেখকের সমকালীন অভিজ্ঞতায় পরিবেশিত হয়। 'কলিকাতা কমলালয়ে' যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল' -এর পূর্বরূপ, তেমনি 'নববাবুবিলাস' 'হুতোম প্যাঁচার নক্স'র প্রাথমিক প্রকাশ। সেই অর্থে কেবল উপন্যাস নয়। এই গ্রন্থদ্বয় থেকে বাংলা রম্যরচনারও সূত্রপাত হয়েছল বলা যায় ল এই প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণযোগ্য - "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আসিয়াছে প্রধানত সমাজের ব্যাঙ্গচিত্রের সম্প্রসারনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'নববাবুবিলা' ও ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে 'আলালের গরের দুলাল' ও 'উতোম প্যাঁচার নকশা' ভাবি উপন্যাসের পূর্বাভাসরূপে দেখা দিল।" (আংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৪৮)। বস্তু, এইভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যুগে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন, তার ফাঁপা আভিজাত্য ও রুচিবিকৃতি সহৃদয় বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হল। সেই বর্ণনায় সামাজিক চেতনার উদ্বোধন এবং স্বচ্ছ ভাষার নমুনা দেখা গেল।

নববাবুবিলাস : ব্যঙ্গ ও হাস্যরস

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার জন্ম থেকেই বাঙালী প্রায় সাহিত্য রসের রসি৯ক। আর বাংলা সংবাদপত্রের হাত ধরে বাংলা গদ্যের জন্ম হতেই গদ্যেও সে রস পরিবেশনের চেষ্টা হবে তা অনুমান করা যায়। ফোর্ট উইলিয়ামের ছাত্রপাঠ্য ভাষা-শিক্যার পুস্তক বা রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-কাশীনাথের শাস্ত্রীয় যুক্তির কচকচিতে অবশ্য রস-সৃষ্টির অবকাশ বেশি ছিল না, গদ্যভাষা তৈরি হচ্ছিল মাত্র। অন্যদিকে তর্কের প্রয়োজনেই মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন প্রভৃতিও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দুপক্ষেরই এক প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত বাঙালী সমাজে সাতধারণভাবে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি খুব বিস্তৃত হয় নি, আধুনিক জীবনাদর্শ সম্মান লাভ করেনি, গতানুগতিক রুচির স্থুলতা আধুনিকভাবে মার্জিত হতে আরম্ভ করে নি। এক কথায়, আধুনিক জীবনাদর্শ ও সাহিত্যদর্শ স্থাপিত হয়নি। অথচ সংস্কৃতের ঐতিহ্যের মধ্যে যর্থাথই ছিল। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে বা শিবায়নে তা বাঙালী হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ত্যকালীন পচন-ধারা সমাজে তা একদিকে সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ত্যকালীন পচন-ধরা সমাজে তা একদিকে সাহিত্যে পরিনত হয়েছে নারীগনের পতিনিন্দায়, সতীনের কলহ ইত্যাদিতে অন্যদিকে লৌকিক আমোদে, যাত্রায়, খেউড়ে, গোপাল ভাঁড়ের 'রসিকতায়'। এ ঐতিহ্যহি 'ঊনবিংশ শতকের রক্ষনশীলদেরও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ রচিত। তথাপি সে সম্বন্ধে প্রধান বড় কথা এই - প্রথমত : তা এই অনুবাদ ও সংকলনের ও যুগের প্রথম মৌলিক রচনার প্রয়াস। দ্বিতীয়ত। তা এই নিছক ও প্রায় নীরস গদ্যরচনার যুগের একমাত্র সরস রচনার প্রয়াস ল এ চেষ্টায় একজন লেখকই স্মরনীয় - ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে স্যাটায়ার বলতে কিছু ছিল না। ছিল উপহাস স্যাটায়ার সৃষ্ট হল শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে, সাময়িক পত্র প্রকাশিত ব্যঙ্গ কবিতায় এবং ভবানীচরন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী চিন্তাশীল ও কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তিনি আমোদপ্রিয় হাস্যরসিক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। সেখানে তাঁর নিতি ও আদর্শ ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সেই নীতি ও আদর্শ হাসির আনন্দদীপ্তীর মাঝে প্রচ্ছন্ন, সেখানেও তাঁর হাতে শাসনের বেতটি ধরা আছে সত্য, কিন্তু সেই বেতটি খুশীর রঙে রাঙানো, তা নেড়ে চেড়ে দেখতেও সুখ আছে।

ভবানীচরন রুচিমান, নীতিপরায়ন ব্যক্িতি ছিলেন বটে, কিন্তু সেই রুচি ও নীতির অনুরোধে তিনি সাহিত্য-সত্য বিসর্জন দিতে চান নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা ও তার পাশ্ববর্ত অঞ্চলে বাঙালী সমাজের কোন কোন লোক ইংরেজের অধনে

টিপ্পনী

নান প্রকার বৃত্তি ও ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করে এক নতুন ধনশীল শ্রেনিরূপে সমাজের মধ্যে উদ্ভুত হয়েচিল। পুরাতন বনেদী জমিদার শ্রেনীর প্রাব প্রতিপত্তি কমিয়ে তারাই অকস্মাৎ ভুঁইফোঁড় হঠাৎ - বড়লোক হয়ে সমাজের মধ্যে জাঁকিয়ে বসল। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে এদের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক -

> এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এসে স্বর্নকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পঠকর মঠকর বেতনোপভুক হয়ে কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াদারি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমনীয় সংঘটনকামি ভাঁড়ামি ও রাস্তাবৃন্দ দাস্য দৌত গীতবাদ্যতৎপর হিয়া কিংবা পৌরহত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াবীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।"

এইসব ধনাঢ্য লোকেদের শুধু কেবল ধন-ঐশ্বর্যই ছিল, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা সুনীতি ও আদর্শের কোন বালাই ছিল না। সেজন্য এদের প্রভাবে তখন সমাজের গতি নিম্ন ও বিকৃত পথেই চালিত হয়েচিল। এদেদর পুত্র ও পোষ্যরা বিনা ক্লেশে অপরিমিত ধনসম্পদ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রশ্রয় পেয়ে বিলাস ব্যসনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করিয়া সমাজের মধ্যে বাবু আখ্যা লাভ করল। এদের নিস্কর্মা নীতিহীন জীবন একটা গ্লানিকর ব্যাধির মত সমাজকে দূষিত ও দুর্বল করে তুলেছিল। এই সব বাবুদের খোসামুদে মোসাহেব, ইয়ার, দালাল ইত্যাদি লোক নীচ পরামর্শ ও কলুষিত আচরনের দ্বারা সমাজের মধ্যে অন্যায় ও পাপের গতি অবারিত করে দিয়েছিল। প্রাচীন সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রন তখন শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন সমাজের উন্নত বলিষঠ আর্শ তখনও স্থাপিত হয় নি। অসৎ ও অসঙ্গত উপায়ে ধন উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানের নির্মল আলোক বুদ্ধির পরীশীলতা দীপ্তি ও চিন্তার ঋজু প্রসন্ন মুক্তি তখনও আসেনি। সেই সময় শুধু যে পুরুষদের মধ্যেই এই ব্যাপক দুর্নীতি ও দুরাচার সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। অন্তঃপুরের মেয়েরাও গোপনে তাদের অবদমিত ইচ্ছা ও লালসা অবাধ প্রশ্রয় দিবে চলত। তাদেরকে সম্ভোগের আশায় প্রলুব্ধ করে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবার জন্য দূতী ও কুটনীর অভাবও সমাজে ছিল না। ভিতর ও বা্রের এই সর্বাঙ্গীন রুচিহীন নীতিভ্রষ্টতার সমাজচিত্রই ভবানীচরন নির্বিকার বাস্তববোধ ও অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে আঁকলেন। তিনি যে বাবু সমাজের চরিত্র উদঘাটন করলেন তা নিয়েই পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাবু' নামক পরবন্ধ রচনা করেছেন। গল্পকাহিনীকে পদ্য থেকে গদ্যের মধ্যে স্থানান্তরিত করে

ভবানীচরন যে নতুন সাহিত্য রীতি প্রবর্তন করলেন তাই পরে সার্থক উপন্যাসের জন্মদান করেছিল ল এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথবন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। 'দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী' বইয়ে 'নববাবুবিলাসের ভুমিকে' অংশে তিনি বলেছেন - "প্রকৃত প্রস্তাবে নববাবুবিলাসই যে আংলা ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন তাআ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" অবশ্য ভবানীচরনের রচনায় পূর্বতন পদ্যরীতি যে একেবারেই বর্জিত হয়েছিল তা নয়। 'নববাবুবিলাস' গরন্থে স্থানে স্থানে পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ রয়েছে। 'নববাবুবিলাস' সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। আর 'দূতবিলাস' গ্রন্থটি তো সম্পর্ন পদ্যছন্দএই লিইত। শুধু কেবল ছন্দের দিক দিয়ে নয়, অলঙ্কার ও বাক্য প্রেয়োগের দিক দিয়েও তাঁর রচনা পদ্যরীতির যথেষ্ঠ প্রাব লক্ষ্য করা যায়।

ভবানীচরনের 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে পূর্বপর সামঞ্জস্যপূর্ন, সুনিদির্ষ্ট গল্পকাহিনী আছে।'কলিকাতা কমলালয়ে' 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র মত বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে । তবে 'দূতীবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে 'নববাবুবিলাস' এর মত একটি গল্পকাহিনী লক্ষ্য করা যায় । ভবানীচরনের কাহিনীমূলক গ্রন্থগুলিতে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য সপষ্ট বলে কাহিনীর সরল ভঙ্গী ও জটিল গ্রন্থনের দিকে লেখক দৃষ্টি দেন নি । সমাজের এক একটি বাস্তব অংশ এবং কোন কোন টাইপ চরিত্র লেখকের ঝলকিত ব্যঙ্গ - বিদ্রুপের আলোকে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ভানীচরনের রচনায় যে রঙ্গরসের উপাদান আছে তা বাক্য ও ঘটনায় আধারে নিহিত নেই, তা চরিত্রকে আশ্রয় করে আছে। বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় সর্বপ্রথম পৌরানিক কাহিনী বহির্ভূত বিচিত্র বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে রসসৃষ্টি করবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হল। অবশ্য সুস্থ, স্বাভাবিক সুজন চরিত্র তিনি বেশি অঙ্কন করেন নি। যা উদ্ভট, অসঙ্গত, বিদঘুটে ও বিসদৃশ্য তাতেই তিনি একেবারে হুলের খোঁচা আর একবার মধুর প্রলেপ দিয়েছেন। সেজন্যই কুটনী, নাপতিনী, মুর্খ ওস্তাদ, খোসামুদে ইয়ার, ভন্ড দালাল, প্রাচীন লোচ্চা ও বৃদ্ধা বেশ্যা চরত্র লইয়াই তাঁর কারবার।

ভবানীচরনের হাস্যরস ব্যঙ্গমিশ্রিত একথা সত্য, কিন্তু সর্বত্রই যে তিনি ব্যাঙ্গের কশাটি উদ্যত করে রয়েছেন তা নয়। 'নববাবুবিলাস' - এ লেখকের বিদ্রুপধর্মিতাই প্রধান হয়ে উঠেছে তা ঠিক, কিন্তু এই বিদ্রুপ নির্মম ও ক্ষমাহীন নয়, এর দায় হাসির বাষ্পকে একেবারে শুষ্ক করে ফেলে নি। সংস্কার ও শোধন লেখকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু একথা তিনি ভুলে যান নি যে, তিনি শিক্ষক নন, শাসানো থেকে রসানোর দিকেই অধিক নজর দেওয়া তাঁর ধর্ম।

চরিত্র চিত্রনে লেখক যে অভিনব মৌলিকতা এবং অদ্ভুত উদ্ভাবনী কৌশলের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিচয় দিয়েচেন তা দেখে বিশেষ কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে আবার তুচ্ছ ও হেয় বিষয় পদ্যচ্ছন্দে বিবৃত করে অথবা নানা গুরুগম্ভীর গুন ও মহিমা দ্বারা অলঙ্কৃত করে কৌতুকরসের প্রাবন্য এনেএন। 'নববাবুবিলাসে' নববাবুদের লক্ষন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন -

মুনিয়া বুলবুল আখড়াই গান
ঘোষ পোষাকী, যশমী দান,
আড়িবুড়ি কানন ভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষন।

কবি যখন লুচ্চদের বৃত্তান্ত দিয়েছেন তকন তাতে তাঁর নীতি ও উদ্দেশের উদ্দেশ্য মোটেই পরিস্ফুট নেই। তখন পরিহাসপ্রিয়, রঙ্গরসিক মনটি তিনি এলে ধরেছেন। সেই বৃত্তান্ত থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল -

লোকে যারে বলে লুচ্চ সে কেবল জানিবা কুচ্ছ
লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই।
মারে মন্ডা আদা ছেনা সদা থাকে বাবু আনা
সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই।।
মাত, পিতা, দাদা, ভাই কাহার তোয়াক্কা নাই
দুঃখী নাহি হয় কার দুখে
কেহ যদি কটু বলে, সে কথা না গায়ে তোলে
সর্বদা সরল কথা মুখে।।

বৃদ্ধা বেশ্যাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক এমন সম্মানবাচক ও সমাসবদ্ধ বিশেষন প্রয়োগ করেছেন যে তা অত্যন্ত কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। যেমন -

"তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসা গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা রতিপন্ডিতা বহুমানিতা মধুবভাষিনী নিবিড়নিতম্বিনী বারাঙ্গনাপ্রধানা বকনাপেয়ারি কোঁকড়া পেয়ারী দামড়াগোপী কানঝাড় রাধামনি ছাড়ুখাগি মনি জয়াবিধি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিনী অর্থাৎ ছুকরি সঙ্গে লইয়া খলিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন।"

বিচিত্র ব্যাক্তি ও বস্তুর বর্ণনা একহি সঙ্গে যদি আতিশয্যপূর্ণভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তবে তা হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠে, এই আতিশয্যজনিত হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা লেখকের রচনার অনেক জায়গায় দেখা যায়। নিমন্ত্রিত ইবিদের আহার ও বিহার নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন লেখক তার 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে।

লোকচরিত্র সম্বন্ধে লেখক ভবানিচরন বন্দোপাধ্যায় অভিজ্ঞতা যেমন ব্যপক, বর্ণনান ক্ষমতা তেমনি নিখুঁত ও রঙ্গরসাত্মক। 'দূতীবিলাস' গ্রন্থে বিভিন্ন দূতীর বর্ণনা অথবা 'নববাবুবিলাস' গরন্থে বিচিত্র ওস্তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রনে লেখকের সামাজিক চরিত্রেঙ্কননে অদ্ভুত কুশলতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় লেখকের কোন নৈতিক উদ্দেশ্য নেই, কোন ঘটনার পরিনতিদানে ও যেন আগ্রহ নেই, কেবোল রঙ্গরসের আসরে কয়েকজন উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র এে তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করাই যেন তার আসল উদ্দেশ্য। 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাসে' দীর্ঘ বর্ণনা করবার সময় লেখক ভুলে গেছেন যে কাহিনীর গতি শিথিল হয়ে গেছে। তিনি বেশ রয়ে সহে, সাজিয়া রসিয়ে একটার পর একটা অদ্ভুত চরিত্রকে এনে অনর্গলিত কৌতুকের পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রথম ওস্তাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। হয়ত এই ওস্তাদের চরিত্রটি থেকে দীনবন্ধু মিত্র তগাঁর রামমানিক চিত্রের প্ররনা পেয়েছিলেন কিনা। ভবানীচরন লিখেছেন-

> "ওস্তাদমধ্যে এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকার; প্রেতের ন্যায় সকল প্রকার উপরে গন্ডগোল, মধ্যে লবিকার, পায়ে গোদ, অতি চমৎকারী ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান।"

নির্বাচিত গায়কের স্বভাবে বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা এবং রসাল বাক্যের ফুলঝুরি একটু দেওয়া যায়-

> "হাফকাঠ গায়কবেটা, অতি ঠেঁটা, বাক্যে জেটা, কর্মে খোঁটা, টিকি কাটা, গোঁফ ছাটা, কথা ঝুটা, নজর ছোট, পাতড়া চাটা, সর্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপেয়পানে মূর্তিমন্ড এক অধর্ম, নীচ কর্ম তাহার স্বধর্ম, চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাড়ামী ঠকামী বদনামী কোঠনামীতে অদ্বিতীয়, কিন্তু আপন বিষয় ভোলে না, তত্ত্বকথা ছেড়ে না।"

এই বর্ণনার মধ্যে লেখকের অসহিষ্ণু উষ্মা হয়তো একটু রয়েছে, কিন্তু পড়তে

টিপ্পনী

পড়তে মনে হয় লেখক যেন তাঁর অনিঃশেষ তূন থেকে অবিরাম কথার বান নিক্ষেপ করে চলেছেন, সেই বানসমূহের চমক ও ঝঙ্কার দিয়ে আমাদের চোখে কানে তাক ও তালা লাগিএ দিয়ে যেন তাঁর তৃপ্তি।

অযোগ্যতা, ভন্ডামি, প্রতারনা ইতাদির প্রতি ভবানীচরন অতিশয় বিরক্ত ছিলেন, সেজন্য সুযোগ পেলেই তিনি বিদ্রুপের খোঁচায় বিদ্ধ করে তাদের স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন। কত বোট আপিসের মাঝি এলেমদার মন্ত্রী হয়ে বসে, কত মুরগীর ডিম সরবরহকারী ওস্তাদ সেজে গান শেখাতে আসে সে সব লেখকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ভানচরন বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় কলকাতার অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান ও লোক চরিত্রের মিথ্যাচার ও কপটতাই তাঁর বক্রদৃষ্টির সূক্ষ্ম খোঁচায় বিদ্ধ হয়েছে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে বই সাজানো থাকে। কেউ সেগুলি পড়েও দেখে না, ধরে ও না। পরম যত্নে সেগুলি তাকে সাজানো থাকে। বইয়ে আদরের মধ্যে বিদ্যার অনাদরকে প্রত্যক্ষ করে লেখক বিদ্রুপ বর্ষন করেছেন। 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা যেএ পারে -

> "বাবু সকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবী কেআব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেনী পূর্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপে ওও এমত সোনার হল রিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেরও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হয়েছে অন্য পারের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ভাল আমি কারণ জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহারা কারন কি ইআমি পাড়াগেয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নান প্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাআর ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরসয্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ করেন না।"

নকশা হিসাবে নববাবুবিলাসের গতিপ্রকৃতি

টিপ্পনী

ধনীর মূর্খ ও উচ্ছৃঙ্খল সন্তান কিভাবে আপন কর্মের ফল ভোগ করে, তার উদাহরন হিসেবে নববাবুবিলাস লেখা। গদ্য সাহিত্যর সেই অপরিণতির যুগে তাকে ব্যাঙ্গাশ্রয়ী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন ভবানীচরন। গদ্য রচনা যখন মনের ভাব প্রকাশেই বেসমাল, তখন তিনি তাকে কতকটা স্বাদু বস্তুতে পরিণত করেছিলেন এবং একারণেই সাহিত্যস্রষ্টার পদবীতে তাঁর দাবি আছে। বাংলা ব্যঙ্গ নক্শার তিনিই লেখক।

ভবানীচরন অবশ্য য়ুরোপে প্রচলিত কোনো সাহিত্যরূপের কথা স্ঞরণ করে বাংলা ভাষায় সদৃশ কিছু লেখার কথা হয়ত সচেতনভাবে ভাবেননি ঔ। উপন্যাস-জাতীয় কোনো বীশিষ্ট সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে তাঁর রকম ধারনা ছিল বলে মনে হয় না। আসলে তিনি সমকালীন বাঙালির সমাজজীবনের ছবি আঁকতে চেয়েচিলেন । নববাবুবিলাস ও নববিবিবিলাস দুটি গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রেই সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য কিছুটা কাজ করেছে। প্রথম গ্রন্থে খোশামুদে মোসাহেবদেদর যুকতি, বারবনিতার ছলনা, সহজ ইন্দ্রিয় সুখের মত্ততা থেকে তিনি নব্যবাবুদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন । দ্বিতীয় গ্রন্থে বারাঙ্গনার জীবনের করুন পরিণতি দেখিয়ে সুখলোভী গৃহস্থ কন্যাদের কুটনী ও লম্পটদের সম্পর্কে সতর্ক করার ইচ্ছা তার ছিল। অর্থাৎ আলোচ্য বই দুটিতে (১) সমাজের বাস্তব রূপ, বিশেষত শ্রেনীবিশেষের বিকারগ্রস্থ জীবনের চিত্র, (২) সংস্কার উদ্দেশ্য (৩) ব্যাঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গি সমন্বিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে নেওয়ায় জনৈক নব্যবাবুর ও এক নব্যবিবির ব্যাক্তিগত জবন বৃত্ত লেখার মধ্যে এসে গেছে ল তার ফলে ব্যঙ্গ-নকশা ব্যঙ্গ কাহিনির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। নকশার চেহারাটা মুছে যায় নি, কিন্তু তার মধ্যে গল্পের একটা রূপ অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এই সূত্রে নকশা জাতীয় সমাজ চিত্র এবং সামাজিক কাহিনীর মধ্যের পার্থক্য চিনে নেওয়া যেতে পারে-

টিপ্পনী

নকশা	কাহিনী
১। সাধারনভাবে সামাজিক অবস্থার বিবরণ।	১। কোন বিশেষ অর্থাৎ সুনির্দষ্ট ঘটনা বা একাধক সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ।
২। সমাজের কোনো রূপ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য চিত্রধর্মী বর্ণনার প্রাধান্য।	২। বিশিষ্ট ঘটনাট জবন্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে বা ঘটনার ক্রমবিকাশ সূত্রে বর্ণনা - চিত্রের ব্যবহার।
৩। আলোচ্য সমসভাটির একট নির্বিশেষ রূপ অর্থাৎ সমাজ-ক্ষেত্রে তার সর্বজনীনতাই লক্ষ্য। যেমন, ধরা যাক বিধবা বিবাহ একটি সমস্যা।	৩। সমস্যাট বিশেষ পাত্রপাত্রীর জীবনে আরোপিত, ঘটনাধারায় আবর্তিত এবং ক্রমিক পরিনতমুখী যেমন, কুন্দনন্দিনী নামে একজন বিধবার বিবাহ সমস্যা।
৪। নরনারীর উল্লেখ থাকলেও তারা প্রদত্ত বিবরন বা চিত্রর সহায়ক মাত্র ল তারা শ্রেনিবিশেষের প্রতিনিধি, রক্তমাংসে পুষ্ট ব্যাক্তিত্ব নয়।	৪। বিশেষ বিশেষ পাত্রপাত্রীই কাহিনীর প্রধান অবলম্বন । ঘটনাধারা তাদের জীবনাশ্রয়ী অভিতূ নয়, প্রানবন্ত এবং ব্যক্তিলক্ষনাক্রান্ত।

এই পার্থক্য দেখিয়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে না যে ঔপন্যাসিক সামাজিক নকশাকে উপাদানরূপে ব্যবহার করতে পারেন না। বরং উল্টেটাই সত্য। কিন্তু তা সামাজিক চিত্ররূপেপটভূমি নির্মান করবে বা কাহিনীর বা ব্যাক্তিপ্রধান অংশকে সমাজব্যাপী বিস্তার দিতে সাহায্য করবে আর কেন্দ্রে থাকবে মানুষের ব্যাক্তিগত চরিত্র -স্বাতন্ত্র্য তবেই তা উপন্যাসের অংশ হবে।

নববাবুবিলাস এবং নববিবিবিলাস এই দুই বইয়ের মধ্যে কতক কাহিনীধর্ম এসেছে, যদিও তা বিকশিত হয়ে উপন্যাসোচিত পুর্ন রূপ লাভ করে নি । আমাকদের আলোচ্য নববাবুবিলাস বিশ্লেষন করলেই নক্শা ও কউপন্যাসের আনুপাতিক বিশিষ্টতা কোথাব কতটা আছে পরিচয় পাওয়া যাবে।

'নববাবুবিলাস' পুরান মঙ্গলকাব্যাদির ঢঙে পয়ার ছন্দে লেখা গনপতি সরস্বতী প্রভৃতির বন্দনা দিয়ে আরম্ভ। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদে একটি ভূমিকায় লেখক আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পরে মূলগ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে ল সতর্ক শিল্পীর মতো রচনাটিকে চারটি খন্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে । যেমন - অঙ্গুর খন্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের কুসুম, ফলখন্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের ফল। উপসংহার হিসেবে ত্রিপদী ছন্দে 'অর্থ জ্ঞান উপদেশ' শীর্ষক একটি গদ্য যুক্ত

হয়েছে। খন্ডগুলি মেস্টরের বৃত্তেন্ত। এরূপ শিরোনামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লেখক বেশ সুশৃঙ্খলভাবে প্রসঙ্গগুলি সাজিয়েছেন। গদ্য বিবরনের মাঝে মাঝে পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে বেশ কিছু পদ্য ব্যবহারে কিছুটা শিল্পবোধ হয়তো কাজ করেছে। একালের পাঠক ঐ জাতীয় পয়ার ত্রিপদীর মামুলি পদ্যে কোনোরূপ চিত্তচাঞ্চল্য আর অনুভব করে না, কিন্তু সেকালের পাঠকেরা পুরানো কাব্য-আবেদন ছাড়িয়ে উঠে আসতে পারেনি, তাদের কাছে এ জাতীয় প্রয়োগ সম্পূর্ন ব্যর্থ ছিল না।

নববাবুবিলাসে কলকাতাবাসি এক ধনীর পুত্রে বিশেষের কথা বলা হয়েছে। প্রথমেই এই হঠাৎ ধনী সম্প্রদায় কিউপায়ে অর্থবান হয়ে উঠেছে তার কিঞ্চিৎ বিবরন আছে। যেমন-

> "ধন্য ধন ধার্ম্মিক ধম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুটনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানীবাহাদুর অধিক হতনের অনেক পন্থা করিয়েছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্নকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পঠকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমনী সংঘটন কামি ভাঁড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত গিত-বাদ্যতৎপর হইয়া পোরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যাভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন.....।"

অর্থনৈতিক অন্তদৃষ্টি এক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক বিবরনের রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। কোনো ব্যাক্তিবিশেষের ধনী হয়ে ওঠার কাহিনী এ নয়, একটা শ্রেনীভুক্ত নানা মানুষের নানা পথে আর্থিক সমুন্নতির এই পরিচয় নায়কের পিতার পটভূমিরূপে বিবেচিত হতে পারে। সম্প্রদায়-ঘটিত সামগ্রিক রূপেখা উপনব্যাসের যোগ্য ভূমিকা হয়ে ওঠায় বাধা কোথাও নেই। এ বইয়া উক্ত ব্যাক্তি এই শ্রেনীর মধ্য থেকে সম্পূর্ন সামনে বেরিএ এসেছে এমন কথা বলা যায় না। আবার বাহুজনের মধ্যে মিশে আত্মলুপ্তি ঘটিয়েছে তাও মানা চলে না। যদিও তার নাম কি ? ঠিক বলা যায় না, তোতারাম দত্ত হলেও হতে পারে , না হবারই সম্ভবনা পুত্রদের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"ইংরেজী ভাষাতে কোন লোক জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারনপূর্বক উত্তর করেন যথা, তোমার পিতার নাম কি , টোটারাম ডট্ট অর্থাৎ তোতারাম দত্ত।"

এটা হইতা একটা উদাহরণ ওয়া সম্ভব। কারন লেখক একে কর্তা বলেই উল্লেখ করেছেন। একবার মহাজনের কাছে নববাবুর পরিচয় দিতে দালালেরা বলেছিলেন-

"এক্ষে ও সকল কথার প্রয়োজন নাই, আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই, ইহার নাম জগদ্দুর্লভ বাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ, হরেক রকম সওদাগারি আচে বেলেঘাটায় চুনের গোলা, জকসনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটতে মুটের সরদারি প্রায় দুইলক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক।"

দালালদের কথা যে ঠিক মহাজন তার ফর্দ মিলিয়ে দেখে নিল। তাই কর্তার নাম রামগঙ্গা নাগ এবং নববাবুর নাম জগদ্দুর্লভ হবার সম্ভাবনা এশি। তবুও আমাদেদর সংশয় ঘোছে না। কারণ গল্পের মধ্যে এই নামগুলির ব্যবহার নেই। ব্যাক্তিনামের ব্যবহার - স্বল্পতার একটা বড়ো কারণ লেখকের দিক থেকে চরিত্রগুলিকে তাদেদর ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপলব্ধি না করে শ্রেনী প্রতিনিধিরূপে মাত্র মনে করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই ইট লেখা। লেখক হিসেবে এবং চিন্তাবিদ্ হিসেবে এর মধ্যে ভবানীচরনের মনের গঠন একটা সিনির্দষ্ট ভিত্তি লাভ করেছে। এই সময় পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য মননের সঙ্গে কম বাঙ্গালিরই পর্যাপ্ত পরিচয় ঘটেছিল, ফলে ব্যাক্তিসআতন্ত্র্য নামক রহস্যময় চরিত্র সত্য এবং তার গুরুত্ব সাধারণভাবে অবহত থাকার কথা নয়।

ভবানীচরন কর্তার পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার বিবরনে তৎকালীন বাংলা ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষার প্রণালী এবং শিক্ষা-ব্যবসায়দের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে বিদ্রুপের তীব্র রঙ লেগে। কিন্তু বাস্তব-ভিত্তিটিও দুর্নিরীক্ষ নয়। এই অংশগুলি অবহশ্য নকশাধর্মী রচনা। কর্তার পুত্রদের যে পরিমান বিদ্যা অর্জিত হল তার মধ্যেও এই শ্রেনীভুতদের প্রতি সরাসরি ব্যাঙ্গের ইঙ্গিতটাও প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এইসব বিবরণের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ নববাবু ধীরে ধীরে সামনে বেরিয়ে আসে। অনেক চেষ্টায়ও তার বিদ্যা স্থানে কিছুই জমা পড়েনি। চতুর খোসামুদে খলিপার বাক্যচ্ছটায় যে মুগ্ধপ্রান, হিতাহিত - বিবেচনা শূন্য। মহাজনের কাছে ঋন করে বেশ্যাসঙ্গ-মদোৎসব ও সংশ্লিষ্ট বিচিত্র আমোদে সে আপনাকে ভাসিয়ে দেয়। দালালেরা যে তাকে 'অভাগা অজা' বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। দুহাজার টাকার খত সই

করে সে পাঁচশ টাকা কর্জ দিল এবং পরমোদের এক বিপুল আয়িজন ফাঁদল। এখানে বারাঙ্গনা-বিলাস এবং পান ভোজনের বিচিত্র মজার এক দীর্ঘ বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন। এই ছবি নকশারূপেই অভিহিত হবার যোগ্য, কারণ লেখক সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের, বিশেষত কাহিনীর নায়ককে এই বিবরণে আকাকার করে মিশিয়ে হারিএ ফেলেছেন। ক্রিয়ায় বা মনোভাবে স্বতন্ত্র করে চেনার উপায় রাখেন নি। সেরূপ ঘটলে চিত্রকে আর নকশাধর্মী বলার উপায় থাকত না, উপন্যাসের সঙ্গে বর্ণনা ওতপ্রোত হয়ে যেত। নাহলেকও লেখক ভাষার ভঙ্গিতে যে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য, সময়ের কথা মনে রাখলে আরও বেশি। যেমন-

> "তৎপর নানাবিধ মসলা সম্বলিত তাম্বুল ভোজন অনন্তর নানা প্রকার তামাকের আয়োজন কড়া দোক্তা ভেল্‌সা অম্বরি গাঁজা খায় কেহ চরস খায় কেহ বলে হাফ হায় কেহ নৃত্য করে কেহ তাড় মারে কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে এহ খেলিছে কেহ দুলিছে কেহ পড়িছে কেহ বলে বড় মজা ও হে বাবু তুমি এয়ারের রাজা....."

রচনার কৌশলে আমোদমত্ততা ঈন্ত হয়ে উঠেছে, সংবাদমাত্র না থেকে পাঠকাচিত্তে অভিপ্রেত ভাবের ঢেউ তুলেছে। ঔপন্যাসিকের একটা প্রধান দায়ত্ব ভাষাকে স্বাদু করা। নিত্য প্রোজনে ব্যবহৃত গদকে ভাব সঞ্চারণে নিয়োগ করা। সেদিক থেকেও ভবানীচরনের সফলতা অনেকখানি । যে গদ্য বিষয় প্রকাশেই (১৮২৩ সালে) ছিল পঙ্গু তাকে ভাবের আবেগে তরঙ্গিত করে তোলা বা ব্যাঙ্গের ঝাঁজে কটু করার শক্তি তিনি দেখিয়েছেন।

নায়ক নববাবুর বিবিধব্যবসায়ে অর্থনাশের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাতে নায়ের নিবুদ্ধিতা অকর্মন্যতা এবং বড়মানুষ দেখাবার প্রণতা, নিজের মিথ্যা গৌরব জাহির করার ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সময় লেখক একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গরূপো এ গন্য হবে। সেখানে ঐ সমাজের অন্তপুর জীবনের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাতে উপন্যাস ধর্ম স্খলিত হয় না, কারন বাক্তি মানুষের জূবনের অনেক ঘটনাই তো তার শ্রেনীজীবন থেকে আসে। অর্থাভাব ঘটায় বাবু স্ত্রীর কাছে নতুন করে তৈরী করে দেবার ছলনায় পাঁচনরী হারটি চাইল।

> "তিনি কহিলান (অর্থাৎ গৃহনী) আমি বুঝিয়াছি তোমার বড়ই টাকার দরকার হইয়াছে। কিন্তু সব দিতে পারি যদি তুমি সকলের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সাক্ষাতে বল যে আমি অদ্য দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিতেছে। নববাবু কহিলেন তাহার আটক কি একথা আমি সকলকেই সর্বদা কহিব তুমি টাকা দেও।"

কাহিনীর সমাপ্তি অংশ খুব দ্রুত তালে বলা হয়েছে। দেনার দায়ে বাবুর কয়েদ - খাটা ; সব টাকা শোধ দিয়ে কর্তার পুত্রকে খালাস করে আনা। খালাস হয়েই বাবুর আবার বেশ্যালয়-গমন। অর্থাভাব এতু সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া। পরিশেষে কর্তার মৃত্যুতে গচ্ছিত সম্পত্তির মালিকি হয়ে এক বাড়ি তৈরি করতে প্রায় ফতুর হওয়া এবং অবশিষ্ট যৎসামান্য অর্থ দয়ে পাঁচকন্যার বিবাহ দিয়ে (হা বিধাতা একদিবস স্ত্রীর সহিত আস করিলা না তথাপি আমার হলো যাতনা - বাবুর উক্তি) সর্বস্বান্ত হওয়া। কাহিনীর শেষাংশ সুত্রাকারে বিবৃত। ফলে উদ্দেশ্যমূলকতা বেশি স্পষ্ট, তবে নববাবুর স্বভাবে অর্থাৎ তার চাতুর্যহনতায়, যেটা নিবুর্দ্ধিতার সমতুল্য এবং ইন্দ্রিয়সুখের চরম নির্বিবেক তাড়নায়, ব্যাক্তিহীনতায় এর পূর্ন সম্ভবনা ছিল। খলিপা-মহাজনের চক্রান্তে অজস্বরূপ তার আত্মসমর্পনের ঘটনায় এই পরিনতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তবুও এই পরিনতিকে যথেষ্ট উপভোগ্য এবং আদর্শের অঙ্কুশমুক্ত করে তোলার জন্য ঘটনাধারার কিঞ্চিৎ বিস্তারে প্রয়োজন ছিল।

নববাবুবিলাসের কর্তামশায় এবং খলিপা অভিধাযুক্ত সুরবাবু চরিত্র হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কর্তা অর্থাৎ রামগঙ্গা নাগ চুনের গোলা, চটের থলের ব্যবসা এবং মুটের সরদারি করে বঙো লোক হয়েছে। "এ লোক কখন আদালত দেখে নাই এবং উকিল কৌনসলী কি কর্ম করে তাহা জ্ঞাত নহে।" রামগঙ্গা খোসামুদেদর দ্বারা পরিবেশিত এবং অশিক্ষিত হলেও ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তর আয়োজন করেচিল । পুত্রের প্রতি অত্যাধিক স্নেহ তার একাধিক কার্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হয়ে রামগঙ্গা নাগকে একটি ব্যাক্তিত্ব দান করেছে। খলিপা দুষ্টমতি ব্যাক্তি। গল্পের ভিলেনরূপে কর্তাকে চিহ্নিত করা যায়ন। নবকুমারকে অবাধ লাম্পট্যের পথ সে নিয়ে গিএছে, সহজ ঋনলাভের পথ দেখিয়েছে বিপদ স্তোক দিয়েছে, গ্রেপ্তার হার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে মধ ফুরিয়েছে জেনে উড়ে পালিয়েছে। কিন্তু নববাবুর সর্বনাশের দ্বারা সে নিজে লাভবান হয় নি হতে চায় নি। দালাল দু জনের মতো ঠকিয়ে অর্থোপার্জন তার উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রন্থমধ্যে কোথাও সেরূপ ইঙ্গিত নেই। সম্ভবত ধনী যুবকের ইয়াররূপ নানা মজা উপভোগ এবং সেই মূর্খ ধনী যুবককে নিজের আঙ্গুলের চারিদিকে যদৃচ্ছ ঘোরানো ার প্রধান ব্যসন ছিল। এককালে সেও ধনী ছিল। লাম্পট্যে সর্বস্ব হারিয়েছে। সেজন্য তার অনুশোচনা নেই, দুঃখও নেই। এক ধরনের উল্লাস আছে। তার নিজের ভাষায়-

" দেখ আমার পিতা ৪/৫ লক্ষ টাকা রাখয়া গিয়াছিলেন তাহা আমি কেবল বাইনাচ ও বাইসঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি। তৎপর ঐ সকল রাজাদিগের নিকটে যখন যাহা পাইয়াছি তাহাও ঐ বাই ও বেশ্যা দিগকে অর্পন করিযাছি। এক্ষনে কড়া কপর্দ্দকও নাই।"

কলকাতায় বহ নববাবুকে বাবুগিরি শিখিয়ে বহু প্রাচীন বাবুর সহচর্য করে সে খলিপা নাম পেয়েছে। লাম্পট্যের একটা দর্শন সে আবিষ্কার করেছে এবং যুক্তির ধারালো তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে গৃহস্থের রীতিনীতিকে আঘাত করে ভোগ পন্থার গুন গেয়ে যেন ভোগের সদৃশ আনন্দ পায়। তার একটি যুক্তি উদ্ধৃত করা হল -

" শ্রী শ্রীপরম দয়াল তিনি তাবৎ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। দেখ হস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার করিতেছে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে তাহাতে লোক পরম সুখী হহিতেছে ইহাতে কি পাপ হিয়া থাকে আর যাহা দিগের পর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ কর, অল্প তপস্যায় উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ হয় না, যদি বেশ্যা গমনে পাপ আকত তবে কি উর্বশী, মেনকা, রামরম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত।"

সুরবাবু ওরফে খলিপাকে নববাবুর জীবনে শনি মনে করা যেতে পারে - কিন্তু মামুলী ভিলেন নয় সে, একটা বিকৃত জীবদর্শের সে যুগপৎ ভোক্তা ও দর্শক। বাংলা গল্পসাহিত্যে বিকশিত হয়ে ওঠার আগে এরূপ চরিত্র সৃষ্টি ভবানীচরণের কৃতিত্ব বলে গণ হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য - দীনেশচন্দ্র সেন।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) - সুকুমার সেন।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দতে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস - চারু বন্দোপাধ্যায়।

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্য - মোহিতলাল মজুমদার।

৫। বঙ্গভাষার লেখক - হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

টিপ্পনী

৬। সাহিত্য সাধক চরিতমালা - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৭। নববাবুবিলাস - ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়।

প্রশ্নাবলী

১। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের কোন ছবি ফুটে উঠেছে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে লেখকের রঙ্গব্যঙ্গ ও হাস্যপরিহাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্লেষন কর।

৩। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যসাহত্যের ইতিহাদে নকশা হিসাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। ভবানীচরন 'নববাবুবিলাস' রচনার মধ্য দিয়ে কলিকাতার ধনী মহলের অনাচার - কদাচার উদঘাটন করিতে ব্যগ্র ছিলেন" - মন্তব্যটির যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

টিপ্পনী

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ খ্রীঃ - ১৮৭৩ খ্রীঃ)

শেক্সপীয়ার তাঁর সমকালীন নাট্যকার ক্রেস্টেফার মার্লোর বহু নাটক থেকে ভাব আহরণ করে যেমন এলজজাবেথীয় যুগের বিশ্ববন্দিত নাট্যকাররূপে নন্দিত হয়েছেন। দীনব্ধু মিত্র তেমনি অগ্রবর্তী মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও মাইকেলী যুগের শ্রেষ্ট নাটকার রূপে হয়েছেন বন্দিত। এবং মহাকাব্যোচিত মহিমা ও দেশবিদেশের ধ্রুপদী পরানিক ভাবাসঙ্গের নেপথ্যে থেকে মধুসূদন জীবনকে দেখেছেন। আর দীনবন্ধু জীবনকে দেখেছেন গ্রাম বাংলার সহজ বিকীর্নতায়, নির্মোকহন জনতার ভাঙ্গাচোরা মুখের কথায় এবং জবন ও হাস্যরসিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপে। কোন ধার করা কৃত্রিম উপাদান নয়, বাংলার জীবনসম্ভূত অমৃত ধারাকেই তাঁর নাটক অভিষিঞ্চিত। তাঁর নাটকেই প্রথম পাওয়া যায় জীবনের উচ্চতর বায়ুমন্ডলের পরিবর্তে বাংলার ধূলিমাটির স্পর্শস্বাদ। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ব্যাপকতম জনতার জীবন ভাষ্যকার।

জন্ম ও কর্মজীবন

নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয় ১৮৩০খ্রীঃ ১লা নভেম্বর। পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ন। ঈশ্বর গুপ্তের প্ররনায় 'সংবাদপরভাকর' পত্রকায় কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম সাইত্যে জগতে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন। তারপরে পোষ্টমাষ্টারের চারি নিয়ে প্রথমে পাটনা, পরে বিহার উড়িষ্যা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে দলি হন। সেইসময় নীলকর সাএবদের অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়।

নাট্যগ্রন্থ সমূহ

নিলদর্পন (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), মলে কামিনী (১৮৭৩)।

টিপ্পনী

প্রহসন

সধবার একাদশ (১৮৬৫), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিভ (১৮৭২)।

'সধবার একাদশী' দীন্ধু মিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রহসন নাতক। তিন অঙ্কে বিন্যস্ত 'সধার একাদশী' র বিষববস্তু আত্ম-সমালোচনা কৃষ্ণনগরে দীর্ঘকাল বসবাসকারী দীনবন্ধুর প্রতিবেশী ছিলেন রামলোচন ঘোষ। উমেশচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র মল্লিক ও রামতনু লাহিড়ী। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র সে যুগের সর্ববিধ আধুনিক প্রবণতার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। নাটকের শুরু কাঁকুড়গাছি নকুলেশ্বর উদ্যানে, শেষ-কাঁশারি পাড়ায় অটলবিহারীর বৈঠকে। প্রসঙ্গত স্মরনীয়, উত্তর কলকাতার এই বিশিষ্ট অঞ্চল অনতি পরবর্তী লেখক গিরীশচন্দ্রের ও বহু নাট্য চরিত্রের বিচরনভূমি। দীনবন্ধুর নাটকে কোন সংশোধের ইশারা নেই, কারন নাট্যকারের মুখ্য লক্ষ্য ছিল আনন্দদান, শিক্ষাদান নয়। কিন্তু এই ধরনের নাটকে শোধনী মনোভঙ্গ যে একেবারে থাকে না তা নয়।" Society punishes by laughter the individual's deviation from social norms" কিন্তু দীনবন্ধু এখানে তুলে ধরেছেন পরিপূর্ন জীবন ; আর লোভ মিথ্যাচার ভন্ডামী ধূর্ততা। তিনি দেখিয়েছেন এক প্রতিভাবান, যথার্থ জ্ঞানী ও যোগ্য লোক - যে পারিবারিক জীবন বা সামাজিক জীনে কোনরূপ স্বীকৃতি পায় নি। এই ব্যর্থ নিস্ফল নৈরাশ্য পীড়িত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বিধা শূন্য উচ্চহাসিই এই নাটকের প্রান। সধবার একাদশী' তাই যেমন দারুনভাবে সমসাময়িক, তেমনি কালাতীত। নিমচাঁদ সেই যুগের ব্যর্থ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একক প্রতিনিধি। প্লুটাসের মত শুধু হাসিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি ; টেরেন্তোর মত ভাবুকের ভাবাকেও জাগাতে চেয়েছেন। তাই তাঁর নাটকে ঘটনা পরিকল্পিত হয় নি, উৎকলিত হয়েছে। বাস্তব জীবনের নির্বাচিত অংশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

নাটকে নিমে দত্ত নায়ক হয়েও নাবক নয়। গল্পকে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে অটল। অথচ সমগ্র প্লটের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রয়ছে সে। নানা-রঘটনার ওপর তারই মন্তব্য আমাদের আগ্রহকে ধরে রাখে, উল্লসিত ও উচ্চরিত করে। আবার নিমচাঁদ অটলের ইয়ার বটে, কিন্তু ভোলার মতো সে নির্বোধ ইয়ারকি মারে না। সে মাতাল এবং উচ্ছৃঙ্খল হলেও তার গভীইর অনাসক্তি ও সূক্ষ্ম আভিজাত্যবোধে তাকে পাপকাজে ইন্ধন জোগায় না। সে পুন্যাত্মা নয়, নীতিনিষ্ঠ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরায়নতায় তার আসক্তি নেই। তাঁর নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ শরৎচন্দ্রের যোড়শর নাবক জবনানন্দকে মনে পড়িয়ে দেয়। বস্তুত সাহিত্যের ব্যাক্তি বাস্তবের ব্যাক্তির হুবহু রূপাবন নয়। সে বহুর রূপ আত্মস্থ করে হয় আনন্দরূপী।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'সধার একাদশী' প্রকাশ করতে নিষেধ করেছলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে দনবন্ধু তাঁর বন্দুর সে নিষেধ শোনেন নি, যদি ইনি 'সধবার একাদশী' প্রকাশ না করতেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রসন লোকের অজ্ঞাত থেকে যেত ল এটা অত্যুক্তি নয়। হাস্যরস যদি প্রহসনের প্রাণ হয় এবং সমাজশোধন আর উদ্দেশ্য হবে থাকে, তে 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রহন উঠতে পারে না।

টিপ্পনী

'সধার একাদশ'র বিষয়বস্তু ও ঘটনাবিন্যাসের অভিনবত্ব

সধবার একাদশী তৎকালীন নব্য সভ্যতার ধ্বজাধারী 'ইয়ংবেঙ্গলের' নিখুত চিত্র। অনুরূপ বিষয় নিয়ে লিখিত পূর্ববর্তী প্রহসন মাইকেল মধসূদনের 'একেই কি বলে সভতা'র সঙ্গে 'সধবার একাদশী'র সাদৃশ্য খুব বেশি। দীনবন্ধু তাঁর পূর্বসূরী মধসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলল আটা বোঝা যায়। ঘটনাসন্নবেশ, চরিত্রচিত্রন এমন কি কথোপকথনে পর্যন্ত এই প্রভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু 'সধবার একাদশ অধিকতর পূর্নাঙ্গ প্রহসন। এর নাটকীয় রস অনেক বেশি ঘনীভূত এবং এর চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কথানৈপুন্যার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

'সধবার একাদশীতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবস্পৃষ্ট নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব দোষ ও অনাচার দেখা গিয়েছিল তার উল্লেখ করা হেছে। তখনকার যুবকদের মধ্যে আসআত্য সমাজলব্ধ যে গুরুতর দোষটি দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজদেহকে পঙ্গু করে তলেছিল তাই আলোচ্য পরহসনটর মূল বক্তব্যবিষব। অনুচিত ও অপরিমিত মদ্যাসক্তি নিমচাঁদ, অটলবিহারীর মত অনেক যুবকেই সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিঃশেঢ়ে নামিএ ইয়েছিল। যুবকেরা তখন শিক্ষিত হেছিলেন বটে কিন্তু সুনীতি ও সদাচার অসঙ্কোচে অবজ্ঞা করতে মোটেই লজ্জিত হতেন না। প্রকাশ্যভাবে বারাগনা বিলাস করতে তারা অন্যায় বোধ করতেন না। অটলবিহারীর মত উর্ন্মাগামী অপরিনামদর্শী যুবকদের মধ্যে এই আসক্তি ছিল তা নয়, নকুলেশ্বর মত উকিল ও কেনারামের মত ডেপটিও এই দোষে কলুষিতচরিত্র ছিল। হন্দুসমাজের এইসব দুর্নিতী ও দুষ্কর্মপরায়নতার প্রতিক্রিয়ারূপেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয়েছিল। নবোত্থিত বরাহ্মসমাজ অধঃপতিত, স্খলিত সমাজকে সুনীতি, সমাচার ও শালীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিল। প্যারীচরন সরকার প্রবর্তিত সুরপাল নিবারনী সভা শিক্ষিত সমাজ থেকে সুরপাল নিবারনী সভার উল্লেখ আছে। ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিত 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রবন্ধে এ বিষয়ের সাক্ষ্য মেলে - "সধবার একাদশী প্রকাশিত হইবার পর প্যারীচরন সরকার দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছিলেন -"আপনার যে বহি বাহীর হইয়াএ এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া

দিলেও চলিতে পারে।"

টিপ্পনী

যে যুবক বাবা-মার দ্বারা যধাসময়ে শাসিত ও শোধিত না হয় তার পরিনাম কি রকম শোচীয় হবে উঠতে পারে এই অটলবিহারীর চরিত্রের মধ্যে তার পরিচয় আচে। মা বাবার প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিপথগামী যুবকের চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আলালের হঘরের দুলাল' -এর মধ্যে অঙ্কন করেছেন, দীনবন্ধুও অটলের স্নহান্ধ মায়ের অবিমৃষ্যকলারিতা দেখিয়ে প্রত্যেক বাবা মাকে সতর্কিত করতে চেয়েছেন। ঘটিরাম ডেপুট তখনকার ডেপটি সমাজের একট বাস্তব চরিত্র ;ল ঘটিরামের মত মূর্খ ও নির্বোধ অনেক ডেপুটী তখন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন যে মুন্সেফ, ডেপুটীদের সম্বন্ধে অনেক হাস্যজনকক গল্প দীনবন্ধুর জানা ছিল, ঘটিরামের হাস্যপদ চরিত্র সেই সব গল্পের্ একটি নায়ক। দীনবন্ধু নিজে খাঁটি পশ্চিমবঙ্গবাসী হলেও পূর্ববঙ্গে ভাষা তিনি যে কতখানি তা তাঁর সৃষ্ট রামমানিক্য চরিত্রটি থেকে ওঝা যায়। রামমানিক্য চরিত্র লেখকের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। শুধু তার কথাই নয় পূর্ববঙ্গবাসীদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং অসঙ্গতিও দীনব্ধু দেখাতে ভেলোননি। রামমানিক্যের অনেক কথা অবিস্মরনীয় হয়ে রয়েছে এবং তার অনুকরনে বাংলা সাহিত্যে বহুতর চরিত্র অঙ্কিত হবেছে। পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি লেখক অন্যায় করেছেন একা বলা অযৌক্তিক। কারন দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য কেবল অবারিত হাস্যরস সৃষ্টি করা, আঘাত করা তাঁর ইচছা নয়। স্বয়ং শেক্সপীয়র পর্যন্ত 'Merry wirs of windsor ' নাটকের মধ্যে Dr. Caius এবং Sir Hugh Emans এর বিকৃত কথা নিয়ে হাস্যপরিহাস করেছেন।

'সধবার একাদশী' প্রহসনে সংলাপ

'সধবার একাদশী'র মধ্যে ওনো জটিল, রহস্যময় কাহিনী নেই। নাটকের চমৎকারিত্ব কাহিনীর মধ্যদয়ে গড়ে উঠেনি। কোনো আকস্মিক ঘটনাসন্নিবেশের সাহায্যে হাস্যরস সৃজন করার চেষ্টাও এখানে নেই। নাটকের মধ্যে বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশের মধ্যদিয়ে যে নাটকীয় গতি সম্পাদান করা হয়, এই প্রহসনে তারও অভাব। তিন অঙ্কের মধ্যে দুই এক স্থান ছাড়া প্রায় সর্বত্রই একই পরিবেশের মধ্যে নাটকীয় কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তবুও প্রহসনখানি পড়বার সময় কিনখানেই একঘেয়জে লাগে না এবং দৃশ্য সংযোজনের কোনোখানেই অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা বোধ হয় না। ঘটনার বিকইপ্ততা নেই বলেই বইটির নাটকীয় রস জমাট হয়ে উঠতে পেরেছে। অথচ সংলাপের চমৎকারিত্বের জন্য কাহিনী সর্বত্র সরস ও প্রাণবান হয়ে উঠেছে। 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠ গুন এর একান্ত বাস্তব ও অপূর্ব ব্যজ্ঞনাময় কথাবার্তা।ঔ নাটভকারের প্রধান অবলম্বন

নাটকের কথোপকথোন, এর মধ্যদিয়ে তাঁকে চরিত্রসৃষ্টি করতে হয় ও ঘটনার চলমানতা বিধান করতে হয়। যে জায়গায় যে কথাটি ব্যবহার করতে হয়, ঠিক সে্ কথাটির অভাবে নাটকীয় রস ব্যাহত হয়। এই কথা ব্যবহারে দীনবন্ধুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একমাত্র রবন্দ্রনাথ ব্যাতীত আর কোনো নাটভকার এই বিষয়ে দীনব্ধুর সমকক্ষ নন। নিমচাঁদের প্রতিটি শ্লেষাত্মক কথা, প্রতিটি witty বাক্য দর্শকদের মন হাসিতে ভরিয়ে রাখে। ঘটিরাম ডেপুটী, রামমানিক্য, অটল, ভোলা, কাঞ্চন - প্রত্যেকের কথা তাদের চরিত্র বিকাশে অভ্রান্তভাবে সাহায্য করেছে। দীনবন্ধু কথাকে আব্রু দিয়ে ঠেকে তার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত হন নি, সেজন্য অশ্লীভাষিনী বারবনিতা, মদ্যপায়ী মাতাল বয়াটে আদুরে দলাল প্রভৃতির মুখ দিয়ে সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোশ খসে পড়েছে এবং একি অশ্লীল, অভদ্র রসস্রোতে সমস্ত নাটকীয় প্রাঙ্গন প্লাবিত হয়ে গেছে। এই কারনে অনেক রুচিবিলাসী সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকের অশ্লীলতায় বিরত হয়েছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ও ডাঃ প্রভুচরন গুহঠাকুরতা নাট্যকারকে অনেক কটু কথাও শুনিয়েছেন। কিন্তু এঁদের ভুল এটা বুঝতে যে, দীনবন্ধু যেসব চরিত্র বর্ণন করেছেন তাদের মুখ দিয়ে ভব্য ও ভদ্র কথা বলালে তা শোভন হত বটে কিন্তু নাটকের পক্ষে তা নিতান্ত অস্বাভাবিক হত। প্রহসনটির মধ্যে ঘটনার অদ্ভুত্ব দেখা গেছে তৃতীয় অঙ্কের শেষদৃশ্যে। সেখানে মোগলবেশী অটলবিহারী ও তার কুমুদিনী হরণ-বৃত্তান্তের মধ্যে হাস্যরস সশব্দ আবেগে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে।

'সধবার একদশী'র মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্পর্শদুষ্ট সমাজের দোষগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রাঙ্কনের নিখুঁত বাস্তবতা এবং অধঃপতিত চরিত্রগুলির শোচনীয় পরিনাম - দর্শনে আমাদের মন ভারাক্রান্ত ও করুনায় আদ্র হয়ে উঠে। কিন্তু নাট্যকার প্রহসনের মধ্যে কোনোখানে নীতি ও আদর্শ নিয়ে অযথা বাগাড়ম্বার করেন নি ; এবং শেষে পতিত চরিত্রগুলিকে অনুতাপে দগ্ধ করিয়ে তাদের নেহাত ভালোমানুষ করবার চেষ্টা করেন নি। বরং গ্রন্থের মধ্যে যারা সুরাপান নিবারনী সভাও ব্রাহ্মসভার নাম করতে গেছে তাঁআই নিমচাঁদের সুতীব্র ব্যাঙ্গের আঘাতে হাস্যষ্পদ হয়ে পড়েছেন। নীতি, সততা ও আদর্শের প্রতি দীনবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল না একথা বললে ভুল বলা হবে, কিন্তু জীবনের ভালোমন্দ দুইদিক তিনি সমান করুনামাখা দৃষ্টিতে দেখেছেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত দীনবন্ধু মিত্রো ভেএছেন - "I am not the poet of goodness only, I do not decline to be the poet of wickedness also."

সেজন্য তাঁর চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত থেকেও তাদের জীবনের করুন ট্র্যাজেড়ির মাধ্যমে আমাদের মনকে অভিভূত করেছে, অবিকৃত হাস্য কোতুকের মধভেও করুন ফল্গুস্রোত সমস্ত প্রহসনটিকে সিক্ত করে রেখেছে।

টিপ্পনী

‘সধবার একাদশী’র নিমচাঁদ চরিত্র

টিপ্পনী

‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের অদ্বিদীয় শ্রেষ্ঠত্ব একান্তভাবে নির্ভর করেছে নিমচাঁদ চরিত্রের উপর। অটলবিহারীকে গ্রন্থের নায়ক বলে হতে পারে বটে। কিন্তু তার চরিত্রের জঘন্য হীনতা ও আতান্তিক ক্ষুদ্রতা কেল ঘৃনা ও বিরক্তি উৎপাদন করে। সে নির্দ্বন্দ হয়ে সর্বপ্রকার কুকার্যে রত কোনো প্রকার সর্ত্রই অনুভূত হয়। তার সুতীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, প্রগাঢ় পান্ডিত্য, সুগভীর অনাসক্ত নির্লিপ্ততা সস্ত প্রহসনটিকে অভিনব রসে উজ্জ্বল করে তুলেচে। অনেকেই বলেছেন নিমাঁ মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র অবশ্য একথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘মধু কি কখনো নিম হয়? দীনবন্ধু অস্বীকার করলেও ও একথা সত্য যে, মধুসূদনের পরোক্ষ প্রভাব প্রহসনটির উপর পড়েছে। মাইকেল ইযংবেঙ্গল’ এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন এবং ইয়ংবেঙ্গলে’র কোনো চরিত্র আঁকতে গেলে মাইকেলের জীবন্ত প্রভাব তার উপর পড়ে সেটা অস্বাভাবিক নয়। অপরিমিত মদ্যাসক্তি মধুসূদনের জীবনের অশান্তির মূলে ছিল, এবং নিমচাঁদের জিবনেরও এই আসক্তি তার সর্বনাশ করেছে। মধুসূদন প্রগাঢ় পান্ডিত্যসম্পন্গন ও পুরাদস্তুর ইংরাজীনবীশ ছিলেন। তিনি একদিন ভূদেববাবুকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই কথার প্রতিধ্বি করেই নিমচাঁদ বলেছে - “ I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English and dream in English .” মধূসূদন জীবনের শেষভাগে মনোমমোহন ঘোষ প্রৃতির কাছে যে রকম মর্মান্তিক খেদোক্তি করতেন নিমচাঁদও মাঝে মাঝে তাই৯ করেছে, এইসব সাদৃশ্যবশত নিমচাঁদের উপর মধুসূদনের সাম্ভাব্য প্রভাব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

নিমচাঁদ ইংরেজিতে সুশিক্ষিত এবং ভদ্রসন্তান হয়েও মদ্যপের চরম অধোগতিপ্রাপ্ত। কিন্তু সে পতিত বটে, তবে স্বর্গভ্রষ্ট। আত্মসম্মান সে বিসর্জন দিয়েছে, মদের জন্য অপমান-গঞ্জনা সে অঙ্গভূষন রেছে, তবুও শিক্ষার গোরবে সে চারিদিকের তুচ্ছতার ও মূঢ়তার মধ্যে মাথা উঁচু করে যেখানে দাঁড়য়ে আচে সেখানে খোঁচা পৌঁছলেই ভগ্নাচ্ছাদিত বহ্নি দপ্ করে জ্বলে উঠে। ধনী মূর্খের উপর তার অসীম অবজ্ঞা, অটল তাকে শাসায় - “তোকে আমি আর বাড়িতে আসতে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কুপরামর্শ দিয়েছিলি .....”। তখন নিমচাঁদ বলেছে - “তুই যদি কিইছুমাত্র লেখাপড়া জানতিস্ তোর কথায় আমি রাগ ত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্লে মূর্খতার সম্মান করা হয়।”

অটল মেঘাদবধ কিনেছে পড়ে তার ভাল লাগে নি শুনে নিমচাঁদ বলেছে - “ ওর ভাল মন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার

ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস।"

নিমচাঁদ মদ্যপ ও চরিত্রহীন, তবু সে ভদ্রলোকের উচিত অনুচিত জ্ঞান হারায় নি। গোকুলবাবুর মতো লোক যারা নির্বিবাদে রুটিনমাফিক ঘরসংসার করে এবং সুযোগ পেলে অন্যকে উপদেশ দিয়ে শান্তি পায় তাদের সংকীর্ন ক্ষুদ্রজীবনের প্রতি নিমচাঁদের নিদারুন অবজ্ঞা। মদের ঘোরে মাঝে মাঝে আর নির্বেদ হয় এবং এমনও মনে হয় যে মদ ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষনেই সুরাপান-নিবারনী সভার সভ্যদের ও গোকুলবাবুর কথা মনে পড়ে যায়, সে শিউরে ওঠে - "এত কালের পর সভায় নাম লেখাব" গোকুলবাবু হবো?"

নিমচাঁদের প্রলাপের মধ্যে এমন গভীর কারুন্য আছে যাতে পাঠকের মন সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে যায়। যেমন -

"So sweet was ne'er so fatal, I must weep
but they are crud tears -

কারণ, আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র পৃথীবীতে ঘোরে কি সূর্যটা ঘোরে? পৃথবি ঘোরে - সূর্য ঘোরে না ? না এখন রাত্র হয়েছে - সূর্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটা বন্ বন্ করে ঘুরচে - পৃথিবী ঘোরে - গোরে ঘুরুক।"

নিমচাঁদ ঠাট্টা করে, কিন্তু ভোলার মতো নির্বোধ ইয়ারকি সে মারে না ; জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভের পর সে সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়েউঠেছে। তথাকথিত ভালো লোক ও সদনুষ্ঠানের প্রতি তার কোনো আস্থা নেই। নকুল গোকুল প্রভৃতি লোক যারা সুরাপান নিবারনী সভা প্রভৃতির উদ্‌যোগী তারা যে বস্তুত কত অন্তঃসারশূন্য ও কপট তা সে জানে। সেজন্য তাদের সদ্‌কর্ম প্রচেষ্টাকে সে নিতান্ত অনুকম্পার চোখে দেখে। রামমানিক্য ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে কত ছোট তাও সে অনুভব করে, সেজন্য সে তাদের নিয়ে সবসময় করুনা মিশ্রিত কৌতুক করে। সে মাতাল এবং উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু তার গভীর অনাসক্তি ও সূক্ষ্ম আভিজাত্যবোধ তাকে সর্বদা পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। সে পুন্যাত্মা নয়, নীতিনিষ্ঠ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরায়নতায় তার আসক্তি নেই। সে কাঞ্চনকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে, বন্ধুদের নিয়ে অশ্লীল ইয়ারকিও মারে বটে। কিন্তু কোনোপ্রকার জঘন্য আমোদে লিপ্ত হতে তাকে দেখা যায় নি। অটলবিহারী যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে হরন করার নিতান্ত গর্হিত প্রস্তাব দিল নিমচাঁদ তখন অসম্মত হয়ে বলেছে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"I dare do all that may become a man who dares do more, is none."

নিমচাঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তুলনীয় চরিত্র শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'র নায়ক জীবনানন্দ। জীবনান্দের মতোই নিমচাঁদ নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। রামধন রায় তাকে মেরেছে, অথচ সে এই মার নিয়ে রামধনের সঙ্গে ঠাট্টা করেছ, যেন এটা পরম উপভোগ্য ব্যাপার। জীবনের স্বাভাবিক, সঙ্গত ও শান্তিময় তারা থেকে সে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সেজন্য নিজের জীবনের প্রতিও তার কোনো দরদ ও মমত্ব নেই। সে অনুভব করে যে তার মত জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যাক্তিও আজ অবস্থা বৈগুন্যে ঘৃনিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই যখন তার ব্যঙ্গ কুটিল ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দীয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বের না হয়ে হৃদয়ভেদী অনুপতাপ উদগত হতে থাকে, তখন আমাদের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। নিমচাঁদের একটু কথায় তার ব্যার্থ জীবনের বেদনা হাসির ছলে যেন কেঁদে উঠেছে-

"প্রসন্নর বাড়ী ? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পেলান কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমদের হাতে ধরে ল, নইলে বাবা পড়ে মরি।"

তখন মনে হয় দীনবন্ধু কমেডির মধ্যে এক নিতান্ত করুন ট্রাঝিক চরিত্র এঁকেছেন এবং তার চরিত্র আলোচনাকালে কিংলীয়রের উক্তি মনে আসে - "I am more sinned against than sinning."

শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. সুউমার সেনের উক্তি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য "শুধু নিমচাঁদের ভুমিকার জন্যই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সধবার একাদশী বাঙ্গলার দুই চারিখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থের অন্যতম বলিয়া চিরদিন পরিনতি হইবে।"

হাস্যরসিক দীনবন্ধুমিত্র : "সধবার একাদশী" প্রহসনের হাস্যরস

বাংলা সাহিত্যে হাসভরসের সর্বশ্রেষ্ লেকক কে এ সম্বন্ধে চট করে একটা মন্তব্য করা সহজ নয়, কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রকে এ সম্মান দিলে বোধ হব অসঙ্গত হবে না। তাঁর মত হাসতে কেউ পারেন নি এবং শরৎচন্দ্র ব্যাতীত সম্ভবত তাঁর মত কাঁদাতেও আর কেউ পারেন নি।

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক, উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও ছিল, কিন্তু তবু উভয়ের জীবনবোথ ও রসসৃষ্টির ,মধ্যে প্রভেদ ছিল । বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ও বাআলীকে অকৃত্রিম অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন তা সত্য কিন্তু সেই অনুরাগ অনেকখানি ভাবাশ্রয়ী, বুদ্ধিগত ও আর্শচারী ল তিনি সমাজ ও জাতিকে তার উন্নত, বলিষ্ঠ ও আদর্শায়িত স্তরেই উন্নয়ন করতেই চেয়েচিলেন । এক মর্মান্তিক নাগরিক দৃটিভঙ্গী, শিক্ষাভিমানী রুচি ও প্রখর নীতিবোধ দিয়ে তিনি মানুষের বিচার ও বিশ্লেষন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু দীনবন্ধুর দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ন স্বতন্ত্র। দীনবন্ধুও বঙ্কিমচন্দ্রের ত উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা ও মর্যাদা তাকে ভাবচারী, আদর্শবিলাসী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী করে তুলতে চান নি, নিজেই তাঁর শিক্ষা ও স্বাতন্ত্রের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করে সমাজ জাতির সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিদেশী রোমান্সের আলোতে দেশী জীবনকে সুন্দর ও সরস করে তুললেন না, সেই জীবনের স্থূল ও বিকৃত দিক যথাযথরূপে উদঘাটন করলেন । নীলকর অত্যাচার সপত্নী ও ঘরজামাইয়ের সমস্যা, কৌলিন্য ও বহুবিবাহ প্রথা ইত্যেদির মধ্য দিয়ে বাংলার খাঁটি গ্রাম্য-জীবনের যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে দীনবন্ধু যেমন তার প্রানসত্তটিকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন, তেমনি শিক্ষা ও সভ্যতা আর আলোকপ্রাপ্ত নবজাগ্রত নাগরিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খল ও উৎকেন্দ্রিক রূপের সঙ্গে তিনি পরিপূর্নভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কল্পনার রঙে জীবনকে সুন্দর করতে চান নি, ণনীতি ও আদর্শের পালিশ দিয়ে তাকে মার্জিত করতে চান নি, ভাষা, ভঙ্গি, রস ও সৌন্দর্যের উৎসগুলি পুরোপুরি মুক্ত করে দিয়ে জীবনককে সম্ভোগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. সুশীলকেমার দে মহাশয় যর্থাথই বলেছেন - "দীনবন্ধু নিজে প্রাণে মনে খাঁটি বাঙালী ছিলেন ; তাই দোষভরা, গুনভরা, হাসিভরা, কান্নাভরা বাঙালীকে তিনি বুঝতেন এবং তার জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল আন্তরিক। খাঁট বাঙালী অর্থে এই বুঝায়, বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও রতাঁহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙালর নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত ; প্রকাশভঙ্গী ছিল বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতি ; ভাষাটিও ছিল বাঙালীর দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত সমাজে নয়, মাঠ ঘাটে হাটে বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য।" হাস্যরসিক জীবনকে দেখেন তীক্ষ্ণ ও তীর্যকভাবে, তার শুধু ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে আসে, জীবনের বাস্তবরূপ সম্বন্ধে একটি সদা-জাগ্রত ও অন্তর সন্ধানী সূক্ষ্ম-সচেতন দৃষ্টি থাকা দরকার। রাজকার্য উপলক্ষে দীনবন্ধু দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেক হরেক রকমের মানুষ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা সত্য কিন্তু শুধু কেবল এই অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি অদ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক চরিত্রাসমূহ এত উজ্জ্বলভাবে সৃষ্টি করতে পারেন নি। তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার শানিত প্রখর বাস্তব-দৃষ্টি এসে মিলিত হয়েছিল। করুনও গম্ভীর রসে জীবনের গভির ও গুহাহিত দিকই কল্পনা ও অনুভূতির রঙে

টিপ্পনী

ফুটিয়ে তোলা লেখকের লক্ষ্য কিন্তু হাস্যরসে জীবনের প্রকাশমান ও দৃষ্টিগোচর দিকটি কিছু অতিরঞ্জনের রঙ মিশিয়ে উদঘাটন করাই হাস্যরসিকের উদ্দেশ্য। সেজন্য বাস্তব সংসারে ঠিক যেমনটি ঘটে তা অবিকল চিত্রিত করতে না পারলে হাস্যরসের প্রবল প্রানোচ্ছাস মুক্তি পাবে না। সেজন্য যাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে তিনি হাসলেন তাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাগভঙ্গি, প্রতিটি ছড়া ও প্রবাদ জানতে হবে। তাদেরসংস্কার ও প্রবনতা, আচার আচরনের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় তাঁকে বুঝতে হবে, তাদের চোখের ইসারা,. মুখের বঙ্কিম ভঙ্গি, হাত ও পায়ের চঞ্চল গতি সব কিছুই অতি প্রখর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে। সুশিক্ষিত মাতালের মাতলামি ও অশিক্ষিত নেশাখোরের ইতরামির মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা কতখনি, পূর্ববঙ্গীয় রামমানিক্যের ভাষায় শব্দ ও বাগধারার বৈশিষ্ট এমন কি উৎকলবাসী ভৃত্য রঘুরায় উৎকলী ভাষার বিশুদ্ধ রূপটি পর্যন্ত তিনি অভ্রান্ত ও অবিকৃত দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষন করেছেন। তাঁর দৃষ্টির এই সুতীক্ষ্ণ ও বিশ্বস্ত বাস্তবনিষ্ঠা জন্য তাঁর বর্ণিত জগৎ এত অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক মনে হয় এবং সেই জগতের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি জনিত হাস্যরস এত সাবলীল ও কালোচ্ছল হয়ে আমাদের অনর্গল আনন্দরসে মাতিয়ে রাখে।

অনেক হাস্যরসিক লেখকদের জীবন বৃত্তান্তে জানা যায় যে, তাঁরা তাঁদের লেখায় হাস্যরস সৃষ্টি করলেও বাকল্তিগত জীবনে অনেক সময় বিমর্ষ ও গম্ভীর হয়ে থাকতেন। কিন্তু দীনবন্ধু এরকম ছিলেন না, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হাসির অফুরন্ত ফোয়ারা রূপেই ইদ্যমান ছিলেন। যে কেই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তিনি বন্ধুই হোন কিংবা পাঠকই হোন, তাকে শুষ্ক মনে যাবার পথ দেন নি, দীনবন্ধু হাস্যরসের ধারায় তার মন সিক্ত করে দিয়েএন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রাধান্যযোগ্য - "তাঁহার ন্যায় সুররসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় সিতেন সেই সভার জীবন স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হত। শ্রোতৃবর্গ, মনের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রনীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গাল ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসে গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।" বিজ্ঞ, গম্ভীর ও রাসভারী লোক তাঁর পরম শত্রু। হাসির পিচকারী থেকে অনর্গল রঙ ছড়িয়ে দীনবন্ধু তাকে দলে টেনে আনবেন।

অনেক নীতিশিস সমালোচক দনবন্ধু মিত্রের অশ্লীল ও নীতিবিগর্হিত বলে নিন্দা করেছেন। যে সব শিক্ষাভিমানী শুচীবায়ুগ্রন্থ লোক জীবনের মুক্ত ও বলিষ্ঠ রূপকে কৃত্রিম রুচি ও নীতির দ্বারাআচ্ছাদিত করতে চান, এক নকল কৃত্রিম ও মূল বিচ্ছিন্ন জীবনের শূন্যগর্ভ ও ভাবাশ্রিত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে উঠেন তারা অবশ্য দীনবন্ধুর হাসিতে

অশ্লীল অশুচিতা আবিস্কার করে ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত হবেন। এমন সব বিরূপ সমালোচনার সমুচিত উত্তর ড. শুশীলকুমার দে তাঁর 'দীনবন্ধ মিত্র' গরন্থে দিয়েছেন - "যাঁহারা লেন শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকে্ দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশি, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দীনবন্ধুর মত নাটভরসিকের সমগ্র জীবন দৃষ্টি শ্লীলও নয়, - নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। যেখানে প্রান আছে সেখানে আসি বেপরোয়া যেখানে অনভূতির প্রিতি আছে সেখানে রঙ্গ বেপরোয়া। কালির দাগ নাই বলিয়া মনের কুণ্ঠা নাই, লেখা ও শ্লীলতা - অশ্লীলতার অলঙ্ঘ্য বিধিনিষেধের ঘোমটা টানিয়া বসে না।"

আসলে যেখানে সচেতনভাবে অকারন ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্র আমদানী করে নীচ প্রবৃতির উত্তেজনাই লেখকের উদ্দেশ্য সেকানেই অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু যেখানে জবনের বাস্তব রূপ যথাযথভাবে চিত্রিত হয় সেখানে অশ্লীলতা কোথায়? 'সধবার একাদশ' নাটকে মাতাল নিমচাঁদ যদি ভদ্র ও সংযত ভাষায় কথা বলত তবে আর যাই হোক,ক দিনবন্ধুকে আমরা পেতাম না, জীবনের শুচি, শুভ্র ও উন্নত দিক সত্য, আবার জীবনের অশুচি,পঙ্কিল ও পতিত দিকও সত্য। দীনবন্ধু দ্বিতীয় দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু হাসির পাবনী ধারায় সব কিছু ধুয়ে সকলকেই তিনি এক উদার ক্ষমাস্নিগ্ধ জগতে স্থান দিয়েছিলেন।

জীবনের বিপর্যয়, উদ্ভট অসঙ্গতি, কিম্ভূত বিকৃতি ও অন্যায় দুষ্কৃতি যেআনে যা দেখেছেন সব কিছু থেকেই দীনবন্ধু হাস্যকর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এদের গোপন রূপ অনাবৃত করে, ভ্রান্ত অথবা অহিতকর দিকটি উদঘাটিত করে তিনি এদেরকে হাসির আসরে টেনে এনেছেন। চতুর্দিকক থেকে উথিত প্রবল হাসির তীক্ষন আঘাতে এরা আহত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এদের ভআন্তি ও অন্যায় দেখে আমরা হাসি, তবুও আমরা এদেরকে ঘৃনা অবজ্ঞা করে দুরে সরিয়েড় দিতে পারি না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে কাছেই টেনে রাখতে ইচ্ছা করে। বাস্তব জীবনে যাদেরকে আমরা ঘৃনা ও পরিহার করি, শিল্পীর সীমাহীন সহানুভূতির স্পর্শে তারা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমা ও প্রীতি আকর্ষন করে থাকে। ফলস্টাফের মত অসৎ ও মিথ্যাচারী চরিত্র ও শিল্পীর অনবদ্য তুলিকা সুপর্শে আমাদের ইকাছে প্রীতিপদ হয়ে উঠেছে। মলিয়ের সে সব চরিত্রের অন্যায় ও অপরাধ নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতিই আবার বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এরপ সহানুভুতি দীনবন্ধুর ও অতিমাতআয় ছিল বলে তার চরিত্রগুলোর ত্রুটি বিচুতি দেখে শুধু কেল হেসেই নিশ্চিত হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙগে তাদের প্রতি এক করু অউকম্পা ও বোধ করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।" এই পরদুঃখ কাতর তার জন্য তিনি ভ্রান্ত। বিকৃত ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অধঃপতিত চরিত্রের মধ্যে শুধু কেবল হাসি উপাদান সংগ্রহ করতেন না, কান্নার উৎসব ও সন্ধান করতেন। নিমাঁদেদর বিকলীকৃত জীবনের এদনা হাসির ফাঁকে ফাঁকে গভিভাবে উপলব্ধি করছেন। তাঁর অন্তরে কান্নার কালোমেঘ পুঞ্জিত হয়েছিল এবং সেই পুঞ্জিত মেঘ থেকে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-বিলাস তাঁর প্রসন্ন মুখমন্ডলকে আলোচিত করেতুলত। এই যে হাসি ও কান্নার অঙ্গাঙ্গী মিলন, এতেই তো শ্রেষ্ঠ হাস্যরস হিউমারেদর প্রানপ্রতিষ্ঠা। দীনন্ধুর হাস্যরস সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে ড. সুশীল কুমার দে লিখেছেন, 'নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রুদীপত হাসি পর্যন্ত হাস্যরসের নিরবিচ্ছিন্ন স্ফূর্তি, কথাবার্তায় ভঙ্গীভাবে চরিত্রচিত্রে ঘটনাসংস্থানে সর্বত্র, যে বিচিত্র ও উচ্ছসিত রূপ ধারন করিয়াছে, তাআর মধ্যে কোথাও নাট্যকারের ক্রোধ বা ঘৃনা নাই, আছে শুধু স্নিগ্ধ রসকল্পনার সহজ ও উদার পরীতি। চড়চাপড় কানমলা আছে সত্য। কিন্তু তাহার সবটাই রঙ্গ সবটাই আনন্দ। তথাপি এই অনাবলি আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসিকের চক্ষুও যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল করুন রসকে হাস্যরস সমুজুল করে নাই, হাস্যরসও করুনরসে স্নিগ্ধ হইয়াছে।"

জগতের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টাগন - শেক্সপীয়র, সারভ্যানটিস, ডিফেন্স, প্রভৃতি এই করুন হাস্যরসই সৃষ্টি করেছেন। দীনবন্ধুও এই করুন হাস্যরসের ধারা তাঁর সাহিত্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে দৃষ্টিতে জীবননের হসি ও কান্না এক হয়ে ধরা দেয়, যে দৃষ্টিতে জীবনের পাপ ও পুন্য পরস্পরের আত্মীয় হয়ে ওঠে সেই উদার ও ক্ষমাসুন্দর দষ্টি তাঁর ছিল। সংসারের পাপ ও পুন অহরহই ঘটেছে ; পুনান য়ে পপাপকে ঘৃনা করা স্বাভাবিক, পাপী হে পুন্যকে বিদ্রুপ করাও স্বাভাবিক, কিন্তু পুণ্যবান হয়ে পাপকে ক্ষমাশীল স্নেহ দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া খুব সহজ কথা নয়। দীনবন্ধু মিত্র সেই কঠিন কাজটিই করেছেন। দীনবন্ধুর পূর্বে হাস্যরসিক লেখকগন প্রধানত ব্যঙ্গমূলক হাস্যরসই সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবানীচরন বন্দোপাধায়, পারীাঁদ মিত্র, কালপ্রসন্ন সিংহ সকলেই ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক ছিলোন। তাঁরা যাদের নিয়ে হেসেছিলেন তাদের শাস্তি দেওয়া, শোধন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সঙ্গে প্রীতিও অনুভূতির যোগ সেই সব লেখকদের ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর মধ্যেই সর্বপ্রথম আমরা দেখলাম যে, যাদেরকে আঘাত দিয়ে আমরা হাসি, তাদেরকে ভালবেসে আবার আমরা কাঁদি। দীনবন্ধুর পরে হাস্যরসের অতি উৎকৃষ্ঠ নিদর্শন আমরা পেলাম 'কমলাকান্তের দপ্তরে'এ।

দীনন্ধুর হাস্যরস হিউমারধর্মী হলেও তা কখনও উদ্ভট ঘটনাশ্রিত প্রহসনে, কখনও উৎকৃষ্ট রসাত্মক কমেডিতে, কখনও প্রনয়নরসত্মক সামাজিক নাটে এবং কখনও বা করুনরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'জামা বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা

বুড়ো' কৌতুকরসাত্মক প্রসন, ঘটনার উদ্ভট ঝটিলতার মধ্যে কৌতুকরসের ধারা পরবাহিত হয়েএ। 'সধবার একাদশী' চরিত্র প্রধান করুনরসত্মক কমেড, 'নবীন তপস্বনী' ও লীলাবতী' প্রনমুলন মিলনান্তক নাক ল 'নীলদর্পন' গভীরতম কারুন্যে নিষিক্ত বিয়োগান্তক নাটক হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার মাঝে মাঝে হাসির ক্ষনিক আলোকছটায় করুনরসের প্রবাহকে সরস করে তুলেছেন।

টিপ্পনী

সধবার একাদশী

চরিত্রাশ্রিত হাস্যরসের আলোচনায় সর্বপ্রথমেই 'সধবার একাদশী'র অবিস্মরনীয় চরিত্র নিমচাঁদের নাম করতে হয়। 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ট প্রহসন। অবশ্য প্রহসন বলতে যদি ইংরেজি সাহিত্যের Farce বুঝি, তবে 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলা চলে না, কারন অদ্ভুত ঘটনাকে আশ্রয় করে নিছক কোতুকরস সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য নয়। 'সধবার একাদশী'রমধ্যে ঘটনার অবিরাম গতি ও জটিলতা খুব কমই আচে। শুধুমাত্র মোগলবেশধারী অটল-হিজড়ার কুমুদিনী - হরন বৃত্তান্তে ঘটার কোতুকহলোদ্‌দীপক মৌলিকত্ব রয়েছে ল বইখানি প্রধানত একট চরিত্রকে কেন্দ্র করে অদ্বিতীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং সে হল নিমচাঁদ। এই একমুখিতার ফলে এটা কমেডি অপেক্ষা অধিকতর ট্রাজেডি ধর্মী হয়ে পড়েছে। নিমচাঁদ করুন হাস্যরসের সর্বোৎকৃষ্ঠ দৃষ্টান্ত। শুধু কেবল করুন হাস্যরস নয়, তাদের মধ্যে উইট ও হিউমারের সর্বোত্তম সমন্বয় হয়েছে। যে হাস্যস্পদ এবং হাস্যস্রষ্টা ও বটে ল তার চরিত্রের বিকৃতি ও অধঃপতন দেখে আমরা হাসি, আবার সেও তার বিদগ্ধ উক্তি ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যের দ্বারা আমাদের হাসিয়েছে। সে ঘোর মদ্যাসক্ত, অটলবহারীর অধঃপতনের জন্য সই দায়ী, অশ্লীল ইয়ারকিতে সে অতিশয় পটু, সুনীতি, সুরুচি মান মর্যাদার প্রতি তার ইদ্রুপ অতিশয় তীব্র, কিন্তু এসব অন্যায় ও অপরাধ সত্ত্বেও তার প্রতি আমরা কখনও ঘৃনার ভাব দেখাতে পারি না। তার হাস্যকর চরিত্রের অন্তরালে যে গভীরতর ত্রাজিক সত্তাটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাই আমাদের তরস হাসিকে মুহূর্তমধ্যে নিবিড় বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে ল তার মকত উচ্চশিক্ষিত, পরজ্ঞাবান ও বহুদর্শী লোক সমাজের মধ্যে কয়টি দেখা যায়, অথচ তারই এরকম শোচনীয় অধঃপতন। সম্মান ও মর্যাদার উচ্চবৃক্ষে কত মর্কট বসে তাদের লেজ আস্ফালন করছে আর তার মত লোক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে প্রহার ও পদাঘাত সহ্য করছে। কিন্তু নিমচাঁদ তার অধঃপতন সম্বন্ধে অন্ধও নির্বোধ নয়। সে তার সুক্ষ্ম, আত্মসচেতন দৃষ্টি দিয়ে সর্বনাশের পথে তার অনিবার্য অধোমুখী গতি লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে যেন তার অনুতপ্ত মন হাহাকার করে ওঠে - "হা জগদীশ্বর ! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি ; আমাকে অধর্মাকার মদিরা হস্তে

টিপ্পনী

নিপাতিত কল্লে ?" ঘোপর অন্তদ্বন্দের মধ্যে পুনরায় নিরুপায় স্বীকারোক্তি করে নিমচাঁদ - "মদ কি ছাড়বো ! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই ?" তার এই যে নিরুপায় দুঃখময় অবস্থা, সচেতন বুদ্ধির সঙ্গে অনমনীয় প্রবৃতির এই যে নিদারুন দ্বন্দ্ব, এর ফলে তার চরিত্র আমাদের সিমাহীন সমবেদনা আকর্ষন করে। নিমচাঁদ মদ্যাসক্ত বটে, কিন্তু কোন নীচ ও অহিতকর কাজে তার কোন লোভ কি সমর্থন নেই। অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে অসৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে সে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। তথাকথিত নীতি ও ধর্মে তার বিশ্বাস নেই। আবার দির্নিতি ও অধর্মের প্রতিও তার অনুরাগ নেই। সে যেন সব কিছু সম্বন্ধেই একটু নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তার এই নির্লেপ এবং ঔদাসীন্যের ফলেই তার প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধা ও সহানুভুতির ভাব চির জাগরক থাকে।

এ নাটকের গোকুল চরিত্রে দীনন্ধুর বঙ্গ বিদ্রূপকের স্পর্শ আছে। ভ্রান্ত, অপরাধী ও অধঃপতিত লোকের পরতি দীনবন্ধুর দরদ ও সহানুভূতির সীমা ছিল না, কিন্তু অনুদাএর ও অযোগ্য বাক্তিকে মানসম্ভ্রমের উচ্চ আসনে বসে থাকতে দেখলে তিনি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হতেন ল সেজন্য গোকুলের মত কপট ভদ্র ও সম্মানিত ব্যাক্তিদের পরতি তিনি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন।

দীনবন্ধু নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্র ও অঙ্কন করেছেন এ নাটকে। সেগুলির মধ্যে অশ্রসিক্ত সমবেদনার গভরতর হৃদয় - সংযোগ নেই, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বুদ্ধিদীপ্ত আঘাত নেই, শুধু কেল চিন্তাভাবনাবর্জিত কৌতুকহাস্যের উচ্ছল প্রানমাতানোলীলা রয়েছে। ভোলাচাঁদ, রামমানিক্য এই ধরনের কোতুকরসাত্মক চরিত্র। এরা সরল চরিত্র, এদের বাক্য ও আচরন অবিরাম কৌতুকের আঘাতে আমামদের চিত্তকে উত্তেজিত করেছে ল ভোলাচাঁদের নির্বোধ কথায় বিরক্ত হয়ে নিমচাঁদ যখন তাকে বলছে - "ফের যদি সার সার করবি এক বোতলের বাড়ি দিয়ে তোকে কাশ মিত্রের ঘাটে পাঠাব।" তখন ভোলাচাঁদের বক্তব্য -

"নো সার, সানইনলা সার, ডেড সার, ইয়োর ডার সার, উইডো সার ইলেভেন ডেজ ডুসার, হাঙ্গরী সার, দিস সাইড সার, দ্যাট সাইড সার, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট সার।"

এ হেন ভোলাচাঁদও আবার বাঙ্গাল রামমানিক্যাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। কিন্তু রামমানিক্য খাঁটি বিক্রমপুরবাসী, হেসে অপমান বরদাস্ত করার স্বভাব তার নয়। তাই সে বলেছে -

"পুঙ্গির পুৎ কেডা ? হিটকাইচেন আর খ্যাপাইবার লাগচেন, - দ্যাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বড়া টানে বাইর করতাম আর অমবস্যা দেখতেন, হালা গর্বস্রাব, হুয়ার বল্লুক, বল্লুক বুত।"

রামমাণিক্যের কথায় অজস্র কৌতুককনা প্রকাশ পেয়েছে। তার স্বদেশ প্রীতি, সরল ও কুপিত স্বভাব, নানা বিষয়ে নানা কৌতূহল ও মন্তব্য অত্যন্ত সরল হয়ে উঠেছে। ইংরেজী ব্যাকরণনের কয়েকটি গুরুতর অসঙ্গতি সে ধরে ফেলেকছে। 'মর্দাগোর পেরনাউন' ও 'মাইয়াগোর পেরনাউনে' যে কোন সমরূপতা নেই এটা সে গবেষনা করে পেয়েছে। ইংরেজী Come শব্দটি সম্বন্ধেও তার মন্তব্য যথেষ্ট মৌলিক। রামমানিক্য বলেছে-

"আর এই হালার পুৎ কোমক, এংরাজীর কোনডা যে দিহি দেইচো, সে দিহি লাগচে, কোম্ আইবার অয়, যা্বারও অয়, আমাগেরে মাষ্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোমড়া গর্বস্রাব, কোম আহেনও, যানও আর কহন কহন যাহেন।"

মূর্খ বখাটে ও নেশাকোর হেমচাঁদ ও নদের চাঁদ, বিশেষত নদেরচাঁদকে নিয়ে লেখক কম কৌতুকরস সৃষ্ট করেন নি। কৌতুকরস সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে নদের চাঁদের বক্তৃতার বেলায়।

দীনবন্ধুর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের কথাবার্তার সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যে শুধু কেবল কথার বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ কৌশল দেখিয়ে বাগবৈদগ্ধ সৃষ্টি করবার চেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বার্গমোঁ বলেছিলেন - "A word is said to be comic when it makes us laugh at the person who natters it, and witty when it makes us laugh either at a third party or at ourselves." অর্থাৎ কারো কথা শুনে আমরা যদি তৃতীয় কোন ব্যাক্তি অথবা আমাদের নিজেদের নিয়েই হাসি তবে তার কথা বাগ্বৈদগ্ধ্যের (witty)। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে নিমচাঁদ চরিত্রের কথায় বাগবৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোলাচাঁদ, রামমানিক্য এদের কথা কমিক এবং কিছুটা বাগবৈদগ্ধ্যময়। ওদের বাগবৈদগ্ধ্যের নিদর্শন ফুটেছে সরস বাগভঙ্গিতে ও বহুতর ছড়াও প্রবাদেদর রসাল প্রয়োগ।

টিপ্পনী

গ্রন্থাবলী

১। সধবার একাদশী - দীনবন্ধু মিত্র।

২। দীনবন্ধু জীবনী - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা - ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৫। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা - ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৬। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. সুকুমার সেন (২য় খন্ড)

প্রশ্নাবলী

১। প্রহসন হিসাবে 'সধবার একাদশী'র সার্থকতা বিচার কর।

২। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে নিমচাঁদ চরিত্রটি বিশ্লেষন কর।

৩। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে হাস্যরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৪। 'সধবার একাদশী' প্রহসনের সংলাপ রচনায় দিনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব কতখানি বুঝিয়ে দাও।

৫। 'সধবার একাদশী'-র অপ্রধান চরিত্রগুলির উপযোগিতা বিচার কর।

৬। 'সধবার একাদশী' নাটকের বিষয়বস্তু ও গঠন কৌশল বিবৃত কর।

অলীক বাবু

টিপ্পনী

জ্যতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ - ১৯২৫)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্র নাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যরচনায় নাট্যভিনয়ে সঙ্গীতে চিত্রকলায় এবং সচেষ্ট দেশহিতৈষিতায় তিনি সেই অসামান্য দিলেও অসামান্যতা দেখিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। ইনি এন্ট্রাস পাস করে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর প্রবল আকর্ষন ছিল নাটকের অভিনয়ের দিকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দ্বারকানাথের সময় থেকেই নাট্টাভিনয়ের পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে ঈশ্বর গুপ্ত ও যোগ দিতেন। ঈশ্বর গুপ্তের একাধিক নাট্যরচনা জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হয়েছিল। এসব বিষয়ে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে। নাট্যাভিনয়ে ও নাট্যরচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও আগ্রহ উদ্দীপ্ত রেখেছিল স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বড়দাদা ও ছোটভাইয়ের মতো বিচিত্র, বহুমুখী, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় তাঁর দক্ষতা ছিল ল সাহিত্য বিষয়েও জিজ্ঞাসা তাঁর প্রবল ছিল। ফরাসী ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সংস্কৃতেও মারাঠী ভাষাও তিনি ভাল জানতেন। অল্প বয়স থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল নাট্যশিল্পের দিকে। তার প্রথম রচনা একটি প্রহসন, কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২)। এই প্রহসনটিতে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বিশেষ সভ্যের কথায় ও কাজে অসঙ্গতির ও আতিশয্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরবিক্রম নাটক' (১৮৭৪) রচনা করলেন। এই পঞ্চাশ নাটকটির মধ্যে বাংলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের একটুখানি স্তব্ধ হৃদয়োচ্ছাস লোকিয়ে আছে ল এরপর রচিত হয় 'সরোজিনী বা চিতো আক্রমন নাটক' (১৮৭৫)। এটিও ও দেশানুরাগাত্মক নাটক তবে এখানে প্রধান রস বীর নয়, করুন। এই নাটকের পর দ্বিতীয় প্রহসন রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে নাম ছিল এমন কর্ম আর করবো না (১৮৭৭), পরে হয় অলীকবাবু (১৯০০)। ইংরেজী থেকে অনিদিত 'রজতগিরি' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক 'অশ্রুমতী' (১৮৭১) তে দেশপ্রমের পটভূমিকায় পিতৃপরায়নতার সঙ্গে প্রেমের বিরোধ অভিব্যাক্তি হয়েছে। 'অশ্রুমতী'-র পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একট ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচননা করেন - মানময়ী (১৮৮০)। তাঁ চতুর্থ ও শেষ

টিপ্পনী

মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী'। এরপর তিনি কিছু অনুবাদ নাটক ফরাসী ও সংস্কৃত থেকে প্রকাশ করেছিলেন , 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) 'প্রহসন ও পুর্নবসন্ত' (১৮৯৯), 'বসন্তলীলা' (১৯০০) এবং 'ধ্যানভঙ্গ' (১৯০০) এই তিনটি গীতিনাট্য সঙ্গীত সমাজে অভিনয়ার্থে রচিত হয়েছিল।

'স্বপ্নময়ী' -র পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন। মলিয়েরের 'ল বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' অবলম্বননে তিনি আগেই হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) প্রহসন রচনা করেছিলেন। পরে তিনি মলিয়রের আর একটি প্রহসন 'মারিয়াজ ফোর্সে' অনুবাদ করেছিলেন 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯) । ফরাসী গল্পের ও কবিতার কিছু অনুবাদ 'ফরাসীপ্রসূন' নামে সঙ্কলিত। দ্যা ল ম্যাজেলিয়রের 'ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষ (১৩১৫), ভিক্তর কুজ্যাঁর 'সত্য,সুন্দর, মঙ্গল (১৩১৮) এবং থিয়োফিল গোতিয়ের তিনখানি উপন্যাস 'শোনিতসোপান' (১৩২৭), অবতার (১৩২৯) ও মিলিতোনা (১৩০০)।

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন গিয়েছিল প্রাচীনতর সংস্কৃত নাটকগুলির বঙ্গানুবাদে ল যেমন - কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৩০৬), মালবিকাগ্নিমিন (১৩০৮) ও বিক্রমোর্বশী (১৩০৮) ; ভবভূতির উত্তর চরিত (১৩০৭), মালতীমাধব (১৩০৭০ ও মহাবীর চরিত (১৩০৮) ; শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (১৩০৭) ও নাগানন্দ (১৩০৯); বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস (১৩০৭); শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (১৩০৮); আর্যক্ষেমীশ্বরের চন্দ্রকৌশিক (১৩০৮); ্যট্টনারায়নের বেনীসংহার (১৩০৮), কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় (১৩০৮), রাজশেখর বিদ্ধশালভঞ্জিকা (১৩১০), প্রিয়দর্শিকা (১৩১২) ও কর্পূরমঞ্জরী (১৩১১), কাঞ্চনাচার্যের ধনঞ্জয় বিজয় (১৩১০) ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্র এরপর ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করেছিলেন একটি শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার (১৩১৪)। ইংরেজী থেকে অনূদিত নিবন্ধ হল 'এপিকটেটসের উপদেশ' (১৩১৪) এবং মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (১৩১৮) ভারতী, বালক ও সাধনা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যেসব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার কতকগুলি 'প্রবন্ধমঞ্জরী' (১৩১২০ তে সঙ্কলিত আছে। মারাঠী ভাষার লেখা তুকারামের কয়েকটি 'অভঙ্গ' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন । ঝাঁসির রানী (১৩১০) মারাঠী থেকে অনূদিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বড় কাজ হল ঠিলকের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্যের অনুবাদ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্ববিধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রচেষ্ঠার পিছনে ছিল তাঁ পত্নী কাদম্বরীর প্রেরনা।

অলীকবাবু

টিপ্পনী

'অলীকবাবু' প্রহসনের প্রথমে নাম ছিল 'এমন কর্ম আর মকরবো না' (১৮৭৭)। প্রহসন ঘরে বাইরে অভিনয়ে সমাদৃত হয়েছিল। বাড়িতে অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। নায়ক অলীকপ্রকাশ মিথ্যাভাষনকে আর্টরূপে অনুশীলন করেছে, মিথ্যার উপর মিথ্যা গেঁথে প্রাসাদ বানাতে তাঁর সঙ্কোচ ও লজ্জা নেই। আর নায়িকা হেমমাঙ্গিনী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে মনে মনে নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা বানিয়েছেন। বিশুদ্ধ কোতুলককরসব্ এই প্রহসনটিতে কোন ব্যানক্তিরা কোন সমাজের বিরুদ্ধে বিরাগ ও বিদ্বেষের চিহ্ন নেই। বিরল আয়িও জনকের স্বল্প কথায় কৌতুকরস ঘণীভূত হয়েছে। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনারীতিরও গোপাল ভাঁড়ের গানের প্যারডি আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গম্ভীর রসাশ্রিত নাটকে প্রতিভার পূর্নতম শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লঘুরসাত্মকক প্রহসনের মধ্যে ও তার প্রতিভার প্রয়োগ বিলক্ষন আছে।তিনি বেশি প্রহসন রচনা করেন নি, কিন্তু প্রহসনের ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন। দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতা অবলম্বন করে প্রহসন রচয়িতাগন প্রহসন রচনা করেছেন। সমসাময়িক সমাজের নানা দোষ ও গ্লানি দেখাবার জন্য তারা নানা কদর্য ও কুৎসিত বিষয়ের অবতারনা করতেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজের পঙ্কিল বাস্তবতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। একটা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন রুচি নিয়ে তিনি জীবনের কৌতুককর উপাদানের দৃষ্ট দৃষ্টিপাত করেচিলেন ল নাগরিক মানসের সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্য ও সতর্ক শালিনতা তাঁর প্রহসনে এক উজ্জল দীপ্তি বিকিরন করে রয়েচে। তাঁর প্রহসনের চরিত্রগুলি সমাজের চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কারলালিত খাঁটি মৃত্তিকাশ্রিত মানুষ নয়। তারা পরিশুদ্ধ সংস্কৃতিশীলিত উন্নত আদর্শবাদি লোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোজগতে স্বাধীন চিন্তা ও উদ্দাম কল্পনাচারিতার ফলে যে রোমান্টিকতার প্লাবন এল তার পরিচয় জ্যোতিরিন্দ্রাথের প্রহসননের মধ্যেও চিহ্নিত হল। তাঁর প্রহসনের কতুকরস সাধারনত ঘটনার জটিলতা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। চরিত্রের দোষ ও বিকৃতি তিনিও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁর ব্যাঙ্গের আঘাত তীব্র হয়ে উঠে নি। লেখকের পরিহাস প্রিয়, সিগ্ধসহনশীল অন্তরের স্পর্শ সর্বত্রই পাওয়া যায়।

'অলীকবাবু' প্রহসনের হাস্যরস

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনের অলীকবাবু একটি অপূর্ব চরিত্র। মিথ্যাভাষন যে কতখানি আর্ট হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন পাওয়া যায় অলীকবাবুর

টিপ্পনী

সপ্রতিভ চটকদারী কথাবার্তায় ল সরল, সহজবুদ্ধি ও বিশ্বাসপরায়ন সত্যসিন্ধুকে সে তার কথার তোড় ও মিথ্যার ঘোরে বরবার কিভাবে বিস্মিত ও বিহ্বল করে দিয়েছেন তা দেখে দর্শক খুবই কৌতুক বোধ করে। কিন্তু অলীকবাবু যত বড় অভিনেতাই হোক না কেন, গদাধরের অভিনয় ক্ষমতা বোধ হয় আরও বেশি। বিভিন্ন রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসে সে যেভাবে বারবার অলীকবাবুকে সংকট থেকে উদ্ধার করেছে তাতে তার উপস্থিতি বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসনের আর একট ধারা উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক নায়িকা হেমাঙ্গিনীর চরিত্র থেকে। বেশি পড়াশোনা করে যেমন ডনকুইক্সোটের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বড়বেশি আসক্ত হয়ে হেমাঙ্গিনীও নিজের স্থানকাল ভুলে গিয়ে নিজেকে এক রোমান্টিক মনায়িকারূপেই কল্পনা করে বসেছিল। তার চোখে অলীকবাবু হল জগৎসিংহ আর সে নিজে হল তার প্রনয়ঙ্কিনী আয়েসা। কুমার জগৎসিংহ যখন আদালতের পেয়াদার গুঁতো খেয়ে পগ্রয়সী - প্রেয়সী বলে আর্ত চিৎকার করছিল তখন ভোঁতা বঁটি হাতে আয়েষারূপিনী হেমাঙ্গিনী রণস্থলে প্রবেশ করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করলেন -

"আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে বলছি, এই বন্দীই আমার প্রানেশ্বর - আমার কণ্ঠরত্ন। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরন করব না - যদি এর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তা হলে এই দন্ডেই প্রান বিসর্জন করব।"

এই প্রহসননে সরস পরিহাসের লক্ষ্য দুইটি মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষন এবং নাভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। ঘটনার পরম কৌতুকাবহ বৈচিত্র গদার দ্বারা ঘটেচে। প্রকৃতপক্ষে অলীকের থেকেও গদার সুচতুর কর্মতৎপরতা অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষন করে। গদা বার বার সাহায্যে না করলে অলীকবাবুর মিথ্যাবাদ যে কোন মুহর্তেই ধরা পড়ত এবং অলীক ও গদার পরপর-সান্নিধ্যে গদার কথার তুবড়ির কাছে অলীককেও চুপ করতে হয়েছে। কিন্তু গদা যে অলীকের মিথ্যাভাষনের সহকারী ছিলো তার দ্বারাই একই অবস্থার মধ্যে অলীকের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াটা যথার্থ হয় নি। বস্তুত পরহসনের শেষের দিকে ঘটনার সমাধান খুব স্বাভাবিক হয় নি, অলীকবাবু মিথ্যা অস্ত্রের বলে বেশ জিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন সকলে মিলে তাকে 'অভিমন্যুবধ' করে বসল। ঘটনার অনিবার্য গতির পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে তার আসল রূপটা যি বের হয়ে পড়ত তবেই হাস্যরসের ধারা ওনখানেই ব্যাহত হত না। গদার মুখে লম্বা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রহস্য উদঘাটনের উপায়টি খুবই দুর্বল হয়েছে। অলীকের বাক্য ও আচরন সত্যসিন্ধুর কাছে হাস্যরসাত্মক নয়, কারন সে অলীকের চেয়েও মূর্খ ও সরল। কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দর্শক শেক্সপীয়ারে 'ওয়েবস্টার ডিকস্যানারি' বায়রনের 'চেম্বার্স অ্যাটলাস' এবং কালিদাসের 'মুগ্ধবোধ' পড়া

অলীকপ্রকাশের বিদ্যার দৌড় বুঝতে পারে। তার মূর্খতা এবং সত্যসিন্ধু ও হেমমাঙ্গিনীর নিবুদ্ধিতা - দুই কারনেই দর্শক যথেষ্ট কৌতুক বোধ করে। হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমের নভেল পড়ে, নভেলী নায়িকার মত নিজেকে ভাবতে শিখেছে এবং তার ভাব ও আচরন বাস্তব সংসারের সম্পর্ক হারিয়ে নিজেকে ভাবতে শিখেছে এবং তার ভাব ও আচরন বাস্তব সংসারের সম্পর্ক হারিয়ে কল্পলোকে বিরাজ করেছে। মালিয়েরে 'Romentic Ladies' নামক প্রহসননের নায়িকাদ্বয়ের মত হেমাঙ্গিনী ও রোমান্সের সন্ধানে অধীর হয়ে উঠেছে। অলীকপ্রকাশ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, যে কোনো লোককেই সে নায়ক বললে কল্পনা করে তার সঙ্গে সে নায়িকার মত আচরন করত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চরিত্র সংস্থাননের উপর রসের বিকাশ এবং তাৎপর্য নির্ভর করে। মদের আড্ডাখানায় কেউ ধর্মকথা শোনালে ভক্তির উদ্রেক না হয়ে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। হেমমাঙ্গিনী প্রেমমূলক গুরুভাববিশিষ্ট কোন কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত নায়িকা হতে পারত। কিন্তু হাস্যজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে তার প্রেমপরায়নতা নিতান্তই বেমানান হয়ে হাস্যপদ হয়েছে।

অলীকবাবু নাটকের বিষয়বস্তু ও গঠন কৌশল

'অলীকবাবু' নামকরন রূপক ধর্মের দ্যোতক। তাঁর প্রহসন রচনার পছনে ফরাসি নাট্যকার মলিয়েমের প্রভাব বর্তমান। লেখক মলিয়মকে গুরু মেনে প্রহসন রচনায় অগ্রসর হন। নাট্য সমালোচকরাও স্বীকার করেছেন 'অলকবাবু' মলিয়মের 'ল্যা বুর্জেয়া জঁতিরম' নাটকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে রচিত।

'অলীকাবু' নাটকের 'অলীক' প্রকাশের বিশিষ্ট আচার আচরনকে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। 'অলীক' শব্দের অর্থ অসত্য বা মিথ্যা। এই নাটকের প্রধান চরিত্র শ্রীমান অলীক কলকাতার অভিজাত বাবু সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে নানা মিথ্যার জাল রচনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেপ্রয়াসী হয়েছেন। তাই সে তার মিথ্যাচারের ভিতর দিয়ে নিজের বিদ্য-বুদ্ধি প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং সংস্কৃতিবান একজন পুরুষ হসাবে নিজেকে জাহির করতে চায়। একজন সম্ভ্রান্ত অভিজাত বাবুর কি কি গুন বর্তমান থাকলে তবেই সে অভিজাত গোত্রভুক্ত হতে পারবেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তার যাবতিয় অলীক কল্পনার জাল বিস্তারের চেষ্টা এবং সে বিষয়ে সফল হয়েছে, সেই অলীক কল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছে গদার সহায়তায়। সে মঞ্চে যখন অনৃতভাষের সারবত্তা অসারে পরিনত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তকনই গদা তাকে রক্ষা করেছে। সত্যসিন্ধুবাবুর যখনি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে অলীকের কথায় তখনই গদা উপস্থিত হয়েছে অলীকবাবুকে বাচাঁতে। আবার লাটুভাইয়ের গল্প যখন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে তখনই দক্ষ কারিগরের মতো

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সত্যসিন্ধুবাবুর চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য সে নিজেই লাটুভাই সেজেছে। একইভাবে চীনেম্যানের কথা অবিশ্বাস করলে চীনেম্যান সেজে 'চুঁ চুঁ মাচু কাচু মিছি শালা হেমি ঠোর গর্ডান লিবে' বলে অভিনয়ে যে দক্ষ রূপকারে ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়ার এবং তা সফলভাবে উত্তীর্ন হওয়ার জন্য গদা চরিত্রের তুলনা অকল্পনীয় তা বোঝা যায় তার এই বিভিন্ন চরিত্রে নি৯জেকে প্রকাশ করার মাধ্যমে।

গ্রামীন বন-জঙ্গলে ভরা পুরানো চালচিত্র ভেঙ্গে হঠাৎ করে কলকাতা নগর তৈরির পথে, সে সময়ে এই নতুন কলকাতার আকর্ষনে একদল নানা পেশার মানুষভীড় করতে থাকে। তাদের আগমনে কলকাতা ধীরে ধীরে সেজে উঠে। জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনাঢ্য ও বর্নাঢ্য ব্যাক্তিরাও সমাজে একটু একটু করে জাবগা করে নিয়েছে। হঠাৎ ফুলে - ফেঁপে ওঠা বিত্তবান ব্যাক্তিরা জুড়ি গাড়ি হাকিয়া চলেছে। সেকালের এই কলকাতার ছবি বা সুনিপুন দক্ষ কারিগরের হাতে অঙ্কিত চিত্র রুপায়িত হয় উতোমের কলমের আচড়ে - "ক্রমে রোদ্দুরেদর তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারন্য হয়ে উঠলো। শহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন। কেউ কাসারীদের সঙের মত পালকি গাড়ির ছাদেদর উপর বসে চলেছেন। ছোটলোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।" - এই 'হঠাৎ বাবু'দেরই একজন অলীকবাবু। বাবু কালচার অনেকসময় মিথ্যা ভাষনের উপরেও দাঁড়িয়ে থাকত। সে সময়ের অনেক লেখায় তার নিদর্শন আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অলীকবাবু' প্রহসনে তেমন এক বাবুর কথাই তুলে ধরেছেন। টাকার প্রসঙ্গ বারবার উঠেছে - অলীকবাবু টাকার কথা প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় বলে যায় মিথ্যা ভাষন -

"আজ্ঞে ও একটা গাইয়ে৫০ টাকা দিকে ওকে চাকর রেখেছি।"

এখানেই তার মিথ্যা শেষ হয় না, সে আরও বলে -

"শহরের একজন খুব ধনী বলে আমি সত্যসিন্ধুর কাছে পরিচয় দিয়েছি দুই-একজন গাইয়েও যে আমার মাইনে করা চাকর আছে - সেইটাই তো বলা ভালো।"

এই যে বাবুদের ফাঁকা আওয়াজ সেকালের বাবুদের মধ্যে প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়েছে। গান-বাজনার ক্ষেত্রেও অলীকবাবু ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। তার রচনায় জানকী ও শ্রীরামের বাক্যালাপ হাস্যরস উদ্রেকারী -

"শ্রীরাম বলে, হে জানকী ভাঙবে কি তোর মান?

দবিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাঙবার না,

চরন ধরো হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রান।"

টিপ্পনী

এরকম গান শুনে সত্যসিন্ধু চমকিত হয়ে বলেন - "এটা তো বাল্মিকীর রচনা বলে বোধ হচ্ছে না, বাপু। এটা যে কেমন কেমন ঠেকছে।"

অলীকবাবু অসামান মিথ্যার আবরন দিয়ে বলে ওঠে - "ওটা নিজ বাল্মীকির না হোক কীর্তিরাম দাসের ভাঙা বটে।"

গানকে কেন্দ্র করে এমন রসিকতা বা দ্বিচারিতা হয়ত অলীকবাবুদের মত 'হঠাৎবাবু'র পক্ষেই সম্ভব । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেকালের রঙ্গপ্রিয় জনতা ও দর্শকের কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রকে কটাক্ষ করেছেন -

"ছিলি যেখানে সেখানে যাবনে ভৃঙ্গ
চটক ফটক দেখালে কি হবে।
আসকারা মসকারা পেয়ে করিস নেকো রঙ্গ
করিস নে করিস নে ম্যনানে মিছে ন্যাকেরা,
রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে খ্যাংরা ;
ধা কিটি তাক্ ধূমকিটি তাক ধেন্না উড়ে যা পতঙ্গ,
রঙ্গ ভঙ্গ দেখে জিলছে অঙ্গ।"

এধরনের গানের কথা শুনে সত্যসিন্ধু ব্যাঙ্গের ছলে সত্যি কথাটাই বলে -

"দিল্লি থাকে একিজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে একবার এসেছিল - সে বাবু এই রকম খিটিমিটি খিটিমিটি করে কত গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্ছে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত।"

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অলীকবাবু বলে - "উচ্চ অঙ্গের বই কি, মিঞা তানসেনের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ। অলীকবাবুর আজগুবি ও উদ্ভট সব রঙ্গরসের চাতুরি সমকালীন অলীক স্বপ্নের বাসিন্দাদের যে মুখে হাতে কালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তা বেশ বোঝা যায় ল অলীকবাবুদের অলীক কালচারের দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী হতে পারে। শিবনানথ শাস্ত্রী এই কলকাতাইয়া বাবু কালচারের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন তা স্মরনীয় - "এই সময়ে শহরের

টিপ্পনী

সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থাদিগের 'বাবু' নামমে এক শ্রেনীর মানুষ দেখা দিয়েছিল ল তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহিন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি মুখে, ভ্রপপাশহর্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা। শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানকে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ানন, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ির জুতা। ওই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাফ আখড়াই পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতিবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খরদেহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগের লইয়া দলে দলে নোকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালীন যে বাবু কালচারের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই বাবুদিগজের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অলীকবাবু' প্রহসননে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমান অলীকের মাধ্যমে। সেকালের আলোচ্য 'হঠাৎবাবু' চরিত্রের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে সে। তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের এক ছবি ফুটে উঠেছে। সেকালে বাবুদের সবন বিষয়েই আকর্ষন ছিল - গীত, বাদ্য, বিলাস্য ব্যাসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু প্রহসননে অলীকবাবু চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাননা বিষয়ে নিজেকে পারঙ্গম প্রমান করার একটি প্রবণতা উজ্জল হয়ে উঠেছে। অলীকবাবুর নানা মিথ্যাচারের রূপটি নাটকের পরতে পরতে ধরা পড়েছে এবং একই সঙ্গে নাগরিক সমাজের ছলাকলার বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়েছে।

এই বাবুরা আবার মোসাহেব দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন। তার প্রমাণ মিলবে তৎকালীন সংবাদপত্র পরিবেশিত সংবাদে ও নকশা জাতীয় রচনায়। কাকলীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় সে কালের মোসাহেবদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল; "এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে 'অব হজরত যাতে লন্ডনকো গাচ্ছেন, আর একজন মাতার চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজজুগ কচ্ছেন', বৈষ্ণব নদের চাঁদ দীক্ষা দেবার জন রামহরি বাবুর কাছে এলেন। মোসাহেরা বিরক্ত হল হুজুর রামহরি বাবুর প্রশ্ন 'দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণ ও বিলকজষনন মাকতাল ছিলেন।' গোস্বামী উত্তর দিতে পারলেন না, একজন মোসাহেবন বলে উঠলেন 'হুজুর! কালীই বড়ঃ দেখুন - কলীতেও কেষ্ঠতে ক পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে যে কার্ত্তিক তার বাহন মময়ূরের যে ল্যাজ কেষ্ঠোর মাথার উপর, সুতরাং কালীই বড়।" - এভাবে মোসাহেবদের রঙ্গ রসিকতাও চলত ইয়ার বন্ধুদের

মত। সহজ কথায় এরা বাবুদের অল্পিবাহক কখনও ভাড়। এরাই বাবুদের সব কাজকমর্ঞের উমেদারী করে দু'পয়সা রোজগার করত। অর্থাৎ এরা বাবুর প্রসাদ পাওয়ার জন্য দ্বিধাহনন ভাবে যে কোন ভাল মন্দ কাজে জড়িয়ে থাকত। তেমন ভাবেই 'অলীকবাবু' প্রহসননে কগদার কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না - সে কালের সমাজে মোসাহেবনদের ভুমিকা কী ছিল। আলোচ্য প্রহসনে গদা জগদীশবাবুর মোসাহেব সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে জগদীশ বাবু মিথ্যেবাদী বলে মমনে হলে, সে যে মিথ্যাবাদী নয় তা প্রমান করতে গদাকে বলেছে -

"গদাধর, তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ, তুমিই বোধ হয় নানা রকমম সঙ সেজে অলীকের মিথ্যে কথাগুলোকে সতভি করে দাঁআড় করিয়েছ। এখন সবন কথা খুলে বলো, না হলে তোমার আমি শাস্তি করব। আর দেখো, তুমি সব কথা খুলে না বললে আমি সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছি - যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে তাহলে বোধ হয় আমার কাছে তুমি কোনো কথা ভাঁড়াবে না।"

জগদীশবাবুর একথা শুনে গদা বলে -

"আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্ছেন - আর আমি চুপ করে থাকতে পারি নে - আমি সব খুলে বলছি ল একে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।"

এটাই ছিল কলকাতার বাবুদের মোসাহেবদের ভুমিকা।

উনিশ শতক থেকে এদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয় এবং একই সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা হয়। ধন ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষাদানের বিপক্ষে ছিলেন ফলে তারা অন্তঃপুরেই মেয়েদের শিক্ষা ও বিদ্যানচর্চার ব্যবস্থা করেন। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালী সমাজে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী শিক্ষার কু প্রভাব অনুমান করে ঈশ্বরগুপ্ত বলেন -

"যত ছুঁড়ি গলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন এ. বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।"

লেখাপড়া শিখে মেয়েরাও যে স্বাধীনভাবে মুত চিন্তা করতে শিখেছে এই প্রহসনে

টিপ্পনী

তার নিদর্শন আছে। হেমমাঙ্গিনী শিক্ষিতা। তাআই সে নিজের কথা প্রকাশে দ্বিধাহীন-

টিপ্পনী

"আমি এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করব, নদী যকন সাগর উদ্দেশ্যে যায় কে তাকে রোধ করতে পারে? আজ তটিনী সাগর উদ্দেশ্যে চলল - কল্ কল্ নিনাদে চলল দেখবে কে তোর গতিরোধ করে ? পিসনি, তুই তাঁকে কবর দে - আমি তার সঙ্গে আজ দেখা করবই করব। আমাকে দেখার জন্য না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।"

এই উচ্চারনে নভেলী ঢং থাকলেও স্বাধীন চিন্তার দিকটি অপ্রচ্ছন্ন থাকে না।

আবার বিধবা বিবাহও যেপ্রতিষ্ঠার পথে এবং তাকে জড়িয়ে নানা গুজব ও সামাজিক চাপান উতোর সেসবের প্রকাশ ঘটে "অলীকবাবু" প্রহসনে। সেকালে বিধবা বিবাহ সম্প্রসারনে বহু প্রগতিশীল অবস্থাপন্ন ব্যাক্তি অর্থ সাহায্য করতেন। গদার সংলাপে এ প্রসঙ্গ এসেছে। হয়ত অর্থপ্রাপ্তি আশায় বিধবা বিবাহ নিয়ে ছুৎমার্গ ক্রমশ দূর হচ্ছে। তাই মোসাহেব গদা জগদীশবাবু উদ্দেশ্য বলেছেন -

"আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বিবাহ কত্তে পারি, তাহলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে - এই বাড়ির চাকরানীকে বিধবা বিবাহে রাজি করিয়াছিলাম।"

গদা নিজের মনিবকে শুধু নয় স্বয়ং পাত্রীকে ও বিধবা বিবাহ নিয়ে বিস্তর জ্ঞান দিয়েছে ল বিধবা প্রসন্নকে এসব কথা জানিয়ে সে বিবাহে উৎসাহ দিয়েছে। তার ভঙ্গি সরস ও প্রহসনের উপযোগী -

"এ সে রে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা বে। এতে কোনো দোষ নেই। এখন দোষ নেই। এখানকার পন্ডিতেরা বলেছে যে বিধবাদেদর বে হতে পারে। এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্ছে, আবার বে'র আইনও হয়েছে। এই সেই দিন তো.... ভট্টাচায্যি মশায়ের বাড়িতে বিধবা বে হয়ে গেল, তাতে কত বড়ো পন্ডিত সব বিদেয় নয়ে গেল।"

গদার মুখে বিধবা বিষয় তথ্য শুনে বিধবা প্রসন্ন যারপর নাই খুশি হয়। সে বলে -

"ওমা কি হবে ! বিধবার বে হতে পারে ? যে পন্ডিত একথা বলেছে তাঁর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক।"

আসলে নির্ভেজাল হাসির মধ্যে ও লেখক সেই সময়ের বহু দাগ এ প্রহসননে রেখে গেলেন।

টিপ্পনী

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে শুধু পুরুষরাই নয়। নারীরাও নভেল পাঠের মাধ্যমে সমকালীন সাহিতভ সংস্কৃতির গুনপ্রাহী হয়ে উঠে এবং এ. বি শিখে বিবি সেজে, বাংলা নভেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের মনে হয়েছে নভেল যে কথা থাকে তেমন আর কোন গ্রন্থে থাকে না ল বঙ্কিমের নভেল পড়ে এরা নভেলী ভাষায় প্রেমপত্র লেখে। এবং নভেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার মতো উচ্চকণ্ঠে বলে-

"আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলছি, এই বন্দীই আমার প্রানেশ্বর।"

"অলীকবাবু' প্রহসনটিতে অন্যায প্রহসনের মতো প্রতিরোধ-প্রতিবাদের তীব্রতা নেই বললেই চলে। রয়েছে সরস পরিহাসের মধ্য দিয়ে কারোর ভন্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া। মূর্খ ব্যাক্তির পন্ডিত সাজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিজেকে জাহর করার প্রয়াস এসবই এসেছে অলীকবাবুর থাত ধরে। তার মিথ্যা ভাষননের সঙ্গী চতুর গদা ও তার উপযুক্ত সঙ্গতকারি। অন্যদিকে প্রহসনের অন্যতম চরিত্র হেমাঙ্গিনী নভেল পড়া রোমান্সের মধ্যে ডুবে থাকা মনটিও আমাদের নির্মল আনন্দ দান করে। সে তার অলীক কল্পনার মাধ্যমে এ কাহিনীর নায়ক অলীকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে আদর্শ নায়কের গুন। হেমাঙ্গিনীর অবাস্তব স্বপ্নচারিতা ও অনৃতভাষনের প্রতি সুক প্রহসননের মধ্যে সরস বাতাবরন তৈরি করে।

গ্রন্থাবলী

১। অলীক বাবু - জ্যোতিরিন্দনাথ ঠাকুর

২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস - অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন

৪। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস - ড. র্ধ্যাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৫। বালা নাটকের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য।

প্রশ্নাবলী

১। 'অলীকবাবু' নাটকের নামকরনের সার্থকতা বিচার কর।

টিপ্পনী

২। অলীকবাবু নাটকের হাস্যরসের স্বরূপ বিচার কর।

৩। অলীকবাবু নাটকের বাবু সম্রদায়ের য ছবি ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৪। অলিকবাবু নাটকের অলীক চরিত্রটি সার্থকতা বিচার কর।

৫। অলীকবাবু নাটকের নায়কা চরিত্রটির উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।

৬। অলীকবাবু নাটকের গদাধর চরিত্রটি বিশ্লেষন কর।

টিপ্পনী

কপালকুন্ডলা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্গেশনন্দিনীর মাত্র একবছর পর কপালকুন্ডলা (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। লেখক কিন্তু প্রথম গ্রন্থের সাফল্য সত্ত্বেও কোনোদিক থেকেই তার অনুবর্তন করেন নি। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাষাভঙ্গি পর্যন্ত সর্বত্র অন্য কিছু করলেন। এবং প্রতি ক্ষেত্রে প্রথমে লেখা থেকে উন্নতিতে নয়, তাঁর সৃষ্টির উচ্চতম পর্যায়ে কৌঁছলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরে ভালো উপন্যাস আরও লিখেছেন, কিন্তু কপালকুন্ডলার চেয়েও ভালো কিছু নয়ন । কপালকুন্ডলাকে প্রথম সংস্করনের পরে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঘষামাজা করেছেন, বিশেষ করে সমাপ্তিকে আরও ইঙ্গিতময় করেছেন, একটা গোটা অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। অতি সচেতন শিল্পকর্ম, প্রথম থেকে শেষ বাক্যটি সমান সতর্কতায় বুনট করা। সামান্য শিথিলচেতাকে প্রশ্রয় দেন নি। মূলে ছোট লেখা, এর ফলে আর ছোট হয়েছে।

চারটি খন্ডে একত্রিশ অধ্যায় বিন্যস্ত ২৩/২৪ হারার শব্দের কাহিনীতি। ঘটনাধারার বিকাশ অতি সুশৃঙ্খল, যেন রচনার সম্পূর্ন চেহারা ছবির মতো লেখকের সামনে স্পষ্ট ছিল। তৃতীয় খন্ডটি জুড়ে প্রধানত মতিবিবি-জাহাঙ্গীর মেহেরিন্নিসা সংক্রান্ত উপকাহিনী। সেখাননে লেখকের পদচারনা আরও সংযত । রাজকীয় ষড়যন্ত্র বা মোগলাই প্রনয়দ্বন্দ্বের চতুর নাগরালি অথবা জাহাঙ্গীর - মেহেরুন্নিসার সর্বজন-প্রিয় রোমান্টিক প্রনয় প্রসঙ্গের উপর দিয়ে দ্রুত বেগে চলে গিয়েছেন লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শিল্পীর প্রলুব্ধ হবার নানা উপকরন ছিল, কিন্তু ক্লাসিক মেজাজে সংযত থেকেছেন তিনি।

শুধু উপকাহিনীর ক্ষেত্রে নয়, তাঁর এই সংযম বর্ণনায় ও ঘটনা নির্বাচনে ও সতর্ক। অনেকে উপন্যাসটিকে 'কাব্য' বা কাব্যধর্মী রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কেন ? নিসর্গের কাব্যসুলভ বিচিত্র রূপ, রোমান্টিক কবিকল্পনার প্রিয় হবার মতো নিসর্গদুহিতা নির্জনবাসিনী নায়িকা - এসব উপাদান থাকা সত্ত্বেও যেমন সংক্ষিপ্ত তার বর্ণনা, তেমনি অনুচ্ছসিত এবং আবেগ ও প্রমহীনা রমনী। নায়কের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল। আরম্ভে বাইরে তাপ্রকাশ পেয়েই সৌন্দযের বমুখ রূপ দর্শনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, অন্তরের গিরে আশ্রয় নিয়েছে - রচনাটির দেহ কাব্য সুরভিত রাখে নি। কবিত্ব এই বইয়ের একটি প্রধান বিশেষত্ব। এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

টিপ্পনী

মাঝকানে একবছর (তৃতীয় খন্ডের ঘটনালীর কালবিস্তার) বাদ দীবে আগের দুখন্ডে মাত্র ৭ বা ১০ দিনের এবং পরের ৩৬ ঘন্টার বিবরন। সুনির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি ঘটনা। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাট্য সচেতন প্রয়োগ মানুষের জীবন ও ভাগ্যের একটা বৃহৎ সুর বেজে উঠেএ। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারন।

(১) ইতিহাস ও সংসার জীবনের তুচ্ছতা এবং নির্জন সমুদ্রোপকুল ও অরন্যের ভিষনতা এই তিন ধারার মিলন।

(২) অনুচ্ছসিত আভ্যন্তর কবিত্ব, নাট্যকোচিত গঠন তথা নাট্যতরঙ্গিত প্রয়োগ কৌশল এবং ঘটনাসজ্জার সহজ সম্বন্ধ । কবিত্ব, বহিরঙ্গ উচ্ছাস ও আতিশয্য নয় ; নাটুকেপনার চিহ্ন মাত্র নেই ; মুখ্য কাহিনীতে ঘটনাগুলির সুনির্বাচিত এবং স্বল্পায়ত্য ঐতিহাসিক অংশে অতিসংযত ও সংক্ষিপ্ত।

(৩) ভিতরে বিশাল ইতিহাসের ভূমিকায় ছড়িয়ে পড়ার বাসনা, কিন্তু আয়তনের অতিসংক্ষিপ্ত ও গাঢ গঠনে সংযমিত ; আবার বিশ্বব্যাপ্ত হাহাকারে সেই ঘনীভূত সংযম হয়ে উঠল ব্যাকুল ও অস্থির।

(৪) মুখ্য ও গৌন কাহিনীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে নিশ্চিত অভিপ্রায় কাজ করেছে। ভিতর দিক থেকে নানা স্তরের সাদৃশ্য-বৈপরীত্যের মাত্রা সৃষ্টি।

(৫) ভাষার তৎসম শব্দের বর্ণাঢ্য চিত্রময়তা, গাম্ভীর্য, সংলাপে ক্বচিৎ কবিত্ব কখনও কথা সরসতা, আবার নাটকোচিত আবেগ-বিস্পোরন বা দ্যোতনার বিদ্যৎ। অথচ ভাষারিতির এই ভিন্নতাই একটি বইয়ে পরস্পর অচ্ছেদ্য, স্বাভেবিক বন্ধনে আত্মীয়।

(৬) এত ছোট বইয়ে এত বিচিত্র স্বভাবের প্রানবন্ত মানুষের উপস্থিতি দুর্লভ প্রায়।

(৭) এর ট্রাজেডিতে ইউরোপীয় প্যাসন কেন্দ্রিক নাটকের স্বভাব, পশ্চিমী অদৃষ্ঠবাদ এবং বাঙালী প্রকৃতিতত্ত্বের একটি অভিনব সম্পর্ক অনুভূত।

কপালকুন্ডলা : ইতিহাসের ছায়াপাত

কপালকুন্ডলা উপন্যাসের সঙ্গে ভারতে মোগলযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস একটু যুক্ত আছে। ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর, ভাবী মহিষী নূরজাহান তখনও শের আফগানের স্ত্রী মেহেরুন্নিসা - তাদের ইতিহাসখ্যাত বর্নাঢ্য ব্যাক্তিত্ নিয়ে উপন্যাসমধ্যে স্থান পেয়েচে ল

অবশ্য লেখক তাদের একান্ত গৌন পাত্ররূপে অতি অল্পোসময়ের জন্য উপোন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ রেখেছেন, কীছুবেশি সময় ধরে তাদের প্রসঙ্গ ছায়া বিস্তার করেছে এবং অন্যতম মুখ্যপাত্রী কাল্পনিক মতিবিবি পশ্চাৎপটে মোগলাই ঐশ্বর্য-বিলাস-বাসনা-বিভ্রম-চক্রান্ত শক্তিমত্তার পেখম ছড়িয়ে রেখেছে। মোগল ইতিহাস মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করে নি। একপ্রান্তে পৃথক বর্ণবন্ত ঘটনামুখর উপকাহিনী নির্মান করেছে এবং কাহিনীর এক প্রধান পাত্রীকে রূপে চরিত্র বিশিষ্ট করে গড়ে তুলেছে।

রাজনৈতিক অংশটুকু মূলত ঐতিহাসিক । সেমিমপুত্র খসরুকে আকবরের উত্তরাধিকারী মনোনিত করার একটা চক্রান্ত প্রভাবশালী পরিষদবর্গ করেছিল । আকবর মৃত্যুর আগে সেলিমকে ক্ষমা করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষনা করে যান । এই তথ্যটুকুকে কাজে লাগিয়েছেন লেখক - যেভাবে একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে কাজে লাগান । রাজনৈতিক ঘটনাংশকে কাঠামো করে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো কাল্পনিক নারী মতিকে ব্যবহার করেছেন । তার লোভ কূটবুদ্ধি বাসনা প্রতিহিংসা মিলে ইতিহাসের তথ্যতে মানবিক কাহিনীর প্রাণ ও উত্তাপে পূর্ন করেছে । জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসাকে সামনে এনে দেখানোয় ইতিআসের মোহর আরও স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য এলফিনস্টেনের ভারত - ইতিহাসের প্রভাবে সেকালজকেকর অন্য লেখকদেদর মতো বঙ্কিমও সেলিম-মেহেরের পুর্বপ্রনয়ের গল্পে বীশ্বাস করেছেন । আধুনিক কালে একে ইতিহাসে রোমান্টিক প্রসঙ্গসংযোজন বলে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু সাহিত্যপাঠে অতটা রুঢ় হবানর দরকার নেই। সেলিম মেহেরের সুবিদিত ভবিষ্যৎ জীবন, সেলিমের যুবাবয়সে সুন্দরী নারী বিষয়ে চিত্তদৌর্বল্যের কথা এবং সাধারনভাবে মোগল রাজকীয় পরিবেশে অভিজাত তরুনদের ভোগাসক্তি ও অসংযম এসব মিলে একে সম্ভাব্য সত্য বলে মনে হবে ল বঙ্কিমচন্দ্র অল্প রাজনৈতিক ইতিহাস এবং প্রচুর ব্যাক্তিগত প্রবনতাকে মিলিয়ে সে-যুগের বাদশাহী পটটিকে সত্য করে তুলেছেন। এমন কি মতিবিবি লুফুন্নিসাকে ও একটি পুরোই ঐতিহাসিক রমণী চরিত্র বলে পাঠককে বিশ্বাস করিয়েছেন।

কপালকুন্ডলায় ইতিআসের সংযোগ একটা স্বাদবৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন লেখক এনেছেন, কিন্তু কখনও একে প্রধান কাহিনীর অংশ করে ফেলেন নি । যে অর্থে দুর্গেশনন্দিনী বা মৃনালিণীতেও আমরা ঐতিহাসিক রোমান্সের আর্শ খুঁজি, কপালকুন্ডলায় তা করা অসঙ্গত। শ্রেনিগত বিচারে এ রচননা একই বর্গের কিন্তু আসলে অনেক তফাৎ। প্রধান কাহিনীতে ও সমস্যায় ইতিহাসসাশ্রয়ী কল্পনা নেই, তাই ইতিহাসের যোগে যে বিশাল কলকোলাহল, জাতীয়-জীননের উত্থান-পতনের সুর, মহাকব্যিক সমগ্রতার বোধ, যুগবদলের দুন্দুভি শব্দের পরত্যাশা এখানে তা নেই। এখানে ইতহাসের স্বাদ আচে, কিন্তু

টিপ্পনী

শেষ পর্যন্ত একটি নারীর স্বভাবে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ল

টিপ্পনী

কপালকুন্ডলার ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালি সামাজিক পারিবারিক জিবনে একটু জায়গা করে নিয়েছে ল নবকুমারের সংসারের যে ছবিটুকে আচে তার কোনো বিস্তৃত চিত্র প্রকাশ পায় নি ল কিন্তু৮ কোলিন্যপীড়িত অবহেলিত বধূরূপে শ্যামার পরিচয়ে বাস্তবতা আছে, যে বাস্তবতা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিওল। বাঙালীর পরিবার জীনের সংস্থানে ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দী পার্থক্য চোখে পড়ে না, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নানা দকে নিবিড় ঐক্য অব্যাহত থেকেছে ল গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীরাও সাধারন গ্রামীন মানুষ বহু যুগে তাদের মন ও কাজের ধারা বদলাবার সুযোগ ঘটেনি এদেশে। পুরোহিত অধিকারী সম্বন্ধে একই কথা। এদের ষোড়শ শতকে স্থাপন করতে পাঠকের আপত্তি হবেএ ল আর সেকালের পথঘাট, পাল্কী ও পদব্রজে যাতাযাত, পান্থশালা, পথে ডাকাতি, লুঠতরাজ, কাপালিক তান্ত্রিকের নিভৃত বিভৎস ধর্মাচারন, জোর করে ধর্মান্তরিত করন এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সাধারনভাবে মধ্যযুগের ছাপ এনেছে রচনায়। ফলে ঐতিহাসিক অংশটির সঙ্গে এর বিবাদ ঘটেনি। অথচ রাজকীয় গৌরবহী এই সব অংশে অপরিচয়ের দূরত্ব নেই, এদের সমাজ-বাস্তবতার সংশয় আসে না। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষ করে তার পারিবারিক পটভূমিতে, যা স্বভাবত সরল উত্তেজনাহীন এবং উচ্চাকাঙ্খাহীন।

নবকুমারের ব্যাক্তিগত জীবনে যোবন আরম্ভ না হতেই বাইরে থেকে যা ড়েছিল, যুগের বা ইতিহাসের। তার শান্ত সংসারজীবনে যা ছিল সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র, ব্যাক্তিত্বের ভিতরে তা স্থায়ী বাসা বেঁধে ছিল। স্ত্রী পদ্মাবতীর বাবা বাধ্য হয়ে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে, ফলে পদ্মাবতী স্বামী পরিত্যক্ত হয়। এ ঘটনা আগের কাহিনীর মধ্যে আবার নবকুমারের জীবনে ইতিহাসের উউজ্জ্বল শানিত নায়িকা লুৎকুন্নিসার প্রবেশ। নবকুমারের দূর পল্লীবাসি নিরীহ নিস্তরঙ্গ জীবনটি ইতিহাস বড় কম অত্যাচার করে নি।

উপন্যাসের মুখ্যাপাত্রী শকুন্তলা কিন্তু ইতিহাসের কেউ নয়, পল্লীসমাজের বা সংসারের্ কেউ নয়। সে সমুদ্রতীরের অরণ্যের নির্জনতার। রোমান্টিক কল্পনা এক্ষেত্রে তান্ত্রিক সাধনা প্রকৃতির আদি শক্তি এরকম কিছু দেশীয় উপাদানকে অবলম্বন করেছে। এবং এই কল্পলোক ও অমানব নিসর্গ কপালকুন্ডলার মধ্যে দিয়ে নবকুমারের সাংসারিক জীবন সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

এই তিন ধরনের উপাদানের মিশ্রনে কপালকুন্ডলা উপন্যাসের গড়ন ঝটিল হতে বাধ্য। শুধু জটিল নয়, একটা বিশালতার বধে এই লেখাটি পাঠকের মন বেঁধে দেয় ল আকারে

অতি ছোট। সপ্তগ্রামের একটি বনাকীর্ন গ্রাম্য সংসার।ঔ একদিকে মোগল ইতিহাসের যুদ্ধ ষড়যন্ত্র কামনার বড় ঢেউ ভাঙছে। অন্যদিকে সমুদ্র বালিয়াড়ি জনহীন অরন্যের ভীষনতা ল আকাশের সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেবী কালিকার মায়া মূর্তি। আর সামনে আলালায়িত চুলে কপালকুন্ডলা । ফলে লেখাটির মধ্যে একটা মহাকাব্যিক বিপুলতার সুর বেজেছে যা রাজনৈতিক ইতিহাসে সংক্ষুব্ধ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মহার্ঘ্য এবং মৃত্যুর অনন্তে প্রসারিত । যুগক্রান্তির দামনা বাজেনি বলে এ উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না , কিন্তু সব সময়কে ডিঙিয়ে মহাকাল এই রচনাকে মহাকাব্যিক স্তরে উন্নিত করেছে।

উপন্যাস পাঠে এ প্রশ্ন ও উঠে আসে এ লেখায় আধুনিক মানুষ - তার সমস্যা কোথায়? তান্ত্রিক প্রকৃতিতত্ত্বে আত্মসমপর্নে কি একালের জীবনবাদ নির্জিত নয়?

এরূপ সংশয় ঘটার প্রকৃত কোনো কারন নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তান্ত্রিক চরিত্র আমদানি করেছেন দেশকালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। প্রকৃতিবাদের মধ্যে আদ্যাশক্তিরতত্ত্বের কিছু মিশ্রন যদি ঘটেও, তাতে যদি ইউরোপীয় 'ফেটালিজম' বা অদৃষ্টত্ত্ব কিছু স্বতন্ত্র রূপ পায় তাএ আপত্তি করা চলে না। আধুনিক চীনা গল্পকার লু সুন তার কোনো কোনো ছোটগল্প বিশেষত দীর্ঘকাহিনী 'ফোর্জিং অব দি সোর্ড' - এ চীনদেশীয় যদুবিশ্বাস, আদিম ক্রেতত্ত্ব ও গূঢ়বিদ্যার (ব্ল্যাক ম্যাজিক অ্যান্ড অকাল্টইজম) ব্যবহার করে রচনাগুলিকে খাঁটি চীনা বস্তু করে তুলেছিলেন। অথচ তার মধ্যে দিয়ে আধুনিক মানব বিশ্বাসেরও রূপায়ন ঘটেছে।

তন্ত্র কাপালিক আদ্যাশক্তি প্রভৃতির সহযোগে বঙ্কিম এই উপন্যাসে যর্থাথ ভারতীয়ত্বের একটি মাত্রা যুক্ত করেছেন । ইউরোপীয় অদৃষ্টবাদ তন্ত্রের ইঙ্গিতে প্রকৃতিতত্ত্বের মিশ্রনে কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে. । তবে এটা মনে রাখা দরকার যথার্থ অকান্টইজমের আমদানিও একালের সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে আধুনিক অভিপ্রায়েরই ফল । আমরা মাটির গভীরে শিকড় হারিয়ে নব সাহিত্য ও ভাবনার পত্তন করায় ঐতিহাসিক কারনেই মকিছুটা বিপদে পড়েছি।

কপালকুন্ডলা উপন্যাসের নরনারী অনেকটা ষোড়শ শতাব্দীর, অনেকটাই একালের এদেশে সময় সর্বদা জীবন ও মনের ভিতরে গভির খাত কেটে এগোয় না বলে, যারা মুখ্য মানুষ তাদের অনেকে ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে। তাই আচারে আলাপে বসনে সেকালের। কেউ বা গ্রামীন মানুষ, যেমন নবকুমার, সেকালের চরিত্র - একালে দূরত্ব দুস্তর নয়। কিন্তু এদের কৃষ্ণা ও যন্ত্রনা, হৃদয়কে একান্ত জেনে বাধা অতিক্রমের সংগ্রাম ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে দেখবার চোখ আমরা পাই নি। মানুষ নামক আশ্চর্য র্সভের একান্ত সন্ধান আগে আমরা আগে করিন - মহাকাব্যের যুগে যদি করেও থাকি - সে সহস্র সহস্র বছরের

টিপ্পনী

বিস্মৃত অধ্যায়, অদৃষ্ঠতত্ত্ব, সর্বসংহারী অন্ধ প্রকৃতি নিয়তিও যদি বা দর্শনের ও আরাধনার বিষয় থেকে থাকে, সুনিশ্চিত আত্ম সমর্পনের আধার হয়ে থাকে, বঙ্কিমে তা বিম্বকে চেনার অঙ্গ, জীবনকে হারাবার বিষয়, প্রমকে রক্ষা করার অনন্ত সংগ্রাম।

'কপালকুন্ডলা' সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী বত্রিশ বছরের বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি দায়িত্ব পালনে গিয়ে পৌঁছলেন তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার নেগুঁয়া নামক একটি স্থানে। জায়গাটি কাঁথির নিকটবর্তী দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের সন্নিকটস্থ। ডেপুট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এখানে থাকার সময়ই প্রথম বঙ্কিমের মাথায় আসে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের ভাবনা। এ প্রসঙ্গে বিবরণ পাওয়া যাবে বঙ্কিমন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্নচন্দ্রের লেখায়। পূর্নচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম - প্রসঙ্গ গ্রন্থে জানাছেন -

> "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেঁগুয়া মহকুমাতে (এক্ষনে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসি কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিলেন ; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গলোয় বাস করিতেন, তখন সেই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত ল চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারনা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেইবনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থানে হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন।"

১৮৬০ এর নভেম্বরে খুলায় বদলি হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। খুলনা গমনের পূর্বে সামান্য কিছুদিন তাঁর কাঁঠালপাড়ার পৈতৃক বাড়িতে অতিবাহিত করেছিলেন। সেসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র একবার দীনবন্নধু মিত্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপপাধ্যায়কে এটি প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছলেন, যদি শিশুকাল থেকে কোনো স্ত্রীলোক ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সমাজের বাইরে সমুদ্র তীরে বনমধ্যে কোনো কাপালিক কতৃক প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হলে সমাজ সংসর্গে আসে, তালে তার বণ্যপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব কি না এবং পরবর্তী কালেও কাপালিকের প্রভাব তার উপর থাকবে কি না। এই প্রশ্নে দীনবন্ধু কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র ব্যঙ্গপ্রিয় মানুষ। তিনি রসিকতা করে বললেন, যদি দরিদ্র ঘরে বিবাহ হয় মেয়েটা চোর হবে। পরে কোতুকচ্ছলে বলেছিলেন, কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে,

তারপর সন্তানাদি হলে স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মালে সমাজের লোক হয়ে পড়বে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তার মন থেকে একেবারে তিরোহিত হবে।

টিপ্পনী

অনুজ পূর্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সেদিন অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের এই উক্তি বঙ্গিমচন্দ্রের মনঃপুত হয় নি । তবে এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৮৬৬ সালে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বকল্তব্য অনুযায়ী মৃত বৌদ্ধধমর্মের শবনিগর্গলিত তন্ত্রবাদের শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বিভৎস বামাচার উত্থত হয়েছিল কাপালিকরা ছিল তার ধারক-বাহক । তাদের সম্পকর্কে বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা মোটেই প্রীতিপদ ছিল না। কপালকুধন্ডলার মতো বনচারী নারীকে পাওয়ার জন্য বঙ্কিমের এরকম একটি কাপালিক চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। হাতের কাছে চোখে দেখা একট উদাহরনও তিনি পেয়ে গেলেন চাঁদপুরের বাংলোতে থাকার সময়ে ল তাই সেই ডার্ক বা ডার্টি তান্ত্রিকতাকে সমালোচনা করার নিমিত্তই যেন 'কপালকুন্ডলা' উপ্যাসটি লিখে ফেললেন তিনি । 'কপালকুন্ডলা' লেখার বহু বছর পরে ১৮৮২ খ্রীঃ বঙ্কিম রেভারেন্ড এ.কে ব্যানার্জীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-

> "I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in Kapalkundala in regard to the mortality of that from of Hinduism . True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness.

এই সূত্রে বঙ্কিম আরও লিখেছেন চিঠিতে-

> "I can assure Dr. Banerjee that he [অর্থাৎ Hastie (হস্টি) নামক সাহেব] can not be more emphatic the condemnation of Tantrikism then I am ."

এ প্রসঙ্গে সমালোচক প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য-

"দীনবন্ধুর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং হয়ত 'শকুন্তল' ও টেম্পেস্ট (Tempest) পাঠ করিয়া এবং সমুদ্রতীরবাসী অরণ্যচারী কাপালিকের সহিত সাক্ষাতের ফলে যে প্রশ্ন তাঁহার মনে আসিয়াচিল 'কপালকুডলা' তাআর কাব্যাত্মক উত্তর।"

টিপ্পনী

এটি যদি হয়ন 'কপালকুন্ডলা' উপ্যাস লেখার মূল উদ্দেশ্য তবে অন্য উদ্দেশ্যটি অবশ্যই কাপালিক বা তান্ত্রিকতাকে নিন্দা করার অভিপ্রায়। আসলে বঙ্কিমের যে হিন্দুত্ববাদ, বা True Hinduism তার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এখানে শুধুই অন্ধকার।

দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের সহজ সমাধানে অতৃপ্ত বঙ্কিমের ভাবনা উঠে এসেছে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে। আর তার সঙ্গে আচে অমানবিক তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের বক্তব্য। তবে যাই হোক না কেন কপালকুন্ডলা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি একথা স্বীকারে দ্বিধা থাকে না পাঠকের।

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি চরিত্র

মতিবিবি এই উপন্যাসের উজ্জ্বল চরিত্র। মোগল ইতিহাস থেকে বিকিরিত ঐশ্বর্য, রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং লোভ, কাম-ঈর্ষা-হিংসাদি বৃত্তি তাকে বৈদ্যুতি দিয়েছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চাতুর্য, কর্মতৎপরতা, নাগরিক বৈদগ্ধ্য তার স্বভাবের উল্লেখযোগ্য লক্ষন। পদ্মাবতী-মতিবিবি-লুৎফুন্নিসা নামে যেমন পরিবর্তন, চরিত্রেরও তেমনি বিচিত্র রূপ।

বঙ্কিমমচেদ্রর প্রাব সকল উপন্যাসের নামকরন বিষবৃক্ষ হতে পারত। বিষবৃক্ষের রূপকল্পট বিষবৃক্ষ উপন্যাসের অনেক আগেই পাওয়া গেল 'কপালকুডলা' উপন্যাসে মতিবিবি প্রসঙ্গে-

> "ক্ষেত্রে বীজ রোপিতহইলে অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপনকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে । অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমিত হইল ; তথাপি যদিও তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায় মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাআর উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই - ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়। তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ঠ করে - চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।"

মতির বয়স যখন তেরো তখন তার বাবা ধর্মান্তর গ্রহন করে, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পরিত্যক্ত হয়। তখনকার কিছু স্মৃতি তার ছিল। সে স্মৃতি মধুর

কিনা জানা যায় না। স্বামীর চেহারা নয়, আমটুকু তার মনে ছিল। কিশোরী বয়স থেকেই তার চরিত্র ছিল অতি তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ। সামান্য একদিনের ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে তার প্রমান পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন -

টিপ্পনী

> "একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পতনী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাআকে শয়নাগার হইতে বহিস্কৃতা করিতে উদ্যাত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইছিল এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল। এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাপিয়াছিল, এমনই মস্তক হেলিয়াছিল।"

স্বভাবের অন্তর্লীন এই দর্প পরে বেড়েছিল, তার কাযর্ ও ভাবনার এক প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছিল।

মতিবিবি প্রসঙ্গে বঝঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "মতির মহাদোষ কলুষিত, মহাগুনেও শোভিত।" মতির চরিত্রের প্রধান দোষ তার অতিশয় ইন্দ্রিয়সক্তি আর তার মহৎগুনট হল সুগভীর প্রণয়। তার ব্যক্তিত্বের গভিরে ঢোকার জন্য মতির আরও পরিচয় উদ্ধৃত করা গেল -

> "আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গিত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন । রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুনবতীদিগের মধ্যে অগ্রগন্যা হইতে লাগিললেন । দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার সাদৃশ্য শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই। লুৎফুন্নিসার বয়স পূর্ন হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দম বেগবতী, ইন্দ্রিয়দনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি, এ কার্য সৎ, এ কার্য অসৎ এমনম বিচার করিয়া তিনি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন; যখন অসৎকর্মে অন্তকরন সুখী হইত তখন অসৎকর্ম করিতেন ; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাআ লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল । তাঁহার পূর্বস্বামী বর্তমান - ওমরাহেরাকেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিনী হইলেন না। মনে ভাবিলেন কুসুমে কুসুমে বিহারিনী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন রাইব?"

এই নারীর চিত্রে অতি তীব্র উচ্চাশা দেবে দেবে এটাই স্বাভাবিক। যুবরাজ সেলিমের

টিপ্পনী

সঙ্গে ঘনিষ্ট হৃদয় সম্পর্ক ঘটল। সে দিলীশ্বরী হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল, কিন্তু স্বপ্নন ঘোরে বা প্রমমোহে হতচেতন ল না। সকলেই অনুভব করে বুদ্ধিমতী মতি অচিরেই যুবরাজের পাটরানী হবে। এমন সময় মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সেলিমের সাক্ষাৎ হল এবং সেলিম সেদিনই মমেহেউন্নিসাকে তার হৃদয় দান করল। কিন্তু উভয়ের বিবাহের সুযোগ ঘটল না। শের আফগানের সঙ্গে মেহের উন্নিসার সম্বন্ধ পূর্বেই স্থির ছিল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তিসকল মতিবিবির অজ্ঞাত ছিল না ; সে নিশ্চিত বুঝেছিল মহামমতি আকবরের মৃত্যুর পর মেহের উন্নিসা সেলিমের মহিষি হবেই। সখী মেহে উন্নিসার দাসীত্ব সহ্য করা মতিবিবির পক্ষে সম্ভবপর নয় ; তাছাড়া সেলিম মতিকে উপেক্ষা করে মেহের উন্নিসার প্রতি ব্যস্ত - এই কারনেও মতিবিই প্রতিশোধস্পৃহায় মেতে উঠে।

রাজৈতিক চক্রান্ত বা ঐ জাতীয় সুকুশল কর্মোদ্যম ছাড়া মতির পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল না। ঘরের শান্তি নয়, প্রেমের তৃপ্তি নয়, আত্মনিবেদনের মাধুর্য নয়। কামনার গলিত ধাতু উদ্বেল তার ভিতরে, বিস্ফোরন না ঘটিয়ে তার রেআই নেই। কিন্তু এই চক্রান্ত ব্যর্থ হল। সেলিম এখন দিল্লীর বাদশাহ। এই সময় আরও যে আপাত সামান্য ঘটনাটি ঘটল মতির চিত্তবৃত্তির দিক থেকে তা সামান্য নয়। নবকুমার - কপালকুন্দলারসঙ্গে তার দেখা হল ল নাম শুনে চিনতে পারল এই তার সবামী। এখান থেকেই মতিবিবির জীবনের পরিসমাপ্তি, পুরাতন পদ্মাবতী মতির জীবনে নতুন করে আবর্ভূত হল ল পাঠরানীর চিন্তা মুহুর্তে দূর হল, মেহের উন্নিসার প্রতি ঈর্ষাও বিদ্বেষভাব ক্রমেই প্রশমিত হল। বর্ধমানের পথে চটিতে মতি পেষমনকে জিজ্ঞাসা করে - "পেষমন? আমার স্বামীকে কেমন দেখলে?"

শ্বশুর গৃহ থেকে পদ্মাবতী বিতাড়িত হয়েছিল মাত্র তেরো বৎসর বয়সে। এন 'উন্দরীর বয়ক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর ভাদ্রমাসের ভরা নদী। দীর্ঘ চতুদশবর্ষ পর যবনবালা মতিবিবি তার স্বামী নবকুমার দেখে বলল 'মেরা শৌহর'। নবকুমারকে সাক্ষাৎলাভের পর থেকেই মৃত পদ্মাবতী ধীরে ধীরে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে।

এরই বিপরীত চরিত্র হিসেবে বঙ্কিম শের আফগানের স্ত্রী মেহের উন্নিসাকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রনয়হীন বিবাহের মূল্য নেই। ধর্মত মেহের উন্নিসা শের আফগানের পত্নী, অন্তরে সে সেলিমের প্রনয় প্রত্যাশী ল মতির কাছ থেকে সম্রাট আকবরের মৃত্য সংবাদ জানার পরেই মেহের উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করে আপন মনে উচ্চা করে " সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?" মতি জাননতে চায় - "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবার বিস্মৃত হইতে পার নাই ?" তার উত্তরে মেহের উন্নিসা আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলে - "কাহাকে বিস্মৃত হইব ? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না ল কিন্তু আমার

শপথ, এ কথা যেন কর্নান্তরে না যায়।"

মতিবিবির চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই চিত্রের পরিপরক্ষিতে চতুদশবর্ষ পরেও মতিবিবি তার স্বামীকে বিস্মৃত হতে পারে নি। নিজের জবনের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকার জন্য বিলাসের মধ্যে সে আপনাকে বিসর্জন দিয়েছিল, ইন্দ্রিয়সুখান্বেষেনে ভ্রমরীর মত ঘুরে বেড়িয়েছিল - কিন্তু একদিনের জন্যও সে সুখী হয় নি। বঙ্কিম লিখেছেন আজ "দিল্লীর সিংহাসন লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশি বেষ্ঠিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল বিসর্জন দিয়া প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।" সুতরাং মতিবিবি আগ্রা পরিত্যাগ করে সপ্তগ্রামের পথে যাত্রা করল।

আগ্রা ত্যাগ করে যাওয়ার যথার্থ কারন কি - পেষমনকের এই প্রশ্নের উত্তরে মতিবিবি যে - কথাগুলি লে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তার থেকে মতিবিবির আচরনের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

"অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল ? সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম ? কোন দুষ্কর্ম না করিয়াছি ? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই ? ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই তো প্রচুর পরিমানে ভোগ করিলাম ল এত করিয়া কি হইল ? আমি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গলিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরে সুখী হই নাই, এক মুহুর্ত জন্যও কখন সুখ ভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষ্ণা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য ? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এতদিন একদিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্খা পার্বতী ইর্ব্বরিনীর ন্যায় - প্রথমে নির্মল, ক্ষীন ধারা বিজল প্রদেশে হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না ; আপনা আপনি কল কলকরে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই ; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দমময় হয়, লবনময় হয়, অগন্য সৈকত চর - মরুভূমি নদী হৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভুত হইয়া যায়, তখন সেই সকদম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে ?"

মতিবিবির মুখে যে কথাগুলি বিবৃত হয়েছে তাতে স্পষ্ট ইন্দ্রিয়জনিত যে সুখ তা অল্পকালস্থায়ী, ক্ষনিক ।তাতে তৃষ্ণা বাড়ে মাত্র, কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই। এখন প্রশ্ন যথার্থ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সুখপ্রাপ্তি উপায় কি? 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস বঙ্কিম বলেছেন, "ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়।" 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসেও দেখি এবল ভালবাসার আকাঙ্খায় মতিবিবি ক্ষনস্থায়ী ইন্দ্রিয় মুখমন্ডল পরিত্যাগ করল, পরিত্যাগ করল, প্রায় কামনায় রাজসিংহাসন কামনও পরিত্যক্ত হল।

এই কারনে মতি বলতে পারে - "আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমুর্তির মত ছিলাম। বাহির সুবর্ন রত্নাদিতে খচিত, ভিতরে পাষান, ইন্দ্রিয় সুখান্বেষনে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষান মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরন পাই।" মতিবিবি কুমারকে দেকার পর পরিপূর্ভাবে অণুভব করেছে - ইন্দ্রিয় নয় প্রনয়ই যথার্থ সুখের মূল। দিল্লীর বাদশাহ থাকতে ভালোবাসার জন্য অন্য সামান্য মানুষের খোঁজ কেন, এর উত্তরে মতি বলেছে - "আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন? ..... ললাটলিখন।" এ সমস্যার সমাধান নেই।

বঙ্কিম জাইয়েছেন - "পাষান দ্রব হইয়াছিল।" মতির হৃদয় গলে গেলেও তা তরল পাঁক নয়, গলে যাওয়া পাথর যার অন্য নাম লাভা। তাই তার আত্মনিবেদনেও গর্ব আছে, জয়ের তীব্র বাসনা আছে। নবকুমারকে সে জয় করে নিতে চায়, তার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে সে প্রস্তুত। সে যে নবকুমারের জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করে এসেছে প্রমের সেই গর্ব উচ্চকণ্ঠে বলতে পারে এবং এই প্রতিজ্ঞাও করে যে, এজন্মে সে আশা ত্যাগ করবে না।

হতাশার বেপথুমূর্তি মতির নয়। সে অবিলম্বে তৎপর হয়ে ওঠে। কপালকুন্ডলার সঙ্গে নবকুমারে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। তার মনে হয়েছে কপালকুন্ডলাই তার মিলনের পথে বাধা। নবকুমারের নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নটি তার মনে আসেনি। তাই কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কপালকুন্ডলাকে সরিয়ে দেবার।

কপালকুন্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সমস্যারই ঠিক সমাধান ঘটান নি। নবকুমার ও কপালকুন্ডলার একই সঙ্গে সলিল সমাধি। তার মতিবিবির এ সরব উপস্থিতি হঠাৎ ককরে হারিএ গেল। খুবই তুচ্ছ অনুল্লেখ্য বিবর্ন তার পরিসমাপ্তি।

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার চরিত্র

নবনকুমারের উপ্যাসের নায়ক। উপনাসের একেবারে শুরুতেই বঙ্কিম নবকুমারের সংস্কারবিহীন প্রগতিশীল মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন পাঠককে। পথ হারানো

নৌকার অভ্যন্তরে বসে নবকুমার ও জনৈক বৃদ্ধের কথোপকথনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বৃদ্ধ ও ক্ষিপ্ত সেই মানুষটিকে নবকুমার আশ্বস্ত করতে গেলে, তিনি রেগে উঠে বলেছিলেন, 'ব্যস্ত হব না ? বলো কি বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাকটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি ? নবকুমার প্রত্যুত্তর দিল - "আমি ও পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটিতে অভিভাবক কেহ নাই - মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।" ক্ষুব্ধ বৃদ্ধের প্রত্যুত্তর ছিল - "আসব না ? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত করে করিব ? নবকুমার বলেছে - "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরুপ হইতে পারে।" সে নিজে সাগরে এসেছিল তীর্থ করতে নয়, সমুদ্র দেখতে। এই সৌন্দর্য মুগ্ধতার দিকে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিপাত। তার আএগতপ্ত কণ্ঠস্বরে রঘুবংশের শ্লোক উচচারনে। যুবক নবকুমারের বিশেষভাবে নিসর্গ সৌন্দর্যে আত্মনিবেদনের মধ্যে তার ইবাহের ব্যর্থতার বিপরীত প্রভাব আছে কিনা নিঃস্দেহে বলা যায় না। কিশোরী পদ্মাবতী রূপসি ছিল। প্রথম তারুন্যের সেই মিলন সামাজিক কারনে চূড়ান্ত বিছেদে শেষ হল। সেই তিক্ত স্মৃতি নবকুমার ভুলতে পারলে নিশ্চয় আবার বিয়ে করত। কারন বিয়ে সেকালের বাঙালি পুরুষর সবচেয়ে সহজ ও সর্বজনীন কাজ ছিল। নবকুমারের স্মৃতির বিষ গোপনেই ছিল - বঙ্কিম তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন নি। কিন্তু ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয় তা অকারনে নয়। লেখক জানিএছেন - "রাজমহলে যাওয়ার পরে শশ্বুরের বা বনিতের কি অবস্থা হিল, তাআ নবকুমারের জানিবে পরিবার কোন উপায় রইল না এবং এ পযফন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না ল নবকুমার বিরাগ বশত আর দার-পরিগ্রহ করিলেন না।" নায়কের মনের কূট অংশ সমন্ধে পাঠককে সতর্ক করেন লেখক। তবে কাহিনীর গোড়াতে তার সক্রিয়তা ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নৌকাযাত্রীদের ইপদের আশঙ্কায় ধিরভাবে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নকুমারে ছিল। সাহসের সঙ্গে নির্জল বলে একাই কাঠ আনতে গিয়েছিল। ধর্ম ও জীবনাচার সম্পর্কে নিজের কালের তুলনায় বেশ উদারচিত্ততার পরিচয় মিলেছে।

নবকুমার সমুদ্র দেখতে এসেছিল। প্রথমবার সমুদ্র দেখেছে, কালিদাস তার মুগ্ধতার ভাষা যুগিয়েছেন। দ্বিতীয়বার সে সমুদ্র দেখল এং কপালকুন্ডলাকে সমুদ্র দেখে নকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, লেখকের বক্তব্য, তার মনে হয়ত ভুতপূর্ব কোনো সুখের উদয় হয়েছিল। এ ইঙ্গিত পাঠকদের পড়ার জন্য। এ কি নবকুমারের বর্থ দাম্পত্য জবন তথা রমনী-সংসর্গের ক্ষনস্থায়ী সুখ-স্মৃতি? নবকুমারকে পদ্মাবতী একেবারে ছেড়ে যায় নি। কোথায় কিভাবে আছে তা তার নিজেরও অজানা।

লক্ষনীয়, আআরে সমুদ্র দেখতে দেখতে সে কালকুন্ডলাকে দেখল। তার

টিপ্পনী

বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না। তার সক্রিয়তার - কি ভাবনায়, কি কার্যে আ বাকভে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাপালিক যখন তাকে বলি দেবার জন্য নিয়ে গেল তার আত্মরক্ষার চেষ্টা আরও প্রবল হয়ে ওঠার কথা। মৃত্যুভয়ে তার আরও বেশি কাতর হবার কথা। পরে অধিকারীর বাড়িতে কপালকুন্ডলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তার অনেক বেশি রোমাঞ্চিত হার কথা। এই নারী সংসর্গের শুরু থেকেই নায়ক নিষ্ক্রিয়, বিমনা, প্রায় নীরব। তার সব পৌরুষ, যৌন ভাআবেগ, সব অনুভূতি কোন অপার্থিব শক্তির দ্বারা গ্রস্থ হল।

অথচ পথে কিন্তু ভগ্নযাআন মতিবিবিকে নিজের কাঁধে ভর রেখে সে নিঃসঙ্কোচে নিরাপদ পান্থশালায় পৌঁছে দিয়েছে। তার অলঙ্কৃত সজ্জিত নারী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। নিশ্চয়ই ভিতরে চঞ্চলও হয়েচে। তার সৌন্দর্যের স্তবই করেছে "আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।" এই নবকুমার যেন অন্য মানুষ।

আর একটা কথা। নবকুমার স্পষ্তই মতিকে সন্দরীশ্রেষ্ঠা লেছে ল পরুহুর্তে কপালকুন্ডলার সৌন্দর্য যে অদ্বিতীয় তাও বলেছে। আসলে দুটি উক্তিই সতভ। মতিবিবি যদি শ্রেষ্ঠাসুন্দরী হয় তাহলে কপালকুন্ডলার রূপ স তুলনার উর্দ্ধে, মানবিক বাসনার অতীত ল নবকুমার তার থই পাব না, পেতে চাইল না বা চাইবার ক্ষমতা রাখে আ।

মতিবিবির সংস্পর্শে নবকুমার সহজ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বান পুরুষ ল তার আবেদনে সে আরবার সাড়া দিয়ে দেখা করতে গিয়েছে ল প্রনয় নিবেদন শুনেছে। অস্বীকার করেছে, আবার গিয়েছে। চরম কথা যেদিন বলল, নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে - সে 'যবনীজার' হতে রাজি নয়। কিন্তু যবী যদি পত্নী হয় - তার উত্তর দিতে পারে নি। নবকুমারের মনে কি মতি প্রেশ করেছিল ? নকুমার তা জানে না, মানতে রাজি নয়, তার গোটা অস্তিত্ব অউভূতি গ্রাস করে আছে কপালকুন্ডলা, তার স্ত্রী হলেও থাকে সে পায় নি। তীক্ষ্নধী মতির কি মনে হয়েছিল কপালকুন্ডলার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে নবকুমারকে যে জয় করে নেবে? সব অস্বীকৃতির ফাঁক দিয়ে সে কি মনের মধ্যে একটা পা ফেলার সাফল্য অনুভ করেছিল?

আর একটি তুলনাও এসে যায়। মতিবিবির ক্ষেত্রে পৌরুষ ও নীতির আস্ফালন দেখিয়ে নায়ক প্রেম প্রত্যাখান করেছে। শুধু অধিকারীর কথায় অজ্ঞাতকুলশীলা পোর্তুগীজ অপহৃতা, কাপালিকপালিতা কপালকুন্ডলাকে গ্রহন করার সময় মনে কোনো প্রশ্ন আসে নি কেন ? শুধু কৃতজ্ঞতায় ? আসলে কপালকুন্ডলার সংস্পর্শে নবকুমারের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, সর্বদাই পেত।

নবকুমারের সঙ্গে কপালকন্ডলার এক ছরের দাম্পত্য জীবন কিভাবে কেটেছিল

তার স্পষ্ট বিবরন এই। কিন্তু মনের বা দেহের নৈকট্য ঘটেনি এটুকু বুঝে নেওয়া সহজ। আসলে অনন্ত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে অসীম রূপ-সমুদ্রের পাড়ে সে দাঁড়িয়ে - তবু দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কোনো অসামান্য রূপসী তার জন্য আগ্রার সিংহাসন ছেড়ে এসেছে। কিন্তু নিজের বিবাহিতা পত্নী এই সরল বনবালার নের কোনো দরজা এই এক বছরেও খুলল না। তারা দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু একে অন্যের ভাষাও বোঝে না ল কপালকুন্ডলা রাতে জঙ্গলের মধ্যে ওষুধ খুঁজতে যাবে। নবকুমার সে-বিষয়ে দু-একটি মমত্বপূর্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। কপালকুন্ডলা যে উত্তর দিল তা একেবারে প্রতভাশিত ও স্বতন্ত্র। এতটাই দূরত্ব তাদের মধ্যে।

নবকুমার কপালকুন্ডলাকে ভালোবাসতে চাইছিল, তার প্রেমে সন্দেহ করতে চাইছিল, তার অনপ্রনয়ী সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হতে চাইছিল ল নবকুমার এক বৎসরে নিশ্চয় করে বুঝেছিল কপালকুন্ডলা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কেন ? অন্য কাহাকে ভালোবাসে ? যদি ভালোবাসার সুযোগ না মিলল, সন্দেহ করা যায় - অবিশ্বাস করা যাক। প্রেমের সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট, প্রেমের তো মানবিক। নবকুমার হৃদয়ের গভীরে জেনেছিল, কোনো আনবিক বৃত্তির আত্মীয়তা নেই এই রমনীতে। এই ভীষন শীতল গহন গভীর অজ্ঞাত অপরিচিতা নারীর সংসর্গে প্রতিক্ষন তার পৌরুষ নির্জিত। প্রচন্ড বেগে সে জেগে উঠতে চায়। অন্তত সন্দেহে, যখন কিছুতে প্রেমে জাগরন ঘটল না। রক্তমাংসের নারীর মতো কপালকুন্ডলা অবিশ্বাসিনী হোক, নিসর্গ-শক্তির মতো বিশ্বাস-অবীশ্বাসের উর্ধ্বাচারী নয়। এখানেই দীর্ঘস্থায়ী স্তব্ধতা থেকে আকস্মিক বিস্ফোরিত জাগরন।

নবকুমারের সন্দেহ ব্যাপারটা তাই আকস্মিক, আর সেটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তবে ব্রাহ্মনবেশীর চিঠি, কাপালিকের চক্রান্ত দিয়ে একটা আপাত বাতাবরন তৈরি হয়েছে ল নবকুমার ক্রোধে কওভে যন্ত্রনায় হতচেতন, সব বিবেচনাবোধ সে হারিয়ে ফেলেছে। সে বারবার মদ্যপান করে নিজের নিশ্চেষ্টতাকে উত্তেজিত করতে চাইছে। আসলে এক বছরের মের জট হঠাৎ খোলার চেষ্টায় বিপর্যয়। সে কপালকুন্ডলাকে বলি দিতে চলেছে। কিন্তু এসবই তার চিত্তজাগরনের পথ। নিজের মনোকূট দিয়ে গড়া একটা আবরন ভাঙা। যে মুহূর্তে হৃদয় খঁড়ে বেরিয়ে এল সেই একটি আর্তনাদ, বাকি সব যার প্রসাধন, "কাঁদিব কেন ? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি। তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই - তমি ত কখনও আপনার হৃদপিন্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিত আইস নাই।" আসলে নবকুমার মনের গভীরে জেনেছে এ নারী পূর্ণ হৃদয়হীনা।

কিন্তু বিশ্বাসে অবিশ্বাসে সমান নির্বিকার কপালকুন্ডলা গঙ্গার ভানে কোথায় ভেসে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গেল ল আর নবকুমারও - তার উত্তপ্ত বাসনা নিয়ে, প্রণয় জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি মধুর কোমল শব্দও না শুনে, সেই অপ্রাপনীয়ার সন্ধানে মৃত্যুর গভীরে নেমে গেল। নবকুমারকে কপালকুন্ডলা প্রথম দেখায় প্রশ্ন কলরেছিল, "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়ছ ?" ভ্রষ্টপথ সেই পথিককে কাপালিকের খড্গের মুখ থেকে বাঁচিএ, স্বামীরূপে গ্রহন করে আজ নদীগর্ভে নিয়ে চলল কপালকুন্ডলা। এটাই নবকুমারের পরিনতি।

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে 'কপালকুন্ডলা' চরিত্র

কপালকুন্ডলা নির্জন সৈকত অরন্য-মধ্যে কাপালিকের দ্বারা পালিতা জনসংসর্গ না ঘটায় সাংসারিক মানুষের বোধ ও মূল্য কোনটাই তার স্বভাবে বর্তায় নি। অধিকারীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাতের ফলেই সম্ভবত করুনার ন্ম, কাপালিকে তার লেশমাত্র ছিল না। অথবা নিসর্গ থেকেই সে পেয়েচিল নির্বিকার নিরাসক্তি এবং ইর্মম ঋদয়ঈন কারুন্য। কিংবা এসবই তার চরিত্র, স্বভাবমূলের রহস্য, কোন উৎৎসের খোঁজ মেলে না।

কপালকুন্ডলাকে মৃন্ময়ী নাম দিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ির লোক । সযত্নে তার এলোচুল বেঁধে তাকে মৃন্ময়ী করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু কপালকুন্ডলাকে মৃন্ময়ী করা যায় না এখাননেই কপালকুন্ডলার চরিত্র রহস্য । কপালকুন্ডলার মানবীরূপে ও স্বভাবে সংশয় রাখেন নি লেখক । তার ইতিহাস বিবত করেছেন । তার চরিত্র বৈশিষ্ঠ্যের সরল যুক্তিবাদী একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় । তবে তাকে ইসর্গের প্রতীক আ আদি প্রকৃতির নারীরূপ লেও মনে হয় কখনো কখনো । তার চরিত্রের জানলা দিয়ে পাঠককে প্রকৃতি রহসভের মুখে দাঁড়াতে হয়। এ উপন্যাসে মানবজীবনের সেই নিয়তি।

নবকুমারকে দেখে কপালকুন্ডলা উদ্বিগ্ন হল। নরবলি তার ভালো লাগাত না । তান্ত্রিকাচারে অভ্যস্ত হলেও তার মনের যোগ ছিল না তাতে - কোন কিছুর সঙ্গেই যেমন ছিল না তার মানস সম্পর্ক। আগে এখানে নিশ্চয় নরবলী হয়েছে। কিন্তু নবকুমারকে এত যত্নে সে বাঁচাল কেন ? কোন ভালোলাগা কি তৈরি হয়েছিল তার মনে ? এই প্রশ্নটিই শুধু মনে আসে। উত্তরের আভাসটুকুও পাওয়া যায় না।

নবকুমাকরের সঙ্গে কপালকুন্ডলার বিয়ে - কপালকুন্ডলার মনের উপর প্রায় প্রতিক্রিয়াহীন। শুধু অধিকারীর উপদেশজীবনরক্ষার জন ল তার নিজের জীবনরক্ষায়ও কি তার আগ্রহ ছিল ? বোঝা যায় না। অধিকারীর অনুসরনে বাধ্য আলিকার মতো সে কালীর পায়ে ত্রিপত্র দিয়েছিল কি তার মানস অভিপ্রায় ? ভবিষ্যৎ ভালো-মন্দের হদিস যদি প্রার্থনা করে থাকে, কি ভালো কি মন্দ জানত কি ? যে মন ভালো মন্দের পার্থক্য করে সে-মন কি চিল

কপালকুন্ডলার ? অধিকরীর দেওয়া ত্রিপত্র পড়ল কেন - একই উদ্দেশ্যে তো অর্পিত হয়েছি। নেহাত সংস্কার ছাড়া হয়ত আর কিছু নয়।

মতি তাকে অলঙ্কার দিল কেন - সে প্রশ্ন তোলে নি, আনন্দিত হয়নি, ঈষফাবোধ করে নি, বিস্ময়ও নয়। ভিকারীকে সে সব কিছু দিল নিরুদ্বেগ চিত্তর, দানের গর্ব নেই,. অলঙ্কার বিতৃষ্ণার জন্যও নয় ; ঠিক যেমন পরবর্তীকালে মতির এক কথায় স্বামী ও নিজের জীবন দুটোই দিতে সহজেই রাজি হয়েছিল। ভিখারির গয়নার বাক্স নিয়ে ছোটা তাকে অবাক করল কারন সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি তার ছিল না।

ননদ শ্যামা তাকে সাজিয়ে শিখীয়ে গৃহবধূ করে তুলতে চেয়েছিল। একবছর সংস্পর্শে ও অভিজ্ঞতায় তার বাইরের দিকে কিছু বদল ঘটেইল। কিন্তু প্রথমথেকেই থেকে এ জীবন কপালকুন্ডলা আকর্ষন বোধ করেনি। সমুদ্র সৈকতে বলে একাকী ঘুরে বেড়াবার অকারন আনন্দই তার কাম্য ছিল। বর্তমান অবস্থার অতৃপ্তি সে ব্যক্ত করেছে। সেজেগুজে ঘরসংসার করে সকলকে আনন্দ দিয়ে কিসের সুখ ? কিসের সুখ প্রসাধননে রূপে পুরুষকে আকর্ষন করে কপালকুন্ডলা তা বুঝতে পারে না। সে একটি উদাহরন দিয়েছে - ফুল দেখে যদি মানুষের সুখ তো ফুলের কি ? আসলে যে হৃদয়পুটে সুখদুঃখ জন্মে কপালকুন্ডলায় তা এত বিস্তৃত ছিল যে মানুষের সাধারন হিসেব মিলবে না।

সংসার থেকে একটা ব্যাপার তার মনে লেগেছিল, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস না করবার একটা ঝোঁক পুরুষদের ল বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে যোনতার যে সম্পর্ক কপালকুন্ডলা হয়ত তা ঠিক বুঝত না ল কিন্তু নবকুমারের মৌনতা ভেদ করে সে অণুভব করত একটা মূঢ় প্রশ্ন সেখানে উদ্যত। এখানেই কি অবিশ্বাস ! তবু কপালকুন্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকার করতে চেয়েছে। যদিও সে জানত না সেই উপকার কি, কেন আর সতভি উপকার কিনা। ভিখারির উপকারে গয়নার বাক্স দিয়ে দিতে, শ্যামার উপকারে ওষুধ আনতে, মতির উপকারে স্বামীদান করতে বা কাপালিকের উপকারে প্রানদানে তার সমান আগ্রহ। এই পৃথিবীর যঙ্গে এটুকুই তার বন্ধন। কারন মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণকুমার নবকুমারকে দেখতে পেল না।

মানবমনের গোপ অন্তঃপুর খুব সহজে জানা যাব না ল কখনও তা স্বপ্নে এসে ভিড় করে তির্যকভাবে। কপালকুন্ডলার স্বপ্নটি বিশ্লেষনের যোগ্য।

কপালকুন্ডলার দেখা স্বপ্নটি কতক রূপকধর্মী, কিন্তু সঙ্কেত গূঢ়। প্রথমাংশে একটি সোন্দর্য্য ও আনন্দের ভাবানুসঙ্গ। বাসন্তী রঙ্গের পতাকা, রাধাশ্যামের প্রণয়গিত নাবিকদের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ফুলের মালা প্রভৃতি প্রনয় ও যৌবনের যে সুর বাজাল, নায়িকার মনে তার শিকড় কোথায়? গোটা উপন্যাসে তো সে কথা মিলল না, বরং কপালকুন্ডল তার মনের খুঁজে কাউকে পাবনি - ব্রাহ্মনকুমারকেও নয় । সেটাই স্বাভাবিকি । কারন ভাষায় নয়, গহন অবচেতনায় যৌনচেতনার অতি সুক্ষ্ম যে তন্তু জড়িয়ে যাচ্ছিল - এখানে তার প্রকাশ বাঁকা পথে। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'কপালকুন্ডলাতত্ত্বে' বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, 'সেক্স-অ্যাট্রাকসন' নৈসর্গিক প্রবৃত্তজাত নয়, নারী প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নয়, কৃত্রিম সমাজ ও সভ্যতার কল। বঙ্কিমেরও অভিপ্রায় কি তাই ছিল? বঙ্কিম কিন্তু অনেক বড় সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, তাই অপ্রকট যৌনতা প্রকাশের কিঞ্চিৎ পথ করে রেখেএন নারীর অবিশ্বাসিনী হবার ব্যাপারটিকে না বুঝেও তানিয়ে বারবার কথা বলায় ও এই বোধ সামজিক সংস্পর্শে ফলে কিছুটা অন্যভাবে প্রকাশিত -কিংআ যুবক নবকুমারের প্রান বাঁচানোয়শুধু করুনা নয়, নারি প্রকৃতির মৌল যৌন চেতনার কিছু প্রতিফলন । কপালকুন্ডলায় নারীসুলভ চেতনা অন্তত অবচেতনারও কোথাও বীজকারে আছে - তা বোঝাবার ন্যই এ ধরনের ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ছিল। স্বপ্নের দ্বিতীয়াংশে মৃত্যুরূপক - পঞ্চতাত্মক দেহের বন্ধন। পড়ে যাওয়াটা প্রায় প্রতীকের মতো। অধ্যায় শীষের উদ্ধৃতিতে উপমা বলেও ধরা যায় 'a thundansmitten oak.' এই বজ্রপাত আসলে তার আত্মবিস্মরন।

কপালকুন্ডলার জীবনে কোনো গ্রন্থি নেই, কিন্তু দেহধারী জীবনের যে জৈব বন্ধন তা ছেঁড়াও সহজ নয়। কাপালিকের স্বপ্ন কথা এবং অনন্ত আকাশজোড়া কালীউর্তী দর্শনে সে সূত্রও লুপ্ত হল। কপালকুন্ডলা নির্বিকার চিত্তে বলি হতে চলল, সে বলি নবকুমারের হাতে বলেও মনে কোনো প্রশ্ন জাগল না। নিত্যকার স্নান যাত্রার মতো শান্তভাবে শ্মশানের মধ্যে দিয়ে অর্ধদগ্ধ শবটি ঘিরে সে চলল। বলিদাতা নবকুমার কিন্তু হতচেতনের মত শবদেহ মাড়িয়ে গেল। কপালকুন্ডলার হৃদয়ে সামান্য কম্পনও ছিল না, বরং নবকুমার কাঁপছিল বলে মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। যাকে বলি দেওয়া হবে সে শান্ত নির্বিকার সান্ত্বনাদাত্রী, যে বলি দেবে সে কিন্তু ভীষন উত্তেজিত, উন্মাদব্য। অবশ্য অল্পক্ষনের মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেল, কপালকুন্ডলা বলি নয়, বলি গ্রহনকারিনী। সে তো গঙ্গার ভাঙনে ডুবে গঙ্গায় ভেসে অনন্তে লীন, তার পিছনে ঝাপিয়ে পড়া নবকুমার আত্মঘাতী।

সব কর্ম, চেষ্টা, পৌরুষ, সাধকের সাধনা, বাসনার আগুন, অনায়াসে হারিয়ে যায়, ছিহ্নও রাখে না, অনাসক্ত প্রকৃতি ভীষনে-মধুর অনন্ত কল্লোলিনী, কপালকুন্ডলা মানব-প্রবৃত্তির নিষেধ এবং নিয়তি।

‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসে গৌন চরিত্র - শ্যামা, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা, কাপালিক

টিপ্পনী

এই চারটি চরিত্র কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপুর্ন বা প্রয়োজনীয়। মূল বা গৌন কাহিনীতে যেমন এদের গুরুতর, তেমনি চরিত্র হিসেবেও এরা বিশেষ ভাবনার অবকাশ রাখে।

শ্যামা

শ্যামা কপালকুন্ডলার একমাত্র নারী সঙ্গিনী, সংসার-জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র বন্ধন। তার সঙ্গে আলাপেই নায়িকা পরিবার - জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বাহ্যজ্ঞান পেয়েছে ল তার চেহারায়, পোশাকে এবং স্বভাবের বাইরের দিকে যেটুকু বদল তা ঘটেছে শ্যামার সচেতন চেষ্টায়। নায়িকাজীবনে শেষ দিকে ঘটনার যে জটটুকু প্রয়োজন ছিল, শ্যামার জন্য ওওষুধ আনতে যাবার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে ল মূল গল্পের দিক থেকে লেখক তাকে বেশ প্রয়োজনীয় চরিত্র তুলেছেন। কিছু উপন্যাসের জন্য শুধু নয়, তার নিজের স্বভাবে ও তাকে সত্য করে তোলা হয়েছে।

শ্যামার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, সেকালের হিন্দু বাঙালির পারিবারিক সংস্থানে বউ কুলীন বধূর জীবনের প্রতিনিধিত্ব তার মধ্যে। কিন্তু সরাসরি তার হা হুতাশ না দেখিয়ে প্রকাশের বুদ্ধিদিপ্ত কৌশলে তাকে বীশিষ্ট তা দেওয়া হয়েছে।

ভাইয়ের বউ কপালকুন্ডলাকে পেয়ে সে যে নিঃসঙ্গ জীবনে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল, হাসিতে রসিকতায় ছড়া বলায় তার চিহ্ন আছে। সন্ন্যাসিনী গৃহবধূ করে তোলায় তার মত্নের চেষ্টার শেষ নেই। নিশ্চয় ননদ-বোদির এই মধুর চিত্রটিও বাঙালী সংসারের কতক সত্য। সহজ বুদ্ধিতে সে জানে নারীর জবনে পুরুষ ‘পরশপাথর’ সোনা হয়ে উঠেছে যেমন তারই পেখম ছড়িয়ে দেবার মতো সাজ প্রসাধন, আর তারপরে চরিতার্থতা মাতৃত্বে, সোনার পুত্তলি’ কোলে পাওয়ার। তার বলা ছড়াটি উদ্ধারযোগ্য -

“বাঁধব চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে নিথির ধার কাঁকালাতে চন্দ্রাহার
কানে তোর দিব জোড়া দুল

টিপ্পনী

কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে কোলঢ তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে।।"

এর মধ্যে অনেক আদর নেক কৌতুক আছে ল কিন্তু এর ভিতরে আছে চাপা দুঃখ, যা সে নিজেও জানেনি, অথচ লেছে ল তথাকথিত 'পরশপাথর' সে-ও পেয়েছিল - কিন্তু 'নসোনা' হতে পারে নি - তার সাজসজ্জা করে আসে নি - সোনার পত্তলির খোঁজ মিলল না।

পরের অংশে যখন শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তার স্বামীর সাক্ষাৎ ঘটেছে। এই কৌতুক হাসি আর নেই। একটা তিব্র ্যাকুলতা, আশঙ্কা বড় হয়ে উঠেছে - কি করে বহুভর্তৃক স্বামীকে বশ করবে তার চিন্তা। তার ব্যাথার বড় মাপের দুঃখের গৌরব নেই, সংসার জবনের একান্ত বাস্তব কান্না আছে। আর সর্বোপরি কপালকুন্ডলার চূড়ান্ত প্রণয়হীনতার পটভুমিতে তার মৃদু গুঞ্জন গভীর বৈপরিত্য বেজেছে।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরকে বাদশাহ রুপে উপন্যাসে দেখা গেল মাত্র একটি অধ্যায়ে। কিন্তু যুবরাজ সেলিম রূপে তার উল্লেখ পেয়েছি আগে কয়েকবার। যুরাজ সেলিমকে অধিকারচ্যুত করার চক্রান্তে তার মহিষি, প্রনয়িনি মতি, বৈবাহিক খাঁ আজিম এবং অন্যান্য বহু ওমরাহ তৎপর। মৃত্যুকালে সম্রাট আকবরের শেষ চালে সেই চেষ্টা সফল হতে পারে নি। সেলিমের নিজের কোনো কৃতিত্ব তাতে ছিল না। কিন্তু সে সিংহাসন পেল। এর পরেও এক প্রধান চক্রী মতির সঙ্গে তার হৃদ্য ব্যবহারে মনে হয় রাজকীয় ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সে অনবহিত, অথবা সুন্দরী নারীর প্রেমের ব্যাপারে সে তা গ্রাহ্য করে না।

জাহাঙ্গীর - মতিবিবির কথোপকথনে মোগল বাদশাহের স্বভাবের এই ব্যাক্তিগত দিকটিই ব্যক্ত হয়েছে। অতি মার্জিত ও বিদগ্ধ উক্তিতে বাদশাহী আভিজাত্য ও একটা গম্ভীর ব্যাক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে অথচ তারল্যহীন প্রণয় বিহ্বলতা, রমনীরূপে ডানা - উড়াবার জন্য উদ্যতপ্রান যে পতঙ্গ অন্তরে কম্পিত হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে লাভা বিস্ফোরন ঘটা সম্ভব, পাঠক তা অনুভব করে। উল্লেখমাত্রে মেহেরুন্নিসার প্রেমের স্মৃতি তার চোখে তীব্র আবেগে জল এনে দিল - মেহেরকে লাভ করার সঙ্কল্প কত দুঢ় তা আভাসে স্বিকার করে ইতেও বাদশাহের সঙ্কোচ হল না। তেমনি মতিবিবির স্বতন্ত্রব্যক্তিত্ব ও রূপের সম্ভোগ বাসনাও কম

গভীর নয়, আবার তা প্রকাশেও কোন দ্বিধা ছিল না সেলিমের, কোন ছলনাও ছিল না। এই উক্তি তা প্রমান করে - "প্রেয়সী। ..... কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে ? এক আকাশে কি চন্দ্রসূর্য উভয়েই বিরাজ করে না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?

টিপ্পনী

জাহাঙ্গীর বুদ্ধিমান। মতি কেন রাজপুরী ত্যাগ করে যাচ্ছে বুঝতে তার অসুবিধা হল না। মেহেরুন্নিসার কাছে এক্ষেত্রে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে মতিবিবি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়েছে। জাহাঙ্গীরেরও মতির প্রতি মনোভাবে লাম্পট্যসূচক স্থূলতা ছিল না। এবং তার মতো রমনীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখলে আসল মানুষটাকে পাওয়া যাবে না এটুকু বোঝবার মত গভীর সংবেদনশীল জাহাঙ্গীরের ছিল। তাইও ব্যাথিত হৃদয়েই সে মতিকে যেতে দিল।

মেহেরের প্রতি গভির ভালবাসা সত্ত্বেও মতিবিবির জন্য তার এই হৃদয় ব্যাকুলতা কেন তার উত্তর বঙ্কিম দেন নি। মানব হৃদয় এক রহস্যভূমি। নানা নিতি ও আদর্শবাদী তত্ত্ব দিয়েও এসব সম্ভবনা রোধ করা যায় না। বঙ্কিমের উপন্যাসে বারবারই সোচ্চারে বা নীরবে এ সংকট উঠে এসেছে।

মেহেরুন্নিসা

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে মাত্র একটি অধ্যাএ মেহেরুন্নিসার দেখা পাওয়া যাব ল মাত্র একতি অধ্যায়ে বঙ্কিম ভবিষ্যতের নূরজাআনের যে ছবি এঁকেছেন তাতে বাদশাহী আভিজাত্য, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ। নিজের সোন্দয সম্পর্কে চাপা গর্ব, তীব্র গভির প্যাসনেট প্রেম, আকাশছোঁয়া উচ্চাশা, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা সংযম এবং অন্তদ্বর্ন্দ উত্তরনের সরব চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্রের এই সংক্ষিপ্ত রূপের মধ্যে যে প্রলোভন ছিল বঙ্কিমের মতো সংযমী শিল্পী তাতে অভিপ্রায় ভ্রষ্ঠ হন নি। স্বল্পপরিসরে তাকে সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে কোন ব্যতয় না ঘটিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র মেহেরুন্নিসার মুখ দিয়ে যে কটি কথা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে স্বভাবের পুর্বোক্ত লক্ষনগুলি নিহিত।

মেহেরুন্নিসার নিজের অলোকসামানভ রূপ সম্পর্কে চেতনা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গভির হতাশা বোধ প্রকাশিত হয়েছে এই উক্তিতে অবশ্য প্রকাশভঙ্গিতে একটা কাব্যসুলভ দার্শনিকতা রবেচে - "অন্যের তোমর মত চিন -নৈপুন্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত। মেহের কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ রাখিবে।" আর একটি উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে সেলিমের সঙ্গে প্রনয়ের উতপ্ত স্মৃতি, আপরিমেয় উচ্চাশার সঙ্গে

টিপ্পনী

বর্তমান সামন্যতায় গাঢ় অসন্তোষ ধরা পড়েছে ল যেমন নিজের রূপ তেমনি সামর্থ্য রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ মেধা এবং জাহাঙ্গীরকে সম্পূর্ন আয়ত্ত করার শক্তি সম্বন্ধে মেহেরের সংশয় ছিল না। ভাগ্যের চক্রান্তে বৈধমানের সামান্য কর্মাধ্যক্ষ শের আফগানের পত্নীর জীবনই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হয়েছে। যে বলেছে - "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?" যুবরাজ সেলিমের প্রতি ভালোবাসার সব উত্তাপ ধরা রয়েছে এই উক্তিতে - "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব কিন্তু যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।" মেহেবের মনের আরও ঝটিল রুপ ধরা পড়েছে তার পরবর্তী উক্তিতে। সে বলেছে - "মেহেরুউন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাহার ধ্যান করিবে। ..... দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না লক আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রানান্ত হয়, তবে স্বামীহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।" মেহেরুন্নিসা জাহাঙ্গীরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। সে নিশ্চিত জাহাঙ্গীরের মনের উপরে এখনও তার সম্পূর্ণ জয় - এত আত্মবিশ্বাস। কাজেই বাদশাহের অধিকার নিয়ে জাহাঙ্গীর তাকে পেতে চেষ্টা করতে পারে, স্বামীকে ত্যাগ করেও তাকে বরন করতে প্ররোচিত করতে পারে। অথবা শের আফগানকে হত্যা করেও তাকে লাভ করতে চাইতে পারে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেহেরুন্নিসা এতটা ভেবেছিল, জাহাঙ্গীরের মন তার এতই জানা ছিল অথবা মতি মারফত জাহাঙ্গীরকে জানাচিলো কত সহজে তার গোপন বাসনা এত দুর থেকেও মেহের প্রথম ভাগের মতো পড়তে পারে। এইসব কথার একটাই তাৎপর্য মানসিক আত্মসমর্পন। কিন্তু বাচ্যার্থে যে নিষেধ তাও আদৌ অর্থহীন নয়। বিবাহিতা নারী সে, অন্য পুরুষের প্রতি, হোক না তামাম হিন্দুস্থানের বাদশাহ - তার এই নোভাব পাপের। আর একটা ভাবনার স্তর, মেহেরুন্নিসা তাকে ভালোবাসলেও নিজেকে সঁপে দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে নেই, সে এত সহজলভ্য নয়। তার তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা আচে একথাটা ও ভারত সম্রাটকে কৌশলে বুঝিয়ে দেওয়া। মেহেরুন্নিসা হয়তো জানত, কিংবা জানত না, এই কথাগুলি জাহাঙ্গীরকে আরও লুব্ধ, আরও মত্ত করে তুলবে। অথবা ঠিক না -জেনেই সে জাহাঙ্গীরকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে স্বামী হত্যার জন্য। সংলাপের ভাষায় ইন্দরধনুর বর্ণছটায় কিভাবে বিচ্ছুরিত করে তুলতে হয়, সে কৌশল বঙ্কিমের জানা।

কাপালিক

বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিক চরিত্রটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও উপন্যাসের আরম্ভে এবং শেষে মাত্র দুবার হাজির করা হয়েছে ল যেন কপালকুন্ডলার সঙ্গে নবকুমারের পরিচয়ের আরম্ভে এবং সব পরিচয়ের চুড়ান্ত পরিনতিতে দ্বারে দাঁড়িয়ে এই কাপালিক একটা পথচিহ্নের মতো, যদিও ঐ পথের খোঁজ সে জানে না ল তার সব সচেতন অভিপ্রায় দুবারই

ব্যর্থ হয়েছে, যে জাতীয় ভবিষ্যতের কথা সে ভাবেও নি - যেমন কপালকুন্ডলার আগুন্তকের সঙ্গে বিয়েতে অথবা গঙ্গাবক্ষে লীন হয়ে যাওয়ায় - তাই ঘটেছে । কপালকুন্ডলায় মানব সংসারের উর্ধ্বচারী আদ্যপ্রকৃতি তত্ত্বের যে ব্যঞ্জনা তার চারধারে বৃথাই ঘুরেছে কাপালিক, সে সত্যে প্রবেশ করতে পারে নি।

কাপালিকের চারধারে লেখক একটা ভয়াল পরিবেশ তৈরি পরেছেন। আরম্ভে তার যে রূপ নবকুমারের চোখে পড়েছিল সংযত ভাষায় এবং উপকরন নির্বাচনে তা অসুচিভেদ্য । লেখকের ভাষায় "……কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দুলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা ; আয়ত মুখমন্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্ঠিত । সম্মুখে কাষ্টে অগ্নি জ্বলিতেছিল ….. জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। ….. সম্মুখে নরকপাল… তন্মধ্যে রক্ত বর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে - এমন কি, যোগাসনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখন্ড গ্রথিত রহিয়াছে।"

কাপালিকের ভীষনরূপ, বিভৎস উদ্দেশ্য, শবসাধনার জন্য নবকুমারকে বলি দেবার চেষ্টা - এসব সত্ত্বেও লেখক তাকে সাধারন স্তরের এক নরঘাতক করে তোলেন নি। অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী হলেও যেমন তাকে 'মহাপুরুষ' বলে আখ্যাত করেছে। তেমনি পাঠকের তাকে এক ব্যক্তিত্ববান বিশাল মানুষ বলে হয়। প্রথম দেখায় সে স্বল্পবাক্, প্রায় মৌন। কয়েকটি মাত্র কথা যে প্রথম পর্যায়ে বলেছে। যার বেশির ভাগই সংস্কৃতে। সে নিজের অভিপ্রায়ে অবিচল। নিঃসংশয়, অবজ্ঞায় চারপাশের জীবমাত্রকে একান্ত ক্ষুদ্র তুচ্ছ শক্তিহীন মনে করা - সবমিলে কাপালিক চরিত্রটিকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছেন লেখক। নবকুমারের প্রতি তার উক্তি - "মূর্খ ! কি জন্য বল প্রকাশ কর ? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল ভৈরবীর পূজায় তোমার মাংসপিন্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে" এরমধ্যে দিয়ে তার মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে।

যে মুহূর্তে তার পরিকল্পিত ঘটনাধারায় ছেদ পড়ল, সে কিন্তু আর অবিচল রইল না। অপ্রত্যাশিতভাবে নকুমারের মত একটা 'বলি' হাতে পেয়ে সে উল্লাস বোধ করে নি। ভৈরবি প্রেরিত বলে শান্তভাবেই গ্রহন করেছে ল কিন্তু সে লি হাত ছাড়া হলে সে তা ভৈরবির ইচ্ছা বলে মেনে নেয় নি। কপালকুন্ডলা যে নবকুমারকে মুক্তি দিয়েচে কাপালিক তা বুঝতে পেরেছে। এই মুক্তিদানকে মহাভৈরবীর নিজ হাতের কাজ বলে স্বীকার করে নি ল তার হাতে পালিতা কপালকুন্ডলার এই আচরন তার একেবারেই মনঃপুত হয় নি। কপালকুন্ডলা তার বিরুদ্ধাচারন করেছে এটা মেনে নিতে পারে নি কাপালিক ল তার সব স্থৈর্য ইপর্যন্ত হয়েচে, এমন কি মনের ও কার্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য সেহারিয়ে ফেলেছে। এত সহজে বালিয়াড়ির

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্তুপ ভেঙে পড়ে যাওয়াটা প্রায় প্রতীকের মতোল অধ্যায় শীর্ষের উদ্ধৃতিতে উপমা বলেও ধরা যায় 'a tundermitten oak' এই বজ্রপাত আসলে তার আত্মবিস্মরন।

কাপালিকের দ্বিতীয় স্তরটি এই 'বজ্রাহত মহাবৃক্ষের' চবি। তার দুই বলিষ্ঠ আহু ভেঙে অকর্মন্য হয়ে গিয়েছে। দেহধৃত আত্মার ও নির্মম পতন হয়েছে। কাপালিক আর বলিষ্ঠ ঋজু ভীষন নেই, সে চক্রান্তকারী হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসাই তার জিবনের একমাত্র লক্ষভ আজ। কাপালিক আমাচারি তন্ত্র সাধার যে সিদ্ধি কামনা করেছিল তার স্বরূপ উপন্যাসে বিবৃত হয় নিই। তার কতটা পার্থিব উচ্চাশা, কততা অপাথফিব মোক্ষ মুক্তি তা পাঠক জানে নে। কিন্তু বাহু ভঙে যাওয়ায় সেই আবত্তপ্রায় সিদ্ধি স্খলিত ল তন্ত্র-সাধনা পঙচকায়া শরীরে পুর্নাঙ্গ বলিষ্ঠতা ছাড়া অসিদ্ধ। কাপালিক এর জন্য কপালকুন্ডলাকে অর্থাৎ নবকুমারকে নিয়ে তার পা।আয়নকেই দায়ী করে, নিজের অপ্রকৃতিস্থ অনুসন্ধানকে নয় ল কাপালিকের মনের গভীরে কোনো স্তরে কপালকুন্ডলা সংশ্লিষ্ট এক নিগূঢ় বিদ্বেষ জমা হয়েছে। সেখানে বহুকাল পোষিত ও অচরিতার্থ সূক্ষ্ম মৌন বাসনা থাকা সম্ভব। সাধনামার্গ থেকে ভ্রষ্ট হবার ক্রোথ যা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দোষি করে মানসিক স্বস্তি পেতে চায় তাও কপালকুন্ডলার প্রতিই মনের তর্জী তুলল ল কারন কাপালিকের সব সাধনার অন্তরালে মানবিক ভাবাবেগ কপালকুন্ডলা - মাত্র কপালকুন্ডলা সম্বন্ধেই জাগ্রত ল সুপ্ত সেই ভাবনার প্রকাশ আগে ঘটে নি, কিন্তু তার স্বপ্নে বাঁকা ভাবে ছায়া ফেলেছে ল স্বপ্নে ভবানী আবিভূর্তা হয়ে তাকে বলেছে, রে দুরাচার, তোরই চিত্তশুদ্ধিহেতু আমার পুজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালাসা বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোনিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তেও পুর্বকৃত ফল বিনষ্ঠ হইল। ... সেই কপালকুন্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে।"

কাপালিক এই স্বপ্নের কথা তৈরি করে বলেনি, কারন অতটা কল্পনাশক্তি তার ছিল না, তাছাড়া লেখক বলেছেন 'স্বপ্নের কথা বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল।' এরূপ অভিনয় তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং এ স্বপ্ন তার মনোকূটের, তার ধর্মবিশ্বাসের, এ প্রশ্ন তার প্রতিহিংসা বাসনার বিশ্বাসে ভগ্ন প্রতিমা (Distorted image)।

কাপালিক নবকুমারকে 'মাংসপিন্ড বলে মনে করেছিল তাকে বলি দেবার পিছনে দ্বেষ-হিংসা-ক্রোধাদি ছিল না। কপালকুন্ডলাকে তার একদা ইন্দ্রিয়লালসার পাত্রী এবং সম্প্রতি অনাবত্ত নারী বলে ক্রোধে ঈর্ষায়, প্রতিহিংসায় বধ করতে চেয়েছে ল 'ভবানীর কৃপা লাভের বাসনা' বা দেবির প্রত্যাদেশ আসলে তার নিজের ব্যাক্তিগত অভিলাষ ল কিন্তু মিথ্যা করে ভবানির উপরে নিজের অভিপ্রায় চাপায়নি। তার মনের গঠনই দেবীর আদেশে আর

নিজের উদ্দেশ্যে এক করে ফেলেছে।

কাপালিকের পরিণতি বিস্ময়কর। পুজার ও বলির সব আয়োজন করে সে নিশ্চিত য়ে সে রইল। কার বলি? কে দেবে? কেগ্রন করবে? অজ্ঞাত অন্য উঃসে তার যে মীমাংসা ঘটে গেল, কাপালিককে সম্পূর্ন অগ্রহ্য করে, অস্বীকার করে, সে জানতেও পারল না, তা বোঝার ক্ষমতা ও তার ছিল না। এখানেই চরিত্র কল্পনায় লেখকের অশিথিলল দৃঢ় মুষ্টি।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী

১। 'যে নিগূঢ় ভাবসঙ্গিত শ্রেষ্ঠ রোমান্সের লক্ষন, যে অনিবার্য ঘটনা পরিনতির একমুখিতা মহঃ ট্রাজেডির প্রানশক্তি সেই উভয়বিধ উৎকর্ষই কপালকুন্ডলাতে উদাহৃত হইয়াছে" - উক্তিটি বিচার কর।

২। 'কপালকুন্লা' উপ্যাসের ঘটনা সমাবেশে ইতিহাসের প্রভাব কতদূর লক্ষনীয় তার আলোচনা কর? একে ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া সঙ্গত কি না এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ কর।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি চরিত্রটি আলোচনা কর।

৪। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের বকুমারকে কি নায়ক বলা যায় - বিচার কর।

৫। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের কপালকুন্ডলা চরিত্র কতখনি সার্থক ব্যাখ্যা কর।

৬। 'কপালকুন্ডলা' উপনাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্ব বিচার কর।

গ্রন্থাবলী

১। বঙ্কিম বিদ্যা - অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

২। বঙ্কিম সরনী - প্রমথনাথ বিশী

৩। বঙ্কিম মানস - অরবিন্দ পোদ্দার

৪। বঙ্কিমচন্দ্র - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

টিপ্পনী

স্বর্নলতা

টিপ্পনী

তারকনাথ বন্দোপাধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল যে আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) বইটি দিয়ে তাতে ধরা পড়েছিল সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার ছবি, অথচ প্রায় একই সময়ে ভূদের মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) এর অন্তর্গত সকল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় এর মতো রোমান্সধর্মী রচনা। এটা ভাবতে সত্যি খুব আশ্চর্য লাগে। সামান্য পরে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই পথ ধরলেন। দূর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃনালিনী (১৮৬৯)উপন্যাসগুলিতে । স্কটকেই তিনি আদর্শ করলেন, চালর্স ডিকেন্সকে নয়। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭) বা কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) অবশ্য সেই রীতির থেকে আলাদা। তাছাড়া সেখানে এসেই যে উপন্যাস রচনার একটা নিদিষ্ট ছক খুঁজে পেলেন এমনও বলা যায় না। কারন আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪), সতারাম (১৮৮৭) - এ দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মডেল। বঙ্কিম-অনুবর্তী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবী কঙ্কন (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) বা রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭১) তেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ঔপনাসিক সত্তার সার্থকতা যদিওও তার সংসার (১৮৮৬) বা সমাজ (১৮৯৪) সেই অভ্যস্ত পরম্পরার ব্যাতিক্রম ল প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গধিপ পরাজয় (প্রথম খন্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮৪০ বা স্বর্নকুমারী দেবির দীপনির্বান (১৮৭৬), মিবাররাজ (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা (১৮৯৫) - তেও ইতিহাস রোমান্সের ধারারই অনুসরন। ব্যাতিক্র বলা যেতে স্নেহলতা (প্রথমখন্ড ১৮৯০, দ্বিতীয় খন্ড১৮৯৩) এবং কাহাকে (১৮৯৮) বাঙালী গার্হস্থ্যজীবনে তেমন কোনো উত্তেজক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ছিল না বলেই সম্ভবত বেশির ভাগ বাঙালী ঔপনাসিক সেদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন ল রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' (১৮৯২) গল্পে মিনির বাবা একজন লেখক, কিন্তু সপ্তদশ পরিচছেদে উপনীত তাঁর উপন্যাসেরও বিষয় - প্রতাপসিংহ ও কাঞ্চনমালার রোমান্স ; কোনো সাধারন বাঙালী জীবনের আখ্যান নয়। অথচ এর পাশাপাশি নকশা লেখকরা প্রহসন রচয়িতারা সমসাময়িক জীবনকেই আশ্রয় করেন, খুঁজে নেন তাঁদের বিদ্রুপের উপকরন। ফলে ভবানিচরন বন্দোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নববাবুবিলাস (১৮৫৩), নববিবিবিলাস (১৮৫৩) থেকে শুরু করে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২), মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) থেকে শুরু করে দীনন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী বা ইন্দ্রনাথ

টিপ্পনী

বন্দোপাধ্যায়ের কল্পগুরু (১৮৭৪) তে সমকালীন জীবনচিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে, উপন্যাসে তার নজির খুবই অপ্রতুল।

বঙ্কিমী রোমান্স ধর্মিতার যুগে তারকনাথ বন্দোপাধ্যায় স্বর্নলতা (১৮৭৪) একটি ভিন্নধর্মী উপন্যাস। তারকনাথের জিবনী পাঠ করে জানা যায় যে স্কট নয় তার আদর্শ সাহিত্যিক ছিলেন দিফেন্স ল এতেই ওঝা যায়, রোমান্সের জগতের পরিবর্তে চোখে দেখা বাস্তব জিবনই তাঁর উপন্যাসরচনার পরিকল্পনার পিছনে প্ররনা জুগিয়েচিলেন। ্বভাবতই বঙ্কিমের দেকানো উপন্যাসের মডেল তাঁর পচ্ছন্দ হয় নিঃস্বর্নলতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ করে তাঁর ঈষঃ তির্যক মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য-

> "গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নাইলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন এবং মাইকেল বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানদের অন্তঃপুর বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েশার কথোপকথোন শুনিতে পাইলেন? ইহা ভিন্ন গ্রন্থাকার দিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। ..... এই শক্তির প্রভাবে্ বঙ্কিমবাবু আড়াইশত বৎসর পূর্বে এক যবনতনয়ার মুক হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্যজাতিব কামিনীগনের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। একথা আমাদিগনের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিব তাহা, এ পাঠকগন ল আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে।"

এসব কথার মথ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট যে বঙ্কিমের দেখানো পথে তারকনাথ হাঁটবেন না।

'স্বর্নলতা'-র আখ্যাপত্রে হোরেসের একটি ছত্র উৎকলিত ছিল - Fictions to please should wean the face of truth." এখাননে 'truth' বলতে মুলত বাস্তসত্যকেই বোঝানো হয়েছে। বঙ্কিমী আদর্শের সম্পূর্ন বিরোধ এই উপ্যাসে "calcutta Review" (1882) এর সমালোচককের প্রশংসা পেয়েছিল এর অনন্যতার জন্য-

> This is the only true novel we have read in Bengali. Babu

Bankim Chandra's works being poems, not novels ..... In describing Bengali domestic life, in desiccating real characters, in sketching ordinary scene, the author of 'swarnalata'', Babu Taraknath Ganguli, is without arrival among Bengali writers of a fiction . he is a close observer of men and meanners, and e has a facultu, which seems to be exclusively his, for working up ordinary materals into a highly effective picture..... & a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious tragic side. babu Taraknath is unrivalled among Bengali authors.

টিপ্পনী

এই বাস্তবনিষ্ঠার কারনেই স্বর্নলতা সেকালের অনেক পাঠকের ভালো লেগেছিল, যদিও সয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বইটি বিঢ়য়ে কিছুই বলেন নি। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গধিপ পরাজয়' কে অবলম্বন করেও বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করা হয়েছিল । রক্ষনশীলেরাও তারকনাথের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। 'স্বর্নলতা' লিখে তারকনাথ সমকালে খুব বিখ্যত হয়েছিলেন । উপনাসটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । ইন্দ্রনাথ ন্দোপাধ্যায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন । 'স্বর্নলতা'র চতুর্থ সংস্করন (১২৯০) ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের চিঠিটি উদ্রিত হয়। তাত দেখি-

> "নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার 'স্বর্নলতা' চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাখার কথা নয়। তাহার উপর ইংরষেজী ধরনের প্রনয়ললা চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলে, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন - এ ইসকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাআর অসাধারন কোন গুন আছে ইহা কে না স্বিকার করিবে?"

শুধু বঙ্কিম ইরোধিতা কিংবা রক্ষনশীল ও ভাবের জন্য নয় সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা এবং নভেল রোমান্সের পার্থক্য বিষয়ে কিছু প্রথানুগ বিদেশ থেকে আমদানি করা বোধে বিশ্বাসের ফলেও স্বর্নলতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে সেকালে এবং একালেও অনেক কথা বলা হয়েছে। 'স্বর্নলতা' বাংলার প্রথম সামাজিক উপন্যাস, কারন দৈনন্দিন বাঙালীর জীবনের বাস্তবতা এ বইয়ে আছে, আগে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' গর্থেথাকলেও সেটি স্কেটধর্মী রচনা, একে ঠিক উপন্যাস বলা সঙ্গত নয়। আর 'বিষবৃক্ষ' আগে বের হলেও তার ধরন কিছুটা আলাদা।

টিপ্পনী

তারকনাথ 'স্বর্নলতা' ছাড়াও আরও উপ্যাস লিখেছিলেন - হরিষে বিষদে (১৮৮৭), অদৃষ্ট (১৮৯২)। এছাড়া তিনি 'বিধিইলিপি' নামে একটি উপন্যাসের মাত্র ছয়টি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। কয়েকটিগল্পও তিনি লিখেছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' ও 'স্বর্নলতা' কাচাকাচি সমবে প্রকাশিত হয়েচিল। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৭৯ বৈশাখ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরোব ; গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। আর স্বর্নলতা জ্ঞানাঙ্কুর পত্রকায় ১২৭৯ আশ্বিন থেকে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়ে গ্রন্থাকারে ছাপা হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সন্দেহ নেই শিল্পগুনের বিচারে উপন্যাস হিসাবে বিষবৃক্ষ - এর সঙ্গে 'স্বর্নলতা'র কোন তুলনাই হতে পারে না। আলালের ঘরের দুলাল কতকটা নকশাধর্মী হলেও উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বিদ্যমান। সেদিক থেকে এটি সামাজিক উপন্যাস। সমকালে প্রাচীন সামাজিক জীবনাচরনের সঙ্গে ইংরেজ প্রভাবিত নব্য আদর্শের সংঘাতের নিগূঢ় সমাজ চৈতন্য এর ভিত্তি, যদিও ব্যাঙ্গের ফ্রেমে ধৃত বলে সেই দ্বন্দ্বের সমগ্রতা ও গভীরতা এখানে পাওয়া যাবে না। প্যারীচাঁদের আখ্যানে সমাজও পরিবার জীবনের যে ছবি তার শিকড় সমাজ সমস্যার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উনবিংশ শতকের জিবন চিত্ত ও চেতনার কথা। পরিবার জিবনের খুঁটিনাটি প্রাত্যহিক ছবি তিনি আঁকেন নি, কিন্তু তাতে যেটুকু আছে তাকে বাঙালির জীবন চিত্র য় বলে কোলাহল করার কোন মানে হয় না। কল্পনার গাঢ় রঙ কাহিনিতে আছে, বর্ণনায়, বিবরনে, চরিত্র ভাবনায়ও আছে। কিন্তু সমকালীন সমাজ বাস্তবতা বা ননরনারির মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে আবৃত বা আনচ্ছন্ন করেনি সেই কল্পনা, তাকে আবিষ্কার করেছে পুর্ন তাৎপর্যে। বিষবৃক্ষের বাস্তবতা 'আলালের গরের দুলাল' এর চেয়ে গভির ও পূর্নাঙ্গ। পরিনবার ও সামজিক রারীর বহিরঙ্গ চিত্র রচনাকে যথার্থ বাস্তবতা বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন নি। 'সবর্নলতা'র ধরন আলাদা। এর বাস্তবতা চোকে দেখা বাস্তবতা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতিয়ার্ধে বাঙালীর জীবন ও চিন্তায় যে সব তরঙ্গ উঠেছিল, দ্বন্দের জন্ম হয়েছিল তার কোনো পরিচয় এ গ্রন্থে নেই। তে যে ছবি আছে তা কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত নয়, সেকালের বাঙালির জীবনের পরিচিত পারিবারিক ও সামাজিক ছবি তাতে প্রতিফলিত। তাই একথা বলাই যায় যে 'স্বর্নলতা'র প্রথমাংশে ভ্রাতৃবিরোধকে কেন্দ্র করে যৌথ পরিবারে ভাঙনের যে ছবি তারকনাথ এঁকেছেন তা শরৎচন্দ্রের অনেক রচনার পুর্বসুরী।

এই মসয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু 'স্বর্নলতা' বইটির আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না। গল্পের মধ্যে একটা টান বজায় রেখেছেন লেখক। তার জন্য পুরোপুরি আটকের মতো ঘটনার ক্রমকে দানা বাঁধতে হয়নি, বরং মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সরল বিবরণ-ধর্মিতা প্রশ্রয় পেয়ে। লেখার ভাষার সরসতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে -

"ভালবাসা কখনই প্রতিশোধ্য থাকে না ল হয় সে তোমাকে ভালোবাসে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা তাকে ঘৃনা করিবে। অন্যানভ বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে কিন্তু ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র।.... বিধুভূষন পার্থিব মাতার ভালবাসা ভালবাসার দ্বারা প্রতিশোধ করিতেন, কিন্তু মা সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল তা ঘৃনার দ্বারা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল।"

টিপ্পনী

স্বর্নলতা উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষন

'স্বর্নলতা' উপন্যাসের দুটি ভাগ - প্রধমভাগে সরলা বিধুভূষনের কাহিনী। দবিতীয় ভাগে স্বর্নলতা-গোপালের আখ্যান। প্রথমভাগে বালক গোপালের তেমন কোনো উল্লেখযোগ ভুমিকা এই, উত্তরপর্বে সেই নায়ক। দ্বিতীয়ভাগে প্রাধান্য পেয়েচে গোপাল, স্বর্নলতার বাবা, দাদা-ঠাকুমা গুরুদেব। প্রধমঅংশে শশিভুষন প্রমদার যতটা গুরুত্ব, ঢ়েস অংশে আদো ততটা নয়, উপন্যাসের এই দুটি অংশের মধভে তেমন কোনো অনিবার্য যোগসূত্র নেই। তবে মানতেই হয় - স্বর্নলতা গোপালের রোমান্টিক প্রণয়, সবর্নলতাকে সম্পত্তির লোভে বিয়ে দেবার চক্রান্ত ও গুরুদেব শশাঙ্কশেখরের তাকে আটকে রাখা, বাড়িতে আগুন লেগে গুরুদেবের পুড়ে মরা, স্বর্নলতার নিস্কৃতিলাভ এবং পরিণামে গোপালের সঙ্গে তার মিলন - এইসব রোমহর্ষক ঘটনা তারকনাথ বাদ দিতে পারেন নি, সম্ভবত বাদ দিত চানও নি। তুলনায় প্রথম পর্বটি আমাদের কাছে অনেক বেশি বাস্তবগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক।

'স্বর্নলতা' উপন্যাসের মূল ঘটনাস্থল কৃষ্ণনগর শহরের নিকটবর্তী কোনো গ্রাম। দুই ভাই শশিভূষন ও বিধুভূষনের মোটামুটি সুখী নিম্নবিত্ত পরিবারের এই আখ্যানের সূচনা। মায়ের মৃত্যুর পরে দুই ভায়ের স্ত্রীদের মধ্যে একটু আধটু কলহবিবাদ, যাতে বড়ো ভায়ের স্ত্রী প্রমদার ভূমিকাই প্রধান। একদিন এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে প্রমদা তার নিজের ছেলেমেয়ে জন্য দুটি বাঁশি কিনে নিল, সরলা অর্থাভাবে তার ছেলেকে কিছু কিনে দিতে পারল না। সরলা প্রমদার কাচে ধার চাইল, তার পরিনামে বেঁধে গেল ঝগড়া। দোকানদারের থেকে ততক্ষনে সরলার ছেলে গোপালল একটা বাঁশি তুলে নিয়ে তার দুই ভাইবোন অর্থাৎ বিপিন ও কামিনীর সঙ্গে খেলতে চলে গিয়েছে। বাঁশির দাম আর দেওয়া হল না সরলার। ফেরিওয়ালাও কিছু মনে করল না, বিনা পয়সায় গোপালকে বাঁশি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এইরকম ছোটোখাট তুচ্ছ বিরোধ কালক্রমে জটিল আকার ধারন করল। বড়জা প্রমদার প্ররোচনাতেই মুখ্যাত বড়োভাও শশিভূষন ছোটভাই বিধুভুষনকে সংসার থেকে আলাদা

টিপ্পনী

করে নেবার সিদ্ধান্ত নিল। এতেই মর্মাহত হয়ে কর্মহীন বিধুভূষন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কাজের সন্ধানে কলকাতায় রাস্তায়। বিধুভূষনের এই অভিযাত্রায় অংশটি উপন্যাসের এক আকর্ষনীয় অধ্যায়। পথে নানা ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার, অদ্ভুত ধরনের কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসে সে। লেখাপড়া বিঢ়েস কিছুই শেখে নি বিধুভূষন, জানে শুধু কিছুটা গান-বাজনা যা দিয়ে বড়জোর যাত্রাদলে কাজ পাওয়া সম্ভব ল কলকাতায় আসার পথে বিধুভূষনের সঙ্গে আলাপ হয় নীলকমলের। উপন্যাসে নিলকমলের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নেই। কিন্তু চরিত্রটি পরম মমতায় এঁকেছেন তারকনাথ।

'স্বর্নলতা' উপন্যাসে মুল সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক, প্রমদার ঈর্ষা, সরলার মৃত্যু, বিধুভূষনের প্রবাসযাপন, গদাধর-রমেশের ষড়যন্দ্র, শশাঙ্কশেখরের পৈশাচিকতা - সমস্ত কিছুর কেন্দ্রগত শক্তিটি - অর্থ সংক্রান্ত। এমন কি জমাদার ঈর্ষার মুল কারণ তার অধিকারবোধ হলেও সেই অধিকারবোধ অনেকটাই নিভর করে সাংসারিক অর্থনীতির উপর। তার চরিত্রে মায়ের প্ররোচনা-সজ্ঞাত ও নিজস্ব স্বভাবগত ক্ষুদ্রতা ও নিশ্চতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাকে তিব্রতর করেছে তাদের পারিবারিক স্তরে অর্থনতিক বৈষম্য। বিধুভূষন গরিব না হলে তাকে অর্থসন্ধানে প্রবাসে যেতে হত না, দুই ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব অনেকটাই থাকত কল সরলাকে মরতে হত না, গদাধর রমেশ ষড়যন্ত্রে সাহসী হত না। পরবর্তী স্তরে গোপালের জীবনেও হয়তো হেমচন্দ্র বা স্বর্নলতার আবির্ভাব ঘটত না ; অন্যপক্ষে অর্থলোভের motif না থাকলে শশাঙ্কশেখরও স্বর্নলতাকে অপহরন করে উপন্যাসে জটিলতা পাকাত না।

চরিত্রচিত্রন ও বাস্তবতা অঙ্কনে তারকনাথের কৃতিত্ব

স্বর্নলতা উপন্যাসে নরনারী সাধারনভাবে সরল ও জীবন্ত ল বিশেষত যে লোকগুলি উপন্যাসের কেন্দ্র থেকে কিছু দূরে পরিধি আশ্রয় করে আছে তারা সমকালীন গ্রাম ও শহরজীবনের গন্ধবর্ন ধরে রেখেছে। এমন কি আজ এতদিন পরেও তাদের পরিচিতি বলে মনে হয়।

গ্রামের ফেরিওয়ালা, রামধন ধোবা এদের মধ্যে দরদী মন দেখেছেন লেখক। দারোগা লোক খারাপ নয়, কিন্তু রমেশ কনস্টেবল ঘুষকোর ও চক্রান্তকারী। জালিয়াতি করায় গদাধরকে সে সাহায্য করেছে। ব্ল্যাকমেল করে বউ টাকা আদায়ন করেছে। কিন্তু অপরাধ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজে সরে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত রমেশকে ঔপন্যাসিক পুরোদস্তর ভিলেন করে তুলেছেন এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কর্মভীরু জমিদার

বাবু শুধুই বন্ধুবর্গ স্ফূর্তি করে কাল কাটাতে চায়। সেরেস্তার কর্মচারীরা সবাই স্বার্থপর ও চোর। প্রতিবেশিনী ঠাকরুন ঘর ভাঙায় ইন্ধন জুগিয়ে আনন্দ পায় এবং অর্থনবানের তোষামুদিতে কুন্ঠাবোধ করে না। লক্ষ্য করবার মত বিষয় মুদিনীর তরুন পথিকেদ্বয়ের প্রতি নেকনজর এবং কতকটা তার প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা ধর্মবিদ্বেষে ওদের প্রতি মুদির বিমুখতা, কালীঘাটের পান্ডার অর্থলুব্ধতা আবার সহায়হীন বিধুভূষনের প্রতি, পাঁচালি দলের অধিকারীর গুনগ্রাহিতা ও সহৃদয়তা।

একটু বড় চরিত্রে ভালো মন্দের হিসেবটা উৎকন্ঠা হয়ে উঠেছে ল এক শশিভূষন ছাড়া কারুর মধ্যে ভিতরের বাধা একটুও নেই। শশিভুষন বিধু-সরলাদের প্রতি স্নেহপরায়ন হলেও অতি সহজেই স্ত্রীর চাপের কাছে আত্মসর্ম্পন করেছে। অবশ্য প্রমদা এই হৃদয়দৌর্বল্য জানত বলেই পড়শী ঠাকুরনের সাজানো সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছিল। গল্পের শুরুতে সামান্য মানস প্রতিরোধ ছাড়া শশীকে পুরোই প্রমদার কথা ও বুদ্ধিমতো চলতে দেখি। শশী এখন ভাই, ভাজ, বালক গোপালের চূড়ান্ত দুর্দশায় নির্বিকার এমনকি নিষ্ঠুরও। আবার মনের কোনের সেই ক্ষীন প্রতিটুককু দু-একবার সামান্যত প্রকাশ পেয়েছে। যেমন দাদাধর শ্যামার টাকা চুরি করায় শশিভূষন গোপনে একবার পাঠশালার বেতন দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে শশিভূষনএক অসাধু মানুষে পরিনত হয়েছে। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী হিসেবে কিছু কিছু চুরি নয়, একেবারে পুকুর চুরি শুরু করল। অন্য সহকর্মীদের ভাগ দিল না ল প্রমদার লোভ, সংসারের অশান্তি, অংশত শশির ক্রমিক অধঃপতনের মনস্তাত্ত্বিক কারন হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওসব ঝটিলতাব প্রবেশের ইচ্ছা গল্প লেখকের ছিল না। শশিভুষনের আত্মরক্ষার ব্যাকুল চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ স্বীকার। শশির অনুশোচনাকেই তার পাপের প্রায়শ্চিত বলে গন্য করা হয়েছে। উপন্যাসের পরিনতিতে তার জন্য গোপালের গৃহে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিধুভূষনের চরিত্র কল্পনায় গ্রামীন বাস্তবতার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভাবনার কিছু মিশ্রন ঘটেছে। সে একটি বিশেষ ধরনের টাইপ হতে গিয়েও তার চৌহদ্দি কিছুটা ছাড়িয়ে গিয়েছে। শিখাহীন চাকুরীবিহীন ভুসম্পত্তিহীন এই যুবকটি যাত্রা-পাঁচালির গানের আসরের পেছনেঘুরে দাদার রোজগারে খেয়েপরে দায়িত্বহীন বাউন্ডুলেপনায় দিন কাটাছিল। সেদুশ্চরিত্র লম্পট নয়, স্ত্রী সন্তানের প্রতি অস্নেহশীলও নয়। অথচ বড় ভাজের হাত তোলা ধাকার যে লাচ্ছনা স্ত্রী-পুত্রের ভাগ্যে জুটেছিল সেটা সে পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। কর্মবিমুখ, অপদার্থ স্ফূর্তিবাজ অথচ সৎ এই শ্রেনী বাংলার গ্রামের সেকালে একটাইপ পরিচিত চরিত্র ল সওদর ভাইয়ের উপরে সম্পর্ন ভরসা ও প্রীতি আসলে কাজ এড়িয়ে থাকার একটা মানস অছিলা। কিন্তু বাস্তবের ঘাত তাকে জজাগিবে তুলেছে ল সংসারের প্রয়োজন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মেটাবার ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু চেষ্টারও ত্রুটি নেই। গ্রাম ছেড়ে শ্রেষ্ঠ আসা, অনেক কষ্ঠ সহ্য করা, বাজনাদারের কাজ পাবার পরেই গোপালের নামে টাকা পাঠানো সব সবই তার প্রমাণ। বিধুভূষনের সব প্রচেষ্ঠা সত্ত্বেও সরলা যে বাঁচল না এ তার দুর্ভাগ্য। সে কিন্তু সরলার মৃত্যুতে শোকে বিবাগী হল না। জালিয়াত গদাধরের অপকর্ম ধরে ফেলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করল।

বিধুভুষনের জন্ম নক্ষত্রের অভিশাপ ছিল। পরিজনের সঙ্গে সহজীবন যাপন তার জোটেনি ল গ্রামে থাকাকালে নিজ স্বভাব তাকে বাইরে ঘুরিয়েছে ল তারপরে তো অভাবের তাযনা। সরলার মৃতভুর পরেও পুত্র গোপালকে অন্যের আশ্রয়ে রেখে তাকে দুরে কাজের খোঁজে চলে যেতে হয়েছে।

গোপাল

গোপাল বালক বয়স থেকেই শান্তশিষ্ট সুবোধ । সে কখনও এমন কিছু করেনি যা করা উচিত নয়। এমন কি তেমন কিছু ভাবেও নি। এক বাড়িতে রান্না করার বদলে থাকা খাওয়া জুটত। পীড়ব সত্ত্বেইও সে তাদের হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে হেমচন্দ্রের আমন্ত্রনে তার কাচে ওঠেনি, পাছে রাঁধুনির অভাবে ওদের কষ্ঠ হয়। পরম উপকারী বান্ধব হেমচন্দ্রের রোগে প্রাণঢালা সেবা বা শ্যামাকে মায়ের মতো দেখা তো খুবই স্বাভাবিক আগুন লেগে শশাঙ্ক পুড়ে মারা গিয়েচিল, না হলে তার মনে কষ্ঠ দিয়ে স্বর্নলতাকে উদ্ধার করা গোপালের পক্ষে সম্ভব ছিল কি না বলা যায় না। গোপাল স্বর্নলতার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়েচিল, কিন্তু সবাইকে মেনে, কারোর বিরুদ্ধে না গিবে, প্রথমাবধি হেম-বিপ্রদাসের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে। এ কারনেই প্রেমও গোপালকে মুক্তি দিতে পারে নি। তার বিষন্নতা বা আনন্দ কোনটাই উচ্চকিত নয়। তবে স্বর্নলতার বিপদের খবর পেয়ে সে পাগলের মতো চুটছে, কোন বিবেচনা করে নি। এ টুকু তার প্রনয়ী মনের উদ্বেলতার চিহ্ন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কথিত গোপালের মতই সে সত্যি সুবোধ বালক।

হেমচন্দ্র ও ভালোমানুষ ল বাড়তি দয়াধর্ম দেখাবার সুযোগ তার আচে - এটি একটা বেশি গুন তার চরিত্রে যুক্ত করেছে। গোপালের প্রতি দয়ার ভাবের সঙ্গে বন্ধুত্ব মিশে গিয়েছে, বন্ধুকে ভগ্নীপতি করতে পিতা সম্পত্তির অর্ধেকের অংশীইদার রূপে মেনে নিতে তার কোথাও বাধেনি । গোপালকে আশ্রয় দিয়েও তার প্রতি সর্বদা সমভাবই পোষন করেছে।

হেমচন্দ্রের পিতা বিপ্রদাসও সমান ভালোমানুষ। সম্পত্তি ছেলে মেয়ে দুজনকেই সমান ভাগ করে দেন। অর্থসম্বলহীন গোপালের নাম জামাই হিসেবে প্রস্তাবিত হলে সে নির্দ্ধধায় রাজি হয়।

টিপ্পনী

গুরু শশাঙ্ক ও হরিদাস মন্দের ভাল। দুজনে মিলে চক্রান্ত করে স্বর্নলতাকে হরিদাসের ছেলের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। তার সম্পত্তির অংশ হরিদাস পাবে, শশাঙ্ককে মোটা টাকা দিতে হবে। তবে দুজনের মধ্যে শশাঙ্ক এ ধরনের পরিকল্পনায়, সক্রিয়তায় নির্মমতায় হরিদাসকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। হরিদাসের মনে আশঙ্কা ছিল, সে সতর্কভাবে হিসেব করেছে, দরাদরি করেছে, যদিও বিবেক কোথাও ছিল না, ছিল না কোনরূপ অন্তদ্বন্দ্ব, শশাঙ্ক গুরুগিরির সুযোগ নিয়ে ফাঁদ পেতেছে। নানা অজুহাতে স্বর্নলতাকে ঘরে আটকে রেখে হরিদাসের ছেলের সঙ্গে জোর করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। স্বর্নলতার আবেদন, স্ত্রীর অশ্রু তাকে নরমকরতে পারে নি। অর্থই তার কাছে পরমার্থ। দৈবের হাতে সে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরেছে, পাপের প্রায়শ্চিতত হয়েছে। একটি সস্তা আগাপাশাতলা ভিলেন। বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু কোনো গভীর চরিত্র-রহস্যের ইঙ্গিত নেই। অবশ্য গুরুগিরির মুখোশ ছিড়ে শয়তানকে বের করে আনতে লেখক তাঁর স্বাভাবিক রক্ষনশীলতা ডিঙিয়ে গিয়েছেন।

গদাধর ও নিলকমল

'স্বর্নলতা' উপ্যাসের পুরুষচরিত্রদের মধ্যে পাঠককে সবচেয়ে আকর্ষন করে দুজন - গদাধর ও নিলকমল ল দুজনেই সেকালের গ্রাম জীবন সংশ্লিষ্ট দুটি টাইপ। দেহে ও মনে কিছু বিকলঙতা আ বিকার আছে। গদাধরের উচ্চারন ও বর্গের বর্ণ ট বর্গের হে যায়। নীলকমলের গলায় সুরের রেশ না থাকলেও সে নিজেকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী বলে মনে করে। এই সূত্রে দুটি চরিত্রই হাস্যরসের আশ্রয় হয়েছে, যদিও কিছুটা মোটা দাগের। কিন্তু গদাধরের ক্ষেত্রে সে হাস্য ছাপিয়ে শয়তানি বড় হয়ে উঠেছে। নীলকমলের বেলায় হাস্যের সঙ্গে করুনা মিশেছে।

কথা বলায় স্খলিত উচ্চারন গদাধর মুলত দুষ্টবুদ্ধির। একসঙ্গে দুষ্টুবুদ্ধি এবং নিবুর্দ্ধিতা। শ্যামার সঙ্গে ঝগড়া করে বোকার মতো থানায় গিয়ে হাজত খেটেছে, আপাত চালাকের মতো শ্যামার জমানো টাকা চুরি করেছে। কিন্ত স্বভাবের অন্তকর্লীন বোকামির জন্য শ্যামা বা শশিভূষন কারো বুঝতে দেরি হয়নি চোর কে। রমেশ কনস্টেবলের সঙ্গে ষড় করে জালিয়াতির সাহায্যে বিধুভূষনের পাঠান টাকা হাত করেছে। খুবই চতুরের কাজ, কিন্তু

টিপ্পনী

রমেশের ব্ল্যাকমেলে সে সাদা হয়ে গেছে এং সহজেই ধরা পড়েছে - কারন কাজটা আসলে করা হয়েচিল খুবই নিবফোধের মতো। মোটমাট গদাধর এ গল্পের অন্যতম ভাঁড় এবং ভিলেন। খুব মোটা রেখায় আঁকা হলেও জীবন্ত। লেখকের রচনা - নৈপুন্যের নিদর্শন।

নীলকমল নিজেকে অসাধারন সঙ্গীতশিল্পী মনে করে, যদিও তার মোটেই গানের গলা নেই। তার বাস্তব সংসার সম্বন্ধে বা বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে বোধ নেই। আসলে সে যেমন ভিরু তেমনি নিষ্কর্মা। এই সব মিলে গ্রাম্য লোকটি হাস্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিধুভুষন সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব নিলকমলের মধ্যে ক্রমে তৈরি হয়। লোকটি একেবারে অনুভূতিহীন নয় তা এতে বোঝা যায় ল কলকাতার একটি রামায়নের দলে তাকে একরকম বাধ্য হয়ে হনুমানের ভূমিকা নিতে হয়। ভূমিউকাটি লোকের মধ্যে যতই হাস্যরস বিতরন করুক নীলকমলের মনে একটা সূক্ষ্ম অপমান বোধের জন্ম দেয়। হনুমান যত ড় বীর ও ভক্ত হোক, কৃত্তিবাসী রামায়নের যুগ থেকে আংলার জনমানসে হাস্যকৌতুকের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। যথার্থ ক্ষমতা না থাকলেও নিলকমল বেচারা নিজেকে সঙ্গীত শিল্পী ভাবত, কলা খাওয়া ও লেজ নাচানো হনুমানের ভুমিকা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। বিধুভূষনের সাহায্যে মাঝখানে কিছুদিন সুখের মুখ দেখলেও, এই বোধ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। গ্রামে ফিরেও রেহাই পায় না। বালকের দল হনুমান বলে তাকে খেপায় ল সে পাগলের মতো হয় তাদের মারতে ছোটো। চারপাশে উচ্চ হাস্যকলরবের মধ্যে নীলকমলের বেদনাবিকৃতি ভারসাম্যহীনতা তারকনাথ দেখতে পেয়েছেন, শিল্পী হিসেবে এটি তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

সরলা

'স্বর্নলত' উপন্যাসে সরলা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়, কারন বাঙালী দরিদ্র সংসারের বধু ও মাতার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে তাকে তৈরি করা হয়েছে। চরিত্রে কোথাও আর্শবাদী ভালোত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। আবার কোনো দুষ্টুবুদ্ধি, চাতুর্য, বক্রতা প্রভৃতিও নেই। আমলে দুঃখবহনের একঘেয়ে প্রাচুর্যে তাকে একধরনের মহিমা দানের চেষ্টা হয়েএ ল শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো নারীচরিত্রের আদল এখানে আএ ল যেমন আছে প্রমদায়ও। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তারকনাথের উপন্যাসের সাদৃশ্য অনুভব করা যাব ল তারকনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতোই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান নিয়েই উপন্যাস লিখেছেন, চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৯ এর ফাল্গুন সংখ্যায় তারকনাথের একটি ইংরেজি রোজনামচার কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। সেখানে তারকনাথ বলেছে:

some charecters opf my novel are from the real life . My friends Suresh and paresh two figure under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873.

টিপ্পনী

উপন্যাসে অবশ্য রমেশ থাকলেও দেবেশ এই। এমনও হতে পারে -শশিভুষন বিধুভূষনেরই বাস্তব নাম রমেশ দেবেশ। শশিভূষন মালদহের কোনো নবীন জমিদারের নায়েব ছিলেন। শশিভূষনের পুরো গল্পটা - জমিদারের তহবিল থেকে টাকা আত্মসাৎ করে গাড়ি ও গৃহীনীর অলংকার নির্মান, পরে পুলিশি হাঙ্গামায় স্তরীর আশ্রয় গ্রহন, স্ত্রীর অর্থদানে বিমুখতা ও পরিশেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন - এ সমস্তই সত্য ঘটনা। গদাধর, নীলকমল, গুরুদেব শশাঙ্কশেকর, স্মৃতিগিরি, প্রমদা, ঠাকরন দিদি এসব চরিত্রকে ও তারকনাথ নিজের চোখে দেখেছিলেন। সরলা চরিত্রটির সম্পর্কে জানা যাব, তারকনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত কোনো ব্যাক্তির স্ত্রী ছিলেন তিনি - ব্যাক্তিগত ভাবে তাঁর তিলে তিলে মৃত্যু লেখক লক্ষ করেছিলেন। জ্ঞানঙ্কুর - এ স্বর্নলতা প্রকাশকালে সরলার ক্ষয়রোগে মৃত্যুর দীর্ঘতর আনুপুঙ্খিক বিবরণ ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ন তা অনেকটাই সংক্ষিপ্ত রূপ নেয়। সরলা চরিত্রটিকে তারকনাথ পরম মমতায় গড়েছিলেন, ফলে রোজনামচায় তাঁকে লিখতে দেখি

> I am very sorry and shed teans for the death of Sanala. very Sorry to part with her. I feelas if I am a murderer! What an awful thing death. (21st June 1873).

প্রমদা

প্রমদা উপন্যাসের প্রথমাংশের মুখ্য ভিলেন। শশিভূষন তার পরিকল্পনার জালে জড়িয়ে পারিবারিক নিষ্ঠুরতাগুলি করেছে। প্রমদা কঠোরভাষি এবং চক্রান্তকুশল। শশিভুষনের শুধু নয় গদাধরের অপকর্মগুলির বুদ্ধি সে দিয়েচে ল সরলাদের সম্পূর্ন সর্বনাশে তার স্বার্থ আছে। কিন্তু চরম বিপদে স্বামীর সঙ্গে সে বিশ্বাস গাতকতা করেছে। মায়ের ভাইয়ের স্বামীর করও প্রতি তার সত্যকার ভালবাসা নেই। নিজের দর্প লোভ নিয়ে সে এক হৃদয়হীন চরিত্র। লেখক পাপের একটি জীবন্ত মূর্তি অঙ্কন করেছেন, অথচ তাকে সংসারের পরিচিত নারি বলে চেনা যায়।

টিপ্পনী

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস - ক্ষেত্রগুপ্ত

২। বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস - ড. সুকুমার সেন

৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

৪। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দোপাধ্যায়

৫। বাংলা উপন্যাসে খোঁজে - দেবেশ রায়

প্রশ্নাবলী

১। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে স্বর্নলতার অবদান বিচার কর।

২। স্বর্নলতা উপন্যাসের চরিত্র অঙ্কনে তারকনাথের স্বকীয়তা বিশ্লেষন কর।

৩। 'স্বর্নলত' কি ধরনের উপন্যাস আলোচনা কর।

৪। 'স্বনর্নলতা কে কি ট্রাজিক উপন্যাস বলা যায় - ব্যাখ্যা কর।

৫। স্বর্নলতা উপন্যাসের নামকরনের সার্থকতা বিচার কর।

NOTES

NOTES